তফসীরে

নূরুল কোরআন

ষষ্ঠদশ পারা

১৬

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

ষষ্ঠদশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

তফসীরে নূরুল কোরআন

ষষ্ঠদশ খন্ড

১৬

ষষ্ঠদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ,
মৌলিক তত্ত্বের জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে
সম্মানিত, মিসর সরকার কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত, তফসীরকার,
রেডিও বাংলাদেশ, ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

তৃতীয় প্রকাশ ঃ শা'বান ১৪২৮ হিঃ
আগষ্ট ২০০৭ ইং
শ্রাবণ ১৪১৪ বাং

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

সর্বস্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

হাদীয়া ঃ হাদীয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা

মুদ্রণে ঃ নাদীয়াতুল কোরআন প্রিন্টিং প্রেস,
লালবাগ, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ৯১১০৭১০, ৯১১০৭৭৮

আন্ নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
৬২-৬৩, চকবাজার, ঢাকা
ফোনঃ ৭৩২১৩৬৫

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Tafsir-e Nurul Quran (V) 16 By Hazrat Moulana Mohammad Aminul Islam, Published by Al-Balag Publications, 12/17 Sir Sayed Ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207 Phone : 9110778, 9110710
Price : Tk. 300.00 **$18**

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অন্তহীন শোকর, যে তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ষষ্ঠদশ খণ্ড (ষষ্ঠদশ পারা) পাঠক সমাজের কাছে পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুল্লিাহে বিজামিয়ী মাহামিদিহী, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যাঁর আদর্শ মহান, সার্বজনীন, যাঁর প্রতিটি কথা হয়েছে সংরক্ষিত, যিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন, তাঁর প্রতি এমন দরুদ যা সর্বদা অব্যাহত থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি এলমের শহর, আর আলী হল তার ফটক। আর হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি সূরা ফাতেহার তফসীর লিপিবদ্ধ করি, তবে তা ৭০টি উষ্ট্রের বোঝা হবে। আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

তফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "পবিত্র কোরআনে সব কিছুর বিবরণ রয়েছে, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণই স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে, আর কোন কিছুই বাদ দেয়া হয়নি"।

এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথার অনুসন্ধান করেছেন যে কোরআনে হাকীম থেকে কি কি বিষয়ের এলম পাওয়া যায়। আল্লামা এবনে হাজর মক্কী (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন থেকে যে সব এলমের সন্ধান পাওয়া যায় তার কোন সীমা নেই, শেষও নেই।

কোরআনে করীম থেকে যে সব বিষয়ের এলমের সন্ধান পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রঃ) হযরত কাজী আবু বকর এবনে আরবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তিনি পবিত্র কোরআনে সাতাত্তর হাজার চারশত পঞ্চাশ প্রকারের

এলমের সন্ধান পেয়েছেন।

আর হযরত ইমাম শা'রানী (রঃ) "মিজানুশ শরিয়াতুল কোবরা" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, আমি কোরআনে করীমের মধ্যে যে সব এলমের সন্ধান পেয়েছি তার বিবরণ দিয়েছি "আল জওহর" নামক গ্রন্থে, এর মধ্যে তিন হাজার প্রকার এলমের আলোচনা করেছি।

ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) কোরআনী এলম সম্পর্কে তাঁর একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেনঃ

"পবিত্র কোরআনে সর্ব প্রকারের এলম রয়েছে, তবে মানুষ তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। যদি আমার উষ্ট্রের রশিও হারিয়ে যায়, তবে তা আমি আল্লাহর কিতাবেই খুঁজে পাব"।

পবিত্র কোরআন হল আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বর্ণিত আছে, ইমাম আহমদ (রঃ) স্বপ্নে আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরজী পেশ করেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনার নৈকট্য লাভের পন্থা কি? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছিলেন, "আহমদ, আমার কালাম"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের নির্ভরযোগ্য পন্থা ও উপকরণ। মানুষ যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে তখন সে যেন আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলে। মানুষ যখন পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়, তখন যেন সে আল্লাহ পাকের মর্জি ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে মশগুল হয়। আর মানুষ যখন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করে তখন সে যেন আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের গৌরব অর্জন করে। এভাবে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারে।

মূলতঃ এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন এবং পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিখ্যাত মোফাসসের হযরত আবদুল্লাহ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ এবনে আবদুর রহমান (রঃ) (মৃত-৫৪৬ হিঃ) পবিত্র কোরআনের তফসীর লিখেছেন, এক হাজার খণ্ডে। হযরত আবুবকর এবনে আবদুল্লাহ (রঃ) সূরায়ে ফাতেহা এবং সূরায়ে বাকারার প্রথম পঞ্চাশ

আয়াতের তফসীর রচনা করেছেন একশত চল্লিশ খণ্ডে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রঃ) কোরআনে হাকীমের তফসীর লিখেছেন, ছয়শত খণ্ডে যা আল্লামা সুয়ূতীর যুগ পর্যন্ত মিসরে বর্তমান ছিল। হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) রচিত তফসীর "এয়াকুতুততাবীল" চল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। হযরত শামসুদ্দিন ইউসুফ এবনে ফারআনী রচিত তফসীরে "আবুল মুজাফফর' রয়েছে উনত্রিশ খণ্ডে। আর হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) তাঁর "তফসীরে কবীর" রচনা করেছেন ত্রিশ খণ্ডে আর কাযী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তফসীরে মাজহারী রচনা করেছেন দশ খণ্ডে। এমনি আরও বহু তফসীরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত মহা মূল্যবান গ্রন্থ সমূহের বেশীর ভাগই আরবী ভাষায় রচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফার্সী ও উর্দু ভাষায়ও বহু তফসীর গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের মহা জ্ঞান-ভাণ্ডারের যৎ কিঞ্চিৎও পরিদৃষ্ট হয় না। এ পরিতাপের কারণেই আজ থেকে বারো বছর পূর্বে এক আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে আজ এই মহান গ্রন্থের ষষ্ঠদশ খণ্ড পেশ করার তৌফিক পাচ্ছি। এ পর্যন্ত এ মহান গ্রন্থের ৫,৯৭৪ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই তাঁর মহান দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করি। হে আল্লাহ! সারা পৃথিবীতে তফসীরে নূরুল কোরআন পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ! এর উসিলায় আখেরাতে নাজাত দান কর, হে আল্লাহ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের দোয়া কবুল কর, ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিও, আমীন।

বিনীত

গ্রন্থকার

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

৪.৩.৯৩

সূচীপত্র

১।	তফসীরুল কোরআন	২
২।	আল্লাহ্ পাকের হুকুমে রাজী থাকা একান্ত কর্তব্য	৮
৩।	শিক্ষণীয় বিষয়	১২
৪।	হযরত খিজির (আঃ) সম্পর্কে আরো কিছু কথা	১২
৫।	জুলকারনাইন	১৪
৬।	জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?	১৭
৭।	শিক্ষণীয় বিষয়	৩২
৮।	দজ্জাল প্রসঙ্গ	৩৪
৯।	সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক	৪০
১০।	কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবেনা	৪২
১১।	ফেৎনার দুয়ার বন্ধ হলো	৪৯
১২।	সকল ওহীর মূল কথা তওহীদ	৫০
১৩।	একটি সন্দেহ	৫১
১৪।	গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে	৫৬
১৫।	দোয়ার আদব	৫৯
১৬।	হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য	৬৮
১৭।	মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা	৭৫
১৮।	আক্ষেপ কখন হবে	৯৬
১৯।	'সিদ্দীক' শব্দের ব্যাখ্যা	১০০
২০।	শয়তানের অনুগামী হয়োনা	১০২
২১।	অঙ্গীকার রক্ষা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য	১১২
২২।	হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর আসমানে উত্তোলনের ঘটনা	১১৪
২৩।	নামাজ বিনষ্ট করার তাৎপর্য	১১৯
২৪।	জান্নাতবাসীগণকে তোহফা প্রদান করা হবে	১২৩

২৫।	প্রত্যেককে পুলসিরাত পার হতে হবে	১৩৩
২৬।	কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী	১৪১
২৭।	হেদায়েত বৃদ্ধি করার তাৎপর্য	১৪৩
২৮।	স্থায়ী নেক আমল	১৪৪
২৯।	শানে নুজুল	১৪৫
৩০।	আয়াতের মর্মকথা	১৪৫
৩১।	মোমেনদের জন্যে সু-সংবাদ	১৫৭
৩২।	আয়াতের মর্মকথা	১৫৮
৩৩।	একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়	১৫৯
৩৪।	প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা	১৬১
৩৫।	সূরায়ে তোয়াহা প্রসঙ্গে	১৬৩
৩৬।	এ সূরার ফজিলত	১৬৩
৩৭।	সূফী-সাধকদের ব্যাখ্যা	১৬৯
৩৮।	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নামাজ	১৭৬
৩৯।	প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নামাজ	১৭৮
৪০।	হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নামাজ	১৭৮
৪১।	হযরত আলী (রাঃ)-এর নামাজ	১৭৮
৪২।	হযরত আবদুল্লাহ এবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নামাজ	১৭৯
৪৩।	ইমাম জয়নুল আবেদীনের নামাজ	১৭৯
৪৪।	নামাজ মোমেনের মে'রাজ	১৮১
৪৫।	প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নয়ন-মনের পরিতৃপ্তি নামাজ	১৮১
৪৬।	রুগ্ন অবস্থায় নামাজ	১৮২
৪৭।	যুদ্ধরত অবস্থায় নামাজ	১৮২
৪৮।	নামাজ ধর্মের খুঁটি	১৮৩
৪৯।	আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা ও জবাব	১৮৩
৫০।	সর্ব প্রথম নামাজের হিসাব	১৮৪
৫১।	সর্বোত্তম আমল নামাজ	১৮৪
৫২।	নামাজের দৃষ্টান্ত	১৮৫

৫৩।	নামাজের কারণে গুণাহ্ দূর হয়	১৮৫
৫৪।	নামাজ পাপ প্রতিরোধক	১৮৫
৫৫।	হযরত হাতেম আসাম (রঃ)-এর নামাজ	১৮৭
৫৬।	আধুনিক বিশ্বের সমস্যা সমাধানে নামাজ	১৮৭
৫৭।	জাতীয় জীবনে উন্নতির কারণ হয় নামাজ	১৮৮
৫৮।	ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নামাজ	১৯০
৫৯।	হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম মোজেযা	১৯৪
৬০।	দ্বিতীয় মোজেযা	১৯৬
৬১।	নবী শুধু পুরুষ হন	২০২
৬২।	প্রাণহীন সৃষ্টি কি কথা শোনে?	২০৪
৬৩।	প্রণিধানযোগ্য বিষয়	২০৬
৬৪।	হযরত মূসা (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষা	২০৯
৬৫।	তবলীগ হবে বিনম্র ভাষায়	২১২
৬৬।	হযরত মূসা (আঃ)-এর বক্তব্যের তাৎপর্য	২২৩
৬৭।	যাদুকরদের সংখ্যা	২৩১
৬৮।	মোমেনদের পক্ষ থেকে ফেরাউনকে সুস্পষ্ট জবাব	২৩৫
৬৯।	ফেরাউন কি যাদুকরদেরকে শাস্তি দিয়েছিল?	২৩৬
৭০।	শানে নুজুল	২৪৫
৭১।	বিস্ময়কর ঘটনা	২৪৭
৭২।	পবিত্র কোরআনের শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার শোচনীয় পরিণতি	২৬০
৭৩।	শয়তানের প্ররোচনা	২৭৫
৭৪।	আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলেন	২৭৬
৭৫।	চির সাফল্য লাভের পন্থা	২৮০
৭৬।	নামাজ আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম	২৯৩

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

ষষ্ঠদশ খন্ড ষষ্ঠদশ পারা

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن
يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ
هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ
صَبْرًا

তরজমা

(৭৫) খিজির বললেন, আমি কি বলিনি যে আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই সবর অবলম্বন করে থাকতে পারবেন না।

(৭৬) মূসা বললেন, যদি এরপর আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না, আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।

(৭৭) এরপর তারা উভয়ে চলতে চলতে এক গ্রামবাসীর নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাবার চান, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে, এরপর তারা সেই গ্রামে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পান, খিজির তা সুদৃঢ় করে দেন। মূসা বললেন, ইচ্ছা করলে আপনি এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।

(৭৮) খিজির বললেন, আমার এবং আপনার এখানেই বিচ্ছেদ হল, যে বিষয়ে আপনি সবর অবলম্বন করতে পারেননি এখন আমি তার রহস্য ব্যাখ্যা করব।

তফসীরুল কোরআন

মূসা (আঃ) যখন দেখলেন খিজির (আঃ) একটি নিঃস্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, তখন তাঁর পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হলোনা। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন, তখন হযরত খিজির (আঃ) এর জবাবে বলেন–

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি সবর অবলম্বন করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না, অবশেষে তাই হল যা ইতিপূর্বে আমি বলেছি।

যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে তাই হযরত খিজির (আঃ) এবার বিশেষভাবে তাগিদ করে বলেছেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম আপনি মনে হয় তা ভুলে গেছেন।

হযরত মূসা (আঃ) ধারণা করলেন যে এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর উপর সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তাই মূসা (আঃ) শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে, যদি এরপর আপনার নিকট আমি কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না, কেননা আপনি ওজর-আপত্তি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন আর আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই, কেননা তিনবার আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। যাহোক, যেহেতু মূসা (আঃ) বারে বারে খিজির (আঃ)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তাই তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন, যদি এরপরও আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আর আপনার সঙ্গে থাকার কোন অধিকার আমার থাকবেনা। আর আপনি যদি আমাকে সরিয়ে দেন তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকবে না।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল, শুধু জটিলই নয়, বরং দুর্বোধ্য রহস্য, এমন অন্যায় কাজ যা দেখে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, আর কথা বললে হয় কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা, তাই হযরত মূসা (আঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, এরপরও যদি আমি এমন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। একে একে তিনবার আমাকে সতর্ক করেছেন, এমন অবস্থায় যদি আপনি আমাকে সঙ্গে না রাখেন তবে আপনার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করা যাবেনা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাদের প্রতি

এবং মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত হোক, তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তবে আরো বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি তাঁর সাথীর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেছেন।

এবনে মরদবিয়া এই হাদীসকে এভাবে সংকলন করেছেন। আমার ভাই মূসার প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত নাজিল করুন, তিনি লজ্জিত হয়েছেন বলে একথাটি বলেছেন। যদি তিনি তাঁর সাথীর সাথে অবস্থান করতেন তবে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতেন।[১]

فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ

"তারা উভয়ে চলতে চলতে এক গ্রামের অধিবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ স্থানটি ছিল আনতাকিয়া। এবনে সিরিন বলেছেন, স্থানটি ছিল আইকা। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ঐ বস্তির নাম ছিল বারকা। আল্লামা বগভী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল স্পেনের একটি শহর।[২]

اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا

"তারা ঐ গ্রামবাসীর নিকট খাবার চান, কিন্তু গ্রামবাসী তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়"।

হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) গ্রামবাসীকে বলেছিলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিদের মেহমানদারীর সৌভাগ্য ঐ ভাগ্যাহত লোকদের অদৃষ্টে ছিলনা, এজন্যে তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ঐ এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত কৃপণ। হযরত খিজির (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদের এলাকায় তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা তাঁদের মেহমানদারী করেনি, এমনকি যখন তাঁরা নিজেদের তরফ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন, তখনও তারা অস্বীকার করলো।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ সে বস্তি, যার অধিবাসীরা মেহমানদারী করেনি।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, যখন সে বস্তির পুরুষরা মেহমানদারীতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাঁরা স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, একজন স্ত্রীলোক তাঁদের মেহমানদারী করলেন।

حَتّٰىٓ إِذَآ أَتَيَا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৪৯
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১

"অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন"-এ বাক্যটির বর্ণনা-শৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ) শুধু পথ অতিক্রম করার জন্যেই সে গ্রামে উপস্থিত হননি; বরং ইচ্ছা করেই সে গ্রামে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীর এ ব্যবহারে হযরত খিজির (আঃ) অসন্তুষ্ট হননি; বরং বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন।[১]

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُّرِيدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ

তাঁরা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। প্রাচীরটি প্রায় পড় পড় অবস্থায় ছিল। হযরত খিজির (আঃ) সে প্রাচীরটি ঠিক করে দিলেন, কেননা যে কোন সময় তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, খিজির (আঃ) হাতের ইশারায় প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছেন।

সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, খিজির (আঃ) প্রাচীরটি স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরটি সোজা হয়েছে এবং সুদৃঢ় হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত খিজির (আঃ) পুরনো প্রাচীরটিকে ফেলে দিয়ে নতুন প্রাচীর তৈরী করে দিয়েছেন। যাহোক, এটি ছিল হযরত খিজির (আঃ)-এর মোজেযা।

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

এ সময় হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি এমন কঠোর অন্তর বিশিষ্ট, অনুদার এবং কৃপণ লোকদের প্রতি এহসান করলেন, তথা বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা দ্বারা আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

খিজির (আঃ) বললেন, ইতিপূর্বে আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটি আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আপনি এখন আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁদের উভয়ের সহাবস্থান যে সম্ভব নয় তা হযরত মূসা (আঃ)-ও উপলব্ধি করেন। কেননা, তাঁদের উভয়কে আল্লাহ পাক ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ)-কে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা জনসাধারণের অনুসরণযোগ্য। কেননা তিনি জাহেরী শরীয়তের বিধান প্রচার করতেন এবং কায়েম

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৩

করতেন। কিন্তু হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তার অনুসরণ করা এমনকি তার রহস্য উপলব্ধি করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

অবশ্য বিদায়ের পূর্বে দুর্বোধ্য ঘটনাগুলোর রহস্য আপনাকে আমি বলবো, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। কেননা, ঐ কাজগুলো প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ ছিল, অথচ বাস্তবে পরিণতির দিক থেকে মন্দ বা ভুল ছিলনা।

﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيٰنًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً
وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صٰلِحًا فَأَرَادَ
رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

তরজমা

(৭৯) সমুদ্রে যারা মেহনত-মজদুরী করতো এমন কয়েকজন মোহতাজ-মিসকিনেরই ছিল ঐ নৌকাটি। আমি ইচ্ছা করলাম তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে, কেননা তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগ করে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

(৮০) আর ঐ যে বালকটি, তার পিতা-মাতা ছিল মোমেন, আমি আশংকা করলাম যে সে বিদ্রোহ ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে নাজেহাল করবে।

(৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

(৮২) আর ঐ প্রাচীরটি ছিল এ শহরের দু'টি এতীম বালকের, ঐ প্রাচীরের নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল একজন নেককার ব্যক্তি। তাই আপনার প্রতিপালক দয়া করে ইচ্ছা করলেন যে তারা যৌবনে উপনীত হোক এবং তাদের ধন-ভান্ডার উদ্ধার

করুক। এটি আপনার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর আমি নিজের ইচ্ছা থেকে কিছু করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে অপারগ হয়েছিলেন, এ হল তার ব্যাখ্যা।

তফসীরুল কোরআন

ঐ নৌকাটির ব্যাপার এই, নৌকাটির মালিক ছিল কয়েকজন দারিদ্র-প্রপীড়িত ব্যক্তি। যারা মানুষকে পারাপার করিয়ে তাদের জীবিকা উপার্জন করতো, তারা ছিল মিসকিন, অনাথ বিপদগ্রস্ত। আমি নৌকায় ছিদ্র করে খুঁত সৃষ্টি করলাম। কেননা, সম্মুখে এক জালেম রাজা নিখুঁত নৌকাগুলোকে জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেয়।

কা'ব (রঃ) বলেছেন, ঐ নৌকাটি দশজন গরীব মানুষের ছিল, তারা পরস্পর ভাই ভাই ছিল, তন্মধ্যে পাঁচজন কাজ করছিল, আর পাঁচজন ছিল পঙ্গু।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে মিসকিন বা অনাথ এমন ব্যক্তিকেও বলা যায়, যার নিকট তার প্রয়োজন মোতাবেক ধন-সম্পদ না থাকে। হযরত খিজির (আঃ) ঐ নৌকাটিতে ফাটল ধরিয়ে জালেম রাজার হাত থেকে রক্ষা করলেন।[১]

প্রত্যেকটি কাজের ফলাফল নির্ভর করে তার উদ্দেশের উপর। হযরত খিজির (আঃ) নৌকাতে যে ফাটল ধরিয়েছেন তার উদ্দেশ্য ছিল নৌকাকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করা, তার আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করা নয়। হযরত খিজির (আঃ)-এর এ বর্ণনা শ্রবণ করে হযরত মূসা (আঃ) এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহ পাকের এলমের কোন সীমা নেই, তিনি এক একজনকে এক এক প্রকার এলম দান করেছেন। একজনকে যা দান করেছেন, অন্যজনকে তা দান করেননি। আর আল্লাহ পাকের কিছু বন্দা এমনও রয়েছেন যারা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক কাজ করে থাকেন। তাঁদের কর্মের রহস্য অন্য মানুষের নিকট উদঘাটিত হয় না। হযরত খিজির (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত হল ফেরেশতাদের এলম। আর হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে এলম দান করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত হল হযরত আদম (আঃ)-এর এলম। একটি জাহেরী শরীয়তের এলম, আরেকটি বাতেনী বা গোপন এলম।[২]

যেমন এ নৌকার কথাই লক্ষ্যণীয়। কয়েকজন দরিদ্র মানুষ সমুদ্র বক্ষে জীবনকে বাজী রেখে তাদের জীবিকা আহরণ করতো, এ নৌকাটি ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। তারা এ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি, হযরত মূসা (আঃ)-ও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত খিজির (আঃ)-কে এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল করেছেন। তাই তিনি জালেমের জুলুম থেকে বিপদগ্রস্ত মানুষের একমাত্র সম্বলকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেন। বর্ণিত আছে, অত্যাচারী রাজা নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয়। তার

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৫১-৫২

২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬০

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৮

এলাকা অতিক্রম করার পর হযরত খিজির (আঃ) স্বহস্তে নৌকাটি ঠিক করে দেন।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

"আর ঐ যে বালকটি, তার পিতা মাতা ছিল মোমেন, আমি আশংকা করলাম যে সে বিদ্রোহ ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে নাজেহাল করবে"।

আর ঐ বালকটি সম্পর্কে আল্লাহ পাক হযরত খিজির (আঃ)-কে অবগত করিয়েছিলেন যে এই বালকটি পরিণত বয়সে দুরাচারী হবে, তার অন্যায়-অনাচার এবং নাফরমানীর কারণে তার পিতা-মাতা বিপদগ্রস্ত হবে।

অথবা এর অর্থ হল, ছেলেটি বড় হয়ে দুর্বত্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পিতা-মাতার উপর এমন প্রভাব ফেলবে যে তাদেরকে কাফেরে পরিণত করবে। অথবা এর অর্থ হল, পিতা-মাতা পুত্রের ভালবাসায় মজে ঈমান হারা হয়ে যাবে।

সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, পিতা-মাতা তাদের সন্তানের ভালবাসায় ঈমানকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হবে। এ কারণে আমি বালকটিকে হত্যা করেছি। হযরত খিজির (আঃ)-এর এই আশংকা তাঁর নিজের বুদ্ধি প্রসূত ছিলনা; বরং তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল যে এই বালকটি যদি জীবিত থাকে তবে তার পিতা-মাতাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। তাই বালকটির মৃত্যু তার পিতা-মাতার জন্যে শুধু কল্যাণকরই নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত হয়েছে। আল্লাহ পাকই হযরত খিজির (আঃ)-কে এর জন্যে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ঐ কু-সন্তানের পর তাদেরকে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। একজন নবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর গৃহে আরেকজন নবী পয়দা হন যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাক একটি উম্মতকে হেদায়েত করেন। এভাবে আল্লাহ পাক ঐ দুবৃত্ত পুত্রের বদলে তাদেরকে একটি নেককার সন্তান দান করেন।

এবনে আবি শায়বা যায়েদ এবনে হারমুজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে নাজদা নামক খারেজী ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি লেখা প্রেরণ করলেন, যাতে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হযরত খিজির (আঃ) ঐ বালকটিকে কিভাবে হত্যা করলেন? অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অল্প বয়সের বালকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) তার জবাবে লিখেছেন, যদি শিশুদের ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে তোমার এলম অর্জিত হয়, যা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথী খিজির (আঃ)-এর ছিল, তবে তোমার জন্যে বাচ্চাদেরকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার তাৎপর্য হল সাধারণ মুসলমানদের নিকট আল্লাহর ওহী আসে না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। এজন্যে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্যে শিশুদের হত্যা করা বৈধ নয়। আর হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট এ সম্পর্কে ওহী

এসেছিল, তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছিল তাই বালকটিকে হত্যা করা তাঁর জন্যে বৈধ হয়েছিল।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوٰةً

ফলে আমি চাই যে তাদের প্রতিপালক যেন এর পরিবর্তে পবিত্রতা এবং স্নেহ মায়ার নিরিখে তার চেয়ে উত্তম সন্তান তাদেরকে দান করেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, বালকটির মৃত্যু হল তবে তার পিতা-মাতা বিপদমুক্ত হল, তারা তাদের পুত্র হারালো কিন্তু তাদের ঈমান রক্ষা পেল, শুধু তাই নয়; বরং এ পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করলেন এক পূণ্যবতী কন্যা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায়, ঐ পুত্রের বদলে যে কন্যা সন্তান তাদেরকে দেয়া হয়েছে তা হবে দয়া মায়ার প্রতীক এবং পিতা-মাতার অত্যন্ত অনুগত এবং তাদের স্নেহধন্য ও খেদমতগুজার।

আল্লামা বগভী (রঃ) কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক ঐ পুত্রের বদলে তাকে একটি পূণ্যবতী কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার সঙ্গে একজন নবীর বিয়ে হয়।

হযরত জাফর এবনে মোহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহ পাক পিতা-মাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন যার বংশে ৭০ জন নবী হয়েছেন।

এবনে জোরায়েজ বলেছেন, এ বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ পাক তাকে একান্ত অনুগত একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এবনুল মুনজের অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার থেকে বহু পয়গম্বর জন্ম গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এবং তিরমিজী (রঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে এ কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুতরেফ লিখেছেন, যখন ঐ বালকটি পয়দা হয়েছিল তখন তার পিতা-মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। এরপর যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

আল্লাহ পাকের হুকুমে রাজী থাকা একান্ত কর্তব্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মোমেনের কর্তব্য হল তার পছন্দ হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় আল্লাহ পাকের গোপন তদবিরের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, তাঁর রহমতের আশা করা এবং তাঁর আশ্রয়ের অন্বেষণ করা, আর আল্লাহ পাকের হুকুমের

ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি না করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ সে বালকটির নাম ছিল হাইছুর। হাদীস শরীফে আছে যে তার প্রকৃতির মধ্যে কুফরী প্রবিষ্ট ছিল। হযরত খিজির (আঃ) বলেন যে সন্তানের মহব্বতের কারণে তার পিতা-মাতার কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা ছিল। কাতাদা (রঃ) বলেনঃ সন্তানটি জন্মের পর তার পিতা-মাতা খুব খুশী হয়েছিলেন, তাই তার মৃত্যুর পর তারা অত্যন্ত দুঃখিত হন। অথচ তার বেঁচে থাকাটাই তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ ছিল। সুতরাং মানুষের উচিৎ যেন আল্লাহর ফয়সালার উপর সে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ পাক সব কিছুরই পরিণাম জানেন আর আমরা কোন কিছুরই পরিণাম জানি না। তিনি মোমেনের জন্যে যা পছন্দ করেন তা মোমেন নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তার চেয়ে অনেক উত্তম। হাদীস শরীফে আছে যে মোমেনের জন্যে আল্লাহ পাকের ফয়সালা সম্পূর্ণ মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্যে হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যা পছন্দ কর না, তা হয় তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

হযরত খিজির (আঃ) বলেন, আমি চেয়েছি যে আল্লাহ তাদেরকে এমন সন্তান দান করেন যে অত্যন্ত পরহেযগার হবে এবং যার উপর পিতা-মাতার অত্যন্ত স্নেহ থাকবে, অথবা সে যেন পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী হয়।

বলা হয়েছে যে ঐ ছেলের পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। বর্ণিত আছে যে ঐ ছেলেটিকে হত্যা করার সময় তার মায়ের গর্ভে একটি সন্তান ছিল।[২]

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

"আর ঐ প্রাচীর ছিল এ শহরেরই দু'টি এতিম বালকের, আর ঐ প্রাচীরের নীচে তাদের ধন-সম্পদ পুঁতে রাখা হয়েছিল"।

হযরত খিজির (আঃ) যে পতনোন্মুখ প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছিলেন, আর কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি, তা ছিল দু'টি এতিম বালকের। হযরত খিজির (আঃ) বলেন, যদি প্রাচীরটি ধ্বসে যেত তবে এতিম বালক দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতো চরমভাবে, কেননা তাদের ধন-সম্পদ ঐ প্রাচীরের নীচে সংরক্ষিত ছিল, যদি প্রাচীর ভেঙ্গে পড়তো তবে এতিমের জন্যে সংরক্ষিত গুপ্তধন বের হয়ে পড়তো, যা অন্যদের হস্তগত হয়ে পড়তো।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ঐ দু' বালকের নাম ছিল আছরম ও ছারিম।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা ৩-৪

আলোচ্য আয়াতের كنز শব্দটির অর্থ হল সম্পদ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তা ছিল স্বর্ণ-রৌপ্য।

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা كنز নয়। অর্থাৎ তার জন্যে এ সতর্কবাণী নয়। পক্ষান্তরে, যে সম্পদের যাকাত আদায় না করা হয় তা জমিনের অভ্যন্তরে পুতে রাখা হোক বা না হোক তার জন্যে আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ আয়াতে যে গ্রামবাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উপর যাকাত ফরজ ছিল না, এজন্যেই হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, তাদের জন্যে গুপ্তধন সঞ্চয় করা হালাল ছিল।

আল্লামা বগভী সাঈদ এবনে জোবায়েরের সূত্রে লিখেছেন, দেয়ালের নীচে যে সম্পদ সঞ্চিত ছিল, তা ছিল মূল্যবান গ্রন্থ সমূহ।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেয়ালের নীচে যে সম্পদ ছিল তা স্বর্ণ-রৌপ্য নয়, বরং তা সহীফা ছিল। এবনে আবি হাতেম রবী এবনে আনাসের এ মতেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রাচীরের নীচে স্বর্ণের একটি ফলক ছিল আর তাতে লেখা ছিল, আশ্চর্য সে ব্যক্তির জন্যে যে মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরপর সে কিভাবে আনন্দিত হয়! বিস্ময়কর বিষয় এই, যে তকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে, এরপর কিভাবে সে মর্মাহত হয়! আশ্চর্য সে ব্যক্তির জন্যে, যার একীন আছে যে রিয্ক অবশ্যই পাওয় যাবে, এরপরও সে রিয্কের অনুসন্ধানে কেন ক্লান্ত হয়! আরো লিপিবদ্ধ ছিল, আশ্চর্য সে ব্যক্তির জন্যে যে দুনিয়ার এ জীবনের অবসানের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরপরও অর্জিত সম্পদের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ে। ঐ ফলকের অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, আমিই আল্লাহ, আমিই একক, আমার কোন শরীক নেই, ভাল মন্দ আমিই সৃষ্টি করেছি, আনন্দ সে ব্যক্তির, যাকে আমি কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং যার হাতে আমি কল্যাণকে জারী করেছি। আর ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্যে, যাকে আমি মন্দের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং যার দ্বারা আমি মন্দকে জারী করেছি।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৫৭-৫৮

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

"আর তাদের পিতা ছিল নেককার"।

কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সে ব্যক্তির নাম ছিল কাশেহ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পিতার নেকীর কারণে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এতিমের সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত খিজির (আঃ)-কে ঐ প্রাচীর ঠিক করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত মোহাম্মদ এবনে মুনকাদের (রঃ) বলেছেন, কোন বন্দা যদি নেককার হয় তবে তার নেকীর কারণে আল্লাহ পাক তার সন্তান-সন্ততি এবং তাদের সন্তান-সন্ততি তথা তার বংশধরদের হেফাজত করেন এমনকি, তার প্রতিবেশীরও হেফাজত করেন।

সাঈদ এবনে মোসাইয়েব (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি যখন নামাজ আদায় করি তখন কখনও আমার সন্তানদের খেয়াল আসলে আমি আমার নামাজ বাড়িয়ে দেই যাতে করে নামাজের কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজত করেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এ নেককার ব্যক্তি ঐ এতীমদের পিতা ছিলেন না; বরং তাদের সপ্তম স্তরের পিতামহ ছিলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তির নেকীর শুভ-পরিণতি তার বংশের সপ্তম স্তর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এবনে আবি হাতেম, সোলায়মান এবনে সালীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক কোন নেককার ব্যক্তির নেকীর কারণে তার বংশধরদের সপ্তম স্তর পর্যন্ত হেফাজত করেন। পক্ষান্তরে কোন মন্দ লোকের মন্দ কর্মের পরিণতি স্বরূপ তার বংশধরদের মধ্যে সপ্তম স্তর পর্যন্ত ধ্বংস অব্যাহত থাকে।

فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا

"তাই আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে উভয় বালক যৌবন বয়সে পৌঁছে"।

আলোচ্য আয়াতের اشد শব্দটির অর্থ হল, যখন তার বিবেক বুদ্ধি পূর্ণ হয়। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) মতে, যখন কোন মানুষের বয়স পঁচিশ বছর হয় তখন তাকে পূর্ণ বুদ্ধিমান বলা যায়, যদি এ বয়সেও কারো বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণ না হয় তবে তা আর কখনও হয় না।

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ যখন তারা পূর্ণ বুদ্ধিমান হবে, নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে, তখন তারা তাদের জন্যে রক্ষিত গুপ্তধন বের করে নেবে। আর এটিই হল তাদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের রহমত। ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও লিখেছেন, আমি যা কিছু করেছি তা এজন্যে যেন আল্লাহ পাকের রহমত প্রকাশ পায়।

وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ

আর যা কিছু আমি করেছি এর কোনটিই আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি, বরং আল্লাহ পাকের আদেশ-ক্রমেই করেছি। কেননা কারো কোন সম্পদ নষ্ট করা অথবা কোন লোককে হত্যা করা আল্লাহ পাকের ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত বৈধ হতে পারেনা। এসব বিষয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই আমি কাজ করেছি। আর এ হল সে সব বিষয়, যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেননি।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ) থেকে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। হযরত খিজির (আঃ) বললেন, জ্ঞানের অন্বেষণ করুন, এলম হাসিল করুন তার উপর আমল করার জন্যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্যে নয়।

শিক্ষনীয় বিষয়

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, এ ঘটনা দ্বারা আমাদের জন্যে যা শিক্ষনীয় তা এই, কোন ব্যক্তিরই তার এলমের জন্যে গর্ব করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন কথা অপছন্দনীয় হলে, তথা সঠিক বলে মনে না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা হয়তো এর পেছনে এমন কোন রহস্য থাকে যা তার অজানা রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন ব্যক্তির কথা যদি সঠিক মনে না হয়, আর সে ব্যক্তি দ্বীনদার পরহেযগার আলেম হয়, তবে তার কথা সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করা অনুচিত, বরং তার নিকট থেকে আরো এলম হাসিল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং যিনি শিক্ষা দেন তার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত, তার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আর যদি দেখা যায় তিনি বার বারই ভুল করে যাচ্ছেন তবে তার নিকট থেকে দূরে থাকা উত্তম। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনা থেকে এমনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত খিজির (আঃ) সম্পর্কে আরো কিছু কথা

অধিকাংশ আউলিয়ায়ে কেরাম হযরত খিজির (আঃ) সম্পর্কে এ মত পোষণ করেন যে তিনি জীবিত আছেন, কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। আর যারা তাঁকে জীবিত মনে করেন না তাদেরও দলিল রয়েছে যা ইতিপূর্বে তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চদশ খন্ডে বর্ণিত হয়েছে।[২] এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন অন্যান্য গ্রন্থ।[৩] তবে এ বিষয়ে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, খিজির (আঃ) জীবিত আছেন কি? তিনি এ

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬২

২। তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা ৪৬৮-৭০

তোহফাতুয্যাকেরীন, শরহে হেসনে হাসীন, কৃত শওকানী (রঃ), পৃষ্ঠা-২৬১

ফতহুল বারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১১

প্রশ্নের জবাবের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকলেন। একদিন মোরাকেবা অবস্থায় হযরত খিজির (আঃ) তাঁর সম্মুখে আগমন করলেন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি এবং ইলিয়াস আমরা জীবিত নই, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের রূহকে এত শক্তি দান করেছেন যে আমরা দেহের আবরণ পরিধান করে কখনও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করি, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করি, আর আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে কোন কোন ব্যক্তিকে এলমে লুদুন্নীও দান করি। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আমাদের থেকে গড়ে ওঠে। যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুব, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাঁর উপর অর্পিত, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর সাহায্যকারী মনোনীত করেছেন। বর্তমানে তিনি ইয়ামনে অবস্থান করছেন, তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী, আমরাও ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)-এর অনুসারী এবং তাঁর মাজহাব মোতাবেকই আমরা নামাজ আদায় করি।[১]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۭ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝٨٣
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝٨٤ فَاَتْبَعَ
سَبَبًا ۝٨٥ حَتّٰٓي اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ڛ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ
تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝٨٦ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ
نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨٧ وَاَمَّا مَنْ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۗءَۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا
يُسْرًا ۝٨٨ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٩ حَتّٰٓي اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ
عَلٰي قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝٩٠ كَذٰلِكَ ۭ وَقَدْ اَحَطْنَا
بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬১

তরজমা

(৮৩) (হে রসূল!) আপনাকে লোকেরা জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করবো।

(৮৪) নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম।

(৮৫) এরপর সে একটি পথ অবলম্বন করে।

(৮৬) চলতে চলতে অবশেষে যখন সে সূর্যাস্ত স্থলে পৌঁছে, তখন সে এক চোরাবালি-নির্ঝরে সূর্যকে অস্তগমন করতে দেখে এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়কেও দেখতে পায়। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদয় ভাব গ্রহণ করতে পার।

(৮৭) জুলকারনাইন বললো, যে-কেউ অন্যায় করবে, আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব, এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

(৮৮) আর যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে তার জন্যে প্রতিদান হলো কল্যাণ এবং আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ প্রদান করবো।

(৮৯) আবার সে এক পথ ধরলো।

(৯০) চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌঁছলো তখন সে দেখলো যে তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হয় যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।

(৯১) এটিই প্রকৃত ঘটনা, তার নিকটের সংবাদ যে আমি সবই আয়ত্ব করে রেখেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। একঃ রূহের তাৎপর্য, দুইঃ আসহাবে কাহফ, তিনঃ জুলকারনাইন। এ সূরার শুরুতে আসহাবে কাহফের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর সূরার শেষে জুলকারনাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

জুলকারনাইন

জুলকারনাইন একজন অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের রাজত্ব দান করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের রাজা-বাদশা তথা শাসনকর্তাগণ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রকাশ্যে তিনি ক্ষমতাধর বাদশাহ ছিলেন আর অন্যদিকে দরবেশ ছিলেন। ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ এবং আল্লাহর ওলী ছিলেন তিনি।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাঁকে জুলকারনাইন এজন্যে বলা হতো যে তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, সূযের উদয় ও অস্তের স্থান তিনি দেখেছিলেন। আর পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আর সূফী-সাধকগণ বলেছেন, তাঁকে জুলকারনাইন এজন্যে বলা হয়- আল্লাহ পাক তাঁকে জাহেরী এবং বাতেনী এলম দান করেছিলেন।

লক্ষ্যণীয়, আসহাবে কাহফ পৌত্তলিক জালেম রাজার অকথ্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে পাহাড়ের গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন।

পক্ষান্তরে, জুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজের ন্যায় অশান্তি সৃষ্টিকারী জালেমদেরকে পাহাড়ের পেছনে ঠেলে দিয়ে শীশা ঢালা প্রাচীর তৈরী করেছিলেন। যাতে করে জালেমরা এসে অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আসহাবে কাহফ জালেমদের ভয়ে আত্ম-গোপন করেছিলেন। আর জুলকারনাইন জালেমদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়েছেন। জুলজারনাইনের ঘটনায় দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। একদিকে তাঁর রাজকীয় শান-শওকত, অসাধারণ ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ, আর অন্য দিকে তাঁর কারামত এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির যে বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তা মানব-ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

বর্ণিত আছে যে জুলকারনাইন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে মোছাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সফর তাঁর জন্যে সহজ হয়ে যায়। অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। হযরত খিজির (আঃ) তাঁর উজির বা সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ পাক জুলকারনাইনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাশাপাশি এলম এবং হেকমতও দান করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ পাক বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তারা তাঁকে ভয় করতো।

ইহুদীদের পরামর্শক্রমে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রশ্ন করেছিল যে, কোন্ বাদশাহ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য ভ্রমণ করেছিল? তাঁর ঘটনা কি?

আলোচ্য আয়াত সমূহে কাফেরদের ঐ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ

"আর (হে রসূল!) তারা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করে"।

বস্তুতঃ জুলকারনাইন অত্যন্ত নেককার বাদশাহ ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেভাবে আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বাতাসের

উপর নিয়ন্ত্রণ দান করেছিলেন, ঠিক তেমনি জুলকারনাইনকে জমিনের উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন। সারা পৃথিবীর পথ-ঘাট সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁকে জ্ঞান দান করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, চার ব্যক্তি সারা পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিল। তন্মধ্যে দু'জন মোমেন আর দু'জন কাফের। মোমেন হলেন জুলকারনাইন ও হযরত সোলায়মান (আঃ)। আর কাফের দু'জন হল বখতে নসর ও নমরূদ এবং পঞ্চম ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন ইমাম মাহ্দী (আঃ)। তিনি শেষ জমানায় আত্ম প্রকাশ করবেন এবং সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবেন। পূর্বোল্লেখিত চারজন সাবেক উম্মত সমূহে হয়েছিলেন। আর ইমাম মাহ্দী (আঃ) হবেন উম্মতে মোহাম্মদীয়া থেকে। কারো কারো ধারণা, রোমের ইস্কান্দর বাদশাহর উপাধি ছিল জুলকারনাইন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জুলকারনাইন অন্য একজন বাদশাহ, যিনি রোমের ইস্কান্দর থেকে দু' হাজার বছর পূর্বে ছিলেন। কেননা পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে যে জুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার, প্রকৃত অর্থে মর্দে মোমেন, ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর রোমের ইস্কান্দর ছিল কাফের মুশরেক, তার উজির ছিল আরাসতাতালীস। সে শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ তার হয়নি। সে ইয়াজুজ মাজুজকে প্রতিরোধ করার জন্যে কোন প্রাচীর নির্মাণ করেনি। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে তার উল্লেখ করেননি। পবিত্র কোরআনে জুলকারনাইনের কথা স্থান পেয়েছে।[১]

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ

"তারা (ইহুদী অথবা মক্কার মুশরেকরা পরীক্ষামূলক) আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করে"।

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি লিখেছেনঃ আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন যে কোন কোন আলেমের মতে, জুলকারনাইনের নাম ছিল মারজুবান বিন মারজিয়াহ। তিনি স্পেনের লোক ছিলেন, ইয়াফেছ বিন নূহের বংশোদ্ভুত ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিরীয় ছিলেন এবং নাম ছিল সেকান্দর বিন কিবলীস বিন ফিলকূস।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তির মতে, দ্বিতীয় বক্তব্যটি অধিক যুক্তিসঙ্গত।

শিরাজী (রঃ) "আল-আলক্বাবে" বর্ণনা করেছেন, এবনে এসহাক ও এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম ওয়াহাব এবনে মুনাব্বাহ্ ইয়ামানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওয়াহাব এবনে মুনাব্বাহ্ ঐতিহাসিক ঘটনার বড় আলেম ছিলেন। তাঁদের মতে জুলকারনাইন রুমী ছিলেন, এক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান ছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সেকান্দর। এবনুল মুনজের (রঃ) লিখেছেন যে তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এ মত পোষণ করতেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-১০৬

জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, জুলকারনাইনের নবী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। আবুল ফোজায়েলের বর্ণনা হল, হযরত আলী (রাঃ)-কে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি কি নবী ছিলেন? না বাদশাহ? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তিনি নবীও ছিলেন না বাদশাহও ছিলেন না; বরং এমন এক বন্দা ছিলেন, যিনি আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত রাখতেন আর আল্লাহ পাকও তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করতেন, আর আল্লাহ পাক তাঁকে কল্যাণ দান করেন।

এবনে মরদবিয়া সালেম এবনে আবিল জোদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে জুলকারনাইন আল্লাহ পাকের অত্যন্ত অনুগত বন্দা ছিলেন, আর আল্লাহ পাকও তাঁর আন্তরিকতার কদর করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জুলকারনাইন বলে ডেকেছিল। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের নামে নামকরণ করা যথেষ্ট মনে করোনি এখন ফেরেশতাদের নামও ব্যবহার করতে শুরু করেছ।

নামকরণের কারণ

আল্লামা বগভী লিখেছেন যে জুলকারনাইন নামকরণ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. সূর্যের দু'টি প্রান্ত রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। জুলকারনাইন উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

২. তিনি রোম এবং পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

৩. দুনিয়ার আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় অঞ্চলেই তিনি প্রবেশ করেছেন। আলোকিত অঞ্চল অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ লোকদের দেশ যেমন ইউরোপ, আর অন্ধকার অঞ্চল অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গাদের দেশ যেমন আফ্রিকা।

৪. জুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সূর্যের উভয় প্রান্তকে স্পর্শ করেছেন।

৫. তাঁর দু'টি অতি সুন্দর জুলফ ছিল।

৬. তাঁর মাথায় শিং এর মত দু'টি স্থান ছিল, যা তিনি (আমামা) পাগড়ী দ্বারা ঢেকে রাখতেন।

৭. আবু তোফায়েল বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রাঃ) জুলকারনাইন নামকরণের এ প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন যে তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহ পাককে ভয় করার উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর মাথার ডান দিকে আঘাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে পুনঃজীবন দান করেন, তিনি পুনরায় তাঁর জাতিকে আল্লাহ পাককে

ভয় করার উপদেশ দেন, তখন তারা তাঁর মাথার বাম দিকে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ পাক পুনরায় তাঁকে জীবিত করেন ('করণ' শব্দটির অর্থ হল মাথার ডান বা বাম দিকের উঁচু স্থান)।

ইমাম আহমদ (রঃ) "আয জুহদ" নামক গ্রন্থে এবং এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম ও আবুশ শেখ আল আজমত গ্রন্থে আবুল ওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইনের শিং দু'টি কেমন ছিল, তোমরা হয়তো মনে করতে পার যে সোনালী বা রূপালি দু'টি শিং ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল না; বরং তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর উম্মতের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে সত্যের দাওয়াত দেন, লোকেরা তাঁর মাথার বাঁ দিকে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে পুনঃজীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তাঁর মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দেয় যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর জুলকারনাইন নামকরণ করেন।[১]

قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট তার সম্পর্কে বর্ণনা করবো"।

শানে নুজুল

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আপনি ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করেন। তাঁদের নাম হয়তো আমাদের নিকট থেকেই শ্রবণ করেছেন। এখন এমন একজন নবীর সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বলুন, যার আলোচনা তৌরাতে মাত্র এক জায়গায় রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার কথা বলছো? তারা বললো, আমরা জুলকারনাইনের কথা বলছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার নিকট কোন কথা এখনও পৌছেনি।

এ জবাব শ্রবণ করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হল, তারা মনে করলো যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জবাব দিতে অপারগ হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

(তাদের এ উপলব্ধির জন্যেই তারা আনন্দিত হয়) এরপর তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে থেকে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তাঁর গৃহের দ্বারা পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল হল।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৬১-৬৩

এবনে আবি হাতেম এ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আহলে কেতাবের কয়েকজন হাযির হল। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ তাঁর সম্পর্কে আমার কোন এলম নেই। আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই গৃহের ছাদের উপর এক প্রকার শব্দ শ্রুত হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার সময়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হল। একটু পরেই তিনি এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করতে লাগলেনঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ

এরপর তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে খবর এসে গেছে, আপনার জন্যে তা যথেষ্ট।

ইমাম সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, পৃথিবীতে সর্ব প্রথম যিনি পাগড়ী ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন জুলকারনাইন। যেহেতু তাঁর মাথার ডানে ও বামে কাফেরদের আঘাতের কারণে শিং এর ন্যায় উঁচু হয়েছিল। তিনি পাগড়ী পরিধান করে ঐ উঁচু স্থানটি গোপন রাখতেন।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ

"নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম, সে যেমন ইচ্ছা পৃথিবীতে আদেশ জারি করতো"।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, মেঘমালাকে আল্লাহ্ পাক জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহন করতেন। তাঁর উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্যে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাত দিন তাঁর জন্যে ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেয়ার তাৎপর্য হল, পৃথিবীতে চলাফেরা তাঁর জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হল, তাঁর জন্যে সর্বত্র সর্বপ্রকার যান-বাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনে বা মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে তাঁর গতি রোধ করা হতো না, তাঁর ভ্রমণ বন্ধ হতো না।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

"আর আমি তাকে সব জিনিসের সরঞ্জাম দান করি"।

অর্থাৎ তার সকল প্রয়োজনের আয়োজন আমি করে দেই, যেদিকে সে গমনের ইচ্ছা করতো আমি তাকে তার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতাম। অথবা এর অর্থ হল, দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যা কিছুর প্রয়োজন হতো, আমি জুলকারনাইনকে তার সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। অথবা এর অর্থ হল, জমিনের শেষ প্রান্ত আমি তার নিকটে করে দিয়েছি। হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের سببا এর ব্যাখ্যা করেন بلغا দ্বারা অর্থাৎ আমি জুলকারনাইনকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌছার জন্যে যাবতীয় সরঞ্জাম দান করি।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا

"এরপর সে একটি পথ অবলম্বন করে"।

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

অবশেষে যখন সে সূর্যাস্ত স্থলে উপস্থিত হয়, তখন সে এক চোরাবালি নির্ঝরে সূর্যকে অস্ত গমন করতে দেখে। অর্থাৎ জুলকারণাইনের একান্ত আকাংক্ষা হয় যে তিনি পৃথিবীর শেষ সীমা দেখবেন। এ উদ্দেশে তিনি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে যেতে থাকেন। অবশেষে এমন এক স্থানে পৌঁছেন যেখানে চোরাবালি ব্যতীত আর কিছুই নেই, যেখানে মানুষ পদব্রজে যেতে পারে না, আর নৌকাও চলেনা।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌঁছানোর সাধ্য কার?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মায়াবীয়া (রাঃ) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সূর্য কিভাবে অস্ত যায়, তৌরাতে তুমি এ সম্পর্কে কি পাঠ করেছ? কা'ব বলেন, আমরা তৌরাতে পেয়েছি সূর্য পানি এবং কাদার মধ্যে অস্ত যায়।

আল্লামা বয়যাভী লিখেছেন, হয়তো জুলকারনাইন সমুদ্রের এক প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর সেখানে তিনি উপলব্ধি করেন যেন সূর্য চোরাবালিতে অস্ত গমন করছে। কেননা, তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত চোরাবালি ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَدَهَا تَغْرُبُ

অর্থাৎ সূর্যকে সে চোরাবালিতে অস্ত গমন করছে বলে উপলব্ধি করে।

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

জুলকারনাইন সেখানে একটি সম্প্রদায়কেও দেখতে পায়।

আল্লামা বয়যাভী লিখেছেন, ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা চামড়ার তৈরী পোশাক পরিধান করতো, তারা ছিল কাফের। আর সমুদ্রের মাছ অথবা সামুদ্রিক প্রাণীই ছিল তাদের আহার্য বস্তু।

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

"আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার, অথবা তাদের ব্যাপার সদয় ভাবে গ্রহণ করতে পার"।

অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও। যদি তারা এ আহবানে সাড়া না দেয় এবং কুফরী ও নাফরমানীতেই লিপ্ত থাকে এমন অবস্থায় তাদের শাস্তি বিধান কর, তাদেরকে হত্যা কর। পক্ষান্তরে, যদি তারা তওবা করে, ঈমান আনে তবে তাদেরকে সম্মানিত কর, তাদেরকে হেদায়াত কর, তাদেরকে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত কর। তাদেরকে শরীয়তের বিধান শেখাও। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী

বলেছেন, এ আয়াতের اما শব্দটির তাৎপর্য হল, জুলকারনাইনকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পার। কেননা তারা কাফের। আর তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে বন্দী করে রাখতে পার অথবা তোমার মধুর ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পার। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

"জুলকারনাইন বললো, যে কেউ অন্যায় করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব। এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন"।

জুলকারনাইন বললো, যে জুলুম অত্যাচার করবে আমি তাকে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দেব। তবে দুনিয়ার এ শাস্তিই শেষ নয়; বরং তারা যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট হাযির হবে, তখন তিনি তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেবেন। যেহেতু তারা কাফের ছিল তাই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى

আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তার জন্যে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا

"আর আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ দেব"।

অর্থাৎ কঠিন নির্দেশ দেবনা। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, উত্তম নির্দেশ দেব।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক সরাসরি জুলকারনাইন সম্বোধন করেছেন এবং ওহী প্রেরণ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে জুলকারনাইন নবী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী ছিলেন না, আর তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা ওহী নয়; বরং এলহাম যা ওলী আল্লাহগণের হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হয়তো কোন নবীর মাধ্যমে জুকারনাইনকে এই বাণী পৌঁছানো হয়েছে, হতে পারে তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে কোন নবীকে তাঁর সঙ্গে মোতায়েন করেছিলেন।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا

এরপর সে পূর্ব দিকে একটি পথ অবলম্বন করলো।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

এমনকি সে সূর্যের উদয়-স্থল পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا

অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয় স্থলে পৌঁছে গেল তখন সে সূর্যকে এমন লোকদের উপর উদয় হতে দেখলো, যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোন আড়াল রাখিনি। অর্থাৎ তাদের কোন পোশাক ছিলনা, তাদের কোন বাড়ী-ঘরও ছিলনা। যদ্বারা তারা সূর্য থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে পারতো। আর সেখানকার জমিন বাড়ী-ঘর নির্মাণের যোগ্যও ছিলনা।

كَذٰلِكَ

জুলকারনাইনের ঘটনা এমনই ছিল। অর্থাৎ জুলকারনাইনের ক্ষমতা, অসাধারণ শক্তি-সামর্থ এমনই ছিল যেমন আমি বর্ণনা করেছি। অথবা এর অর্থ হল, প্রাচ্যবাসীর সাথে তাঁর ব্যবহার এমনই ছিল, যেমন প্রতীচ্যবাসীর সঙ্গে ছিল। অথবা এর অর্থ হল, জুলকারনাইন যেভাবে সূর্যকে চোরাবালিতে অস্ত যেতে দেখেছেন, ঠিক তেমনি চোরাবালি থেকে উদয় হতেও দেখেছেন। অথবা এর অর্থ হল, যেভাবে প্রতীচ্যবাসীর জন্যে আমি সূর্য থেকে কোন আড়াল রাখিনি, ঠিক তেমনি প্রাচ্যবাসীর জন্যেও সূর্য থেকে কোন আড়াল রাখিনি।

وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

"আর জুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল তার যাবতীয় সংবাদ আমি আয়ত্ব করে রেখেছি"।

অর্থাৎ জুলকারণাইনের নিকট কত সৈন্য ছিল, কি আসবাবপত্র ছিল, আর কত যুদ্ধাস্ত্র ছিল, এক কথায় জুলকারনাইনের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ, আসবাবপত্র সবকিছু সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল ছিলাম। احطنا শব্দটির দ্বারা সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এবং তাঁর অসাধারণ শক্তি-সামর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।[১]

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا
يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا
مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৬

তরজমা

(৯২) পুনরায় সে এক পথ ধরলো।

(৯৩) চলতে চলতে অবশেষে যখন সে দু'টি পর্বতের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সেখানে সে এমন এক সম্প্রদায়কে পায় যারা তার কোন কথাই বুঝতে পারছিল না।

(৯৪) তারা বলে, "হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের দেশে দারুণ অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করছে, আমরা কি তোমাকে কর আদায় করবো এ শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেবে"।

(৯৫) জুলকারনাইন বললো, "আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, তাই উত্তম। অতএব, তোমরা আমাকে সাহায্য কর তোমাদের শ্রম দ্বারা, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরী করে দেব"।

(৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন তা উভয় পাহাড়ের চূড়ার সমান হয়ে যায়, তখন সে বলে, তোমরা আগুন ফুঁক, এমনকি এই ফুঁক যখন তাকে আগুনে পরিণত করে তখন জুলকারনাইন বলে, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ঢেলে দেই এর উপর।

তফসীরুল কোরআন

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

"জুলকারনাইন পুনরায় একটি পথ অবলম্বন করলো"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ পথ ছিল দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ

অবশেষে যখন সে দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে পৌঁছে, তখন সে এমন একটি জাতিকে দেখতে পায়, যারা কোন কথাবার্তা বুঝতে পারেনা। হয়তো কোন দোভাষীর সাহায্যে জুলকারনাইন এবং তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এ জাতি এবং ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে দু'টি অত্যন্ত উঁচু পাহাড় ছিল, যা ইয়াজুজ মাজুজরা অতিক্রম করতে সক্ষম হতো না, তাই তারা উভয় পাহাড়ের মধ্যেকার গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করতো এবং জুলুম-অত্যাচার করতো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ দু'টি পাহাড় আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানে অবস্থিত। এবনুল মুনজের লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকেও এ মত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যেখানে তুর্কদের সীমান্ত শেষ, তাদের উত্তর দিকে দু'টি পাহাড়ে ইয়াজুজ মাজুজরা অবস্থান করছে। এ মত পোষণ করেছেন সাঈদ এবনে মনসুর, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম। তাঁরা নিজ নিজ তফসীরে একথা উল্লেখ করেছেন।

قَالُوا يٰذَاالْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

"তারা বলেছে, "হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের দেশে এসে অশান্তি সৃষ্টি করে, লুণ্ঠন এবং হত্যাকান্ড ঘটায়। আমাদের ফল-ফসলকে ধ্বংস করে"।

জুলকারনাইনের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে সেখানকার অধিবাসীরা এই আবেদন করে যেন তাদেরকে জুলকারনাইনের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়। জুলকারনাইনের নিকট তারা একথাও বলে, যদি আপনি আমাদেরকে ইয়াজুজ মাজুজের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাস্তব ব্যবস্থা করে দেন এবং আমাদের উপর কোন করারোপ করেন তবে আমরা তা আদায়ে প্রস্তুত রয়েছি।

ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয়

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজ ইয়াফেস এবনে নূহের বংশধর। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তারা তুর্কদের বংশধর। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, তুর্কীরা ইয়াজুজদের একটি সৈন্যদল ছিল। জুলকারনাইন যখন অত্যন্ত মজবুত লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করলেন, তখন তারা ঐ প্রাচীরের পেছনেই রয়ে গেলো।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ইয়াজুজের বাইশটি গোত্র ছিল। জুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করলেন তখন তাদের একটি গোত্র এদিকে রয়ে গেল। আর একুশটি গোত্র দেয়ালের পেছনে রয়ে গেল। যারা এদিকে রয়ে গেল তারাই তুর্ক।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র ছিল। সাম, হাম এবং ইয়াফেস। আরব, পারস্য এবং রোমে সামের বংশধররা আবাদ হয়েছে। আর আফ্রিকায় আবাদ হয়েছে হামের বংশধররা। আর ইয়াফেসের বংশধররা হল তুর্ক এবং ইয়াজুজ মাজুজ। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তফসীরকার আতা (রঃ)। তিনি বলেছেনঃ সমগ্র মানব জাতির দশগুণ অধিক হল ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইয়াজুজের সম্প্রদায় স্বতন্ত্র এবং মাজুজের সম্প্রদায়ও স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের সংখ্যা চার লক্ষ। তারা আদম সন্তান। তাদের কারো মৃত্যু হয় না যে পর্যন্ত না সে তার বংশধরদের মধ্যে এক হাজার ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় না দেখে যে তারা অস্ত্র ধারণ করতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজ তিন প্রকার। এক প্রকার হল এমন যে তাদের প্রত্যেকে একশত বিশ হাত লম্বা। আর দ্বিতীয় প্রকারের দৈর্ঘ এবং প্রস্থ সমান। দৈর্ঘ একশত ত্রিশ হাত এবং এতখানিই তারা চওড়া। তাদের সম্মুখে কোন পাহাড়ও টিকতে পারে না। তৃতীয় প্রকার হল সে সব লোক যারা তাদের একটি কান বিছিয়ে রাখে, আর একটি কান গায়ে দেয়। কেয়ামতের পূর্বে তারা বের হয়ে আসবে। ঘোড়া শুকর বা জংলী জন্তু তাদের সম্মুখে আসলে তারা তা খেয়ে ফেলবে। তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তারা তাকে খেয়ে ফেলে। যখন তারা বের হবে তখন পূর্ব পশ্চিমের সকল সমুদ্রের পানি

পান করে ফেলবে। এ দুর্ধর্ষ জাতি মানুষকে খেয়ে ফেলতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করবেনা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাদের দেশ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এদেশের উত্তর দিকে এমনি একটি সমুদ্র রয়েছে যার পানি শীতল হওয়ার কারণে জমাট হয়ে থাকে, ফলে তাতে জাহাজ চলাচল সম্ভব হয়না। এ সমুদ্রের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি পাহাড় দণ্ডায়মান রয়েছে। এ দু' পাহাড়ের মাঝে যাতায়াতের কোন পথ নেই, পাহাড় দু'টির মধ্যে এমন একটি গোপন ঘাটি রয়েছে, যে ঘাটি থেকে ইয়াজুজ মাজুজ বেরিয়ে আসতো এবং লুটতরাজ করতো। জুলকারনাইন একটি অত্যন্ত মজবুত লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করলেন। যার উচ্চতা হবে প্রায় ঐ পাহাড় দু'টির সমান এবং মোটা হবে ষাট গজ। আর সে প্রাচীর দ্বারা তিনি ঘাটির পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। তারা সারাদিন ঐ প্রাচীর ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু রাত্রে আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম কুদরতে ঐ প্রাচীরকে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ঐ প্রাচীরে সামান্য পরিমাণে ছিদ্র হয়েছে। কিন্তু এখনও এতটুকু পর্যন্ত ছিদ্র হয়নি যার মধ্য দিয়ে কোন মানুষ বের হতে পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইয়াজুজ মাজুজ প্রতি দিন প্রাচীরে ছিদ্র করতে চেষ্টা করে এমনকি, তারা সূর্যের আলোর নিকটবর্তী হয়। এমন সময় তাদের নেতা তাদেরকে বলে, আজ থাক, আগামীকাল অবশিষ্ট কাজ করবো। কিন্তু পরের দিন হাযির হয়ে দেখে যে প্রাচীর পূর্বের ন্যায় হয়ে আছে। আর যখন তাদের বের হওয়ার সময় হবে, অর্থাৎ যখন তাদেরকে বের করা আল্লাহ পাকের মর্জি হবে তখন তাদের নেতা বলবে, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা দেয়াল ছিদ্র করবো। আর পরের দিন তারা দেয়াল ছিদ্র করে তথা প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং হত্যা, অত্যাচার- অবিচার, লুটতরাজ ও মানুষকে বন্দী করার কাজে লিপ্ত হবে এবং বলবে, এতক্ষণে আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করেছি এখন আসমানবাসীদেরকে ধ্বংস করবো। সুতরাং তারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরতে ঐ তীরের মাথায় একটু রক্ত মিশিয়ে ফিরিয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে আরম্ভ করবে যে, এখনতো আমরা ব্যতীত আর কেউ রইলো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শবে মে'রাজে আল্লাহ্ পাক আমাকে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের দিকে তথা তাঁর বন্দেগীর দিকে আহবান করি। কিন্তু তারা আমার আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাই তারা হবে দোযখী। বণী আদমের মধ্যে যারা কাফের হবে তাদের এবং ইবলীসের বংশধরদের সঙ্গে ইয়াজুজ মাজুজরাও দোযখে থাকবে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বগভীর (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে আরো লিখেছেন, কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজের দল জুলকারণাইন নির্মিত

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৫

প্রাচীর ভেঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং অশ্ব, শুকর সহ যাবতীয় জংলী জন্তুও তারা খেয়ে ফেলবে। তাদের দলের প্রথম ভাগ যখন সিরিয়াতে থাকবে তখন পেছনের ভাগ খোরাসানে থাকবে।

(অন্য একটি বিবরণে রয়েছে) তাদের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের দলের অগ্রভাগ যখন তিবরীয়া হৃদে পৌঁছবে তখন তারা হৃদের সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। তিবরীয়া হৃদ তিবরিস্তানের একটি চতুস্কোণ নহর যার প্রশস্ততা দশ ক্রোশ (এক ক্রোশ দু' মাইলের কিছু বেশী) এবং তা অনেক গভীর আর যখন তাদের দলের শেষ ভাগ সেখানে পৌঁছবে তখন তারা একথা বলবে যে মনে হয় এখানে কখনও পানি ছিলনা।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে চরম অশান্তি সৃষ্টি করবে, এমনকি তারা মানুষকে খেয়ে ফেলবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) ওয়াহাব এবনে মোনাব্বাহ এর সূত্রে লিখেছেন, জুলকারনাইন রুমি ছিলেন, আর এক বৃদ্ধার পুত্র ছিলেন, অত্যন্ত নেককার বন্দা ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে এমন সম্প্রদায়ের সংশোধনের জন্যে প্রেরণ করবো, যাদের দুটি সম্প্রদায়ের দূরত্ব হবে পৃথিবীর দৈর্ঘের। এক সম্প্রদায় সূর্যের অস্ত গমনের স্থলে বাস করবে যাদরেকে 'নাসেক' বলা হয়। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় সূর্যের উদয় স্থলে থাকবে যাদেরকে 'মানসাক' বলা হয়। আর দু'টি অন্য সম্প্রদায়ও থাকবে, যাদের মধ্যকার তফাত হবে পৃথিবীর প্রস্থের, পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে যারা থাকবে তাদেরকে বলা হবে হাবীল, আর উত্তরাঞ্চলে যারা বাস করবে তাদেরকে বলা হবে কাবীল। অবশিষ্ট জাতি সমূহ পৃথিবীর মধ্যখানে বাস করবে। তাদের মধ্যে থাকবে জ্বীন, মানুষ এবং ইয়াজুজ মাজুজ।

জুলকারণাইন আরজ করলেন, তখন আমি কোন্ জাতিকে সঙ্গে নিয়ে দুর্ধর্ষ জাতির মোকাবেলা করবো? আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি তোমাকে শক্তি দান করবো, আমি তোমাকে ভাষা শিক্ষা দেব, আমি তোমার বাহুকে শক্তিশালী করবো, তোমাকে কোন কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে না, উচ্চ মর্তবা এবং ভয়-ভীতির পোশাক তোমাকে পরিধান করাবো, কোন কিছু তোমার গতি রোধ করতে পারবে না। আমি আলো আঁধারকে তোমার অনুগত করে দেব, আর উভয়কে তোমার সাহায্যকারী বানিয়ে দেব। আলো তোমাকে সম্মুখের দিকে পথ দেখাবে আর অন্ধকার পেছন থেকে তোমাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক জুলকারনাইন রওয়ানা হলেন এবং সূর্যের অস্ত গমনের স্থলে পৌঁছে গেলেন। সেখানে দুশমনদের এক বিরাট দলের সাক্ষাত হল। যাদের সংখ্যা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা। জুলকারনাইন অন্ধকারের সাহায্যে তাদের মোকাবেলা করেন। জুলকারনাইন তাদের সকলকে একত্রিত করে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার আহবান জানান। কিছু লোক এ আহবানে সাড়া দেয়, আর কিছু লোক অবাধ্য হয়। যারা অবাধ্য হয় জুলকারনাইন তাদের প্রতি অন্ধকারকে বসিয়ে দেন, যা তাদের দেহে এবং গৃহে প্রবেশ করে। অবশেষে তারা জুলকারনাইনের আহবানে সাড়া

দেয়। এ স্থান থেকে জুলকারনাইন একটি বিরাট সৈন্য বাহিনী তৈরী করেন এবং তাদেরকে নিয়ে তিনি পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছে যান। সেখানেও তাই করেন যা পশ্চিমাঞ্চলে নাসেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে করেছিলেন। এরপর তিনি সূর্যোদয়ের স্থলে মানসাক সম্প্রদায়ের নিকট গমন করেন। এখানে পৌঁছে তিনি তাই করেন যা ইতিপূর্বে দু'টি স্থানে করেছেন। এরপর তিনি পৃথিবীর উত্তর দিকে গমন করেন এবং সে কাজই করেন যা ইতিপূর্বে করেছিলেন। এরপর তিনি পৃথিবীর মধ্যস্থলের জাতিগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। পূর্ব দিকে তুর্কদের সীমান্তে পৌঁছেন। সেখানে ঈমানদার ও নেককার এক দলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আলোচ্য আয়াতে (حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) তাদের সম্পর্কেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমানদার ও নেককার লোকেরা জুলকারনাইনকে বললেন, এ দু'টি পাহাড়ের গিরিপথ ধরে এক দুর্ধর্ষ জাতি আসে, যারা চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়, সাপ বিচ্ছু পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। তাদের সংখ্যা অগণিত। যদি অনুমতি দেন আমরা চাঁদা দেব, আপনি আমাদের প্রতি কর আরোপ করুন এবং তাদের ও আমাদের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিন। জুলকারনাইন বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে যা দিয়েছেন তা উত্তম এবং যথেষ্ট, তোমাদের চাঁদার দরকার হবে না। তোমরা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আমার সাথে সহযোগিতা করবে, আমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। জুলকারনাইন তাদের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায় দন্ত বিশিষ্ট লোক। তাদের সারা দেহে চুল অত্যন্ত বেশী। শীত-গ্রীষ্মে এ চুল দ্বারা তারা আত্মরক্ষা করে। দু'টি বড় বড় কর্ণ বিশিষ্ট চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায় ইয়াজুজ মাজুজকে দেখে জুলকারনাইন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাদের জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি সুউচ্চ, সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا

"আপনি যদি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেন তবে আমরা কিছু মাশুল নিদৃষ্ট করে দেব"।

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ

জুলকারনাইন বললো, তোমাদের আর্থিক সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাক আমাকে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করেছেন। তোমরা শুধু আমাকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দেব।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ

তোমরা আমার জন্যে লোহার পাত এনে দাও।

حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

এরপর লোহার পাতগুলো একের পর এক রাখা হয় এবং তা পর্বতের উঁচু চূড়ার সমান

হয়ে যায়, তখন

قَالَ انْفُخُوا

তিনি বলেন তোমরা আগুন ফুঁক।

حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا

যখন এই ফুঁক তাকে আগুনে পরিণত করে তখন জুলকারনাইন বলে, এর উপর আমি গলিত তাম্র ঢেলে দেই। এভাবে সুউচ্চ, সুদৃঢ় প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ প্রাচীরের প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা একশত হাত, আর দৈর্ঘ ছিল তিন মাইল।[১]

প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য

জুলকারণাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কোরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা এইঃ

প্রথমতঃ এ প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ পাকের কোন মকবুল নেককার বন্দা এবং মর্দে মোমেন হবেন। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শোনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় দেখাবেন।

দ্বিতীয়তঃ এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্ব প্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে প্রদান করা হবে, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তাঁর অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তাঁর হাতে থাকবে। তাঁর মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।

তৃতীয়তঃ ধাতুর তৈরী সে প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইঁট অথবা পাথর দ্বারা সে প্রাচীরের দু' প্রান্ত দু' দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত, সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমন ভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে প্রত্যেকটি লৌহ-ফলক প্রজ্জ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে।

চতুর্থতঃ আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো শীশা ঢালা হয়েছে, এ সকল

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৬৯-৭২

কর্ম-কান্ডে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরূপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোন প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্জলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেয়া স্বাভাবিক নিয়মে তো সম্ভব নয়। তাই এ আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে এছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে এটি সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটি ছিল তাঁর একটি মোজেযা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকট গিয়ে তার উপরে গলানো শীশা ঢালতে পারে। এটি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের খাস রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আগুনের প্রচন্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

পঞ্চমতঃ এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহনও করতে পারে না এবং কোন সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এ প্রাচীরে তারা কোন ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কেয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে।

ষষ্টতঃ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।

সপ্তমতঃ ছহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এ প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় পূর্বে ন্যায় পুরু এবং মোটা হয়ে যায়। তবে কেয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ-র বরকতে ঐ প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে যাবে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।

অষ্টমতঃ ইয়াজুজ মাজুজ মানুষ হওয়া সত্বেও সাধারণ মানুষের চাইতে তারা অনেক বেশী শক্তিশালী হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম-সন্তানের মধ্যে সেরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সুতরাং সবাই জাহান্নামী।

নবমতঃ ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে ঈসা (আঃ)-এর আগমনের যমানায়। সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোন দূর্গ অথবা বাড়ীতে হেফাজতে থাকবে।

দশমতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর বদ দোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ পাক মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দেবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এ দশটি বৈশিষ্ট্য হলো সে প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কোরআনে পাকে উল্লেখ

হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীস সমূহে উল্লেখিত হয়েছে।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

বৈজ্ঞানিক এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন যে আমরা সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও জুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

এর জবাবে আমাদের কিছু কিছু গ্রন্থকার যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং গবেষণায় আগ্রহী, তারা সে প্রাচীরটির সন্ধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর প্রকৃত জবাব তাই হবে যা আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে লিখেছেন এবং আল-হুছনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে-প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক খরব দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য-কর্তব্য এবং সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থান-স্থল আমাদের জানা নেই। এটি সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল রয়েছে। কথাটি যুক্তি সঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন আমরা সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকী রাখিনি- কথাটি নিছক অযৌক্তিক, তাই একথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুষের পদ-চারণা হতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদগণ পৌঁছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পর্বত বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষেই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। অতএব, ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে জুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সব বরফের পর্বত রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোন মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারেনা। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশস্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোন নিম্ন ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানে হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে জুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোন উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সে পথে পাহাড়ের দিক

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৪৫৮-৫৯

থেকে এসে আশে-পাশের লোকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এ অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দেন এবং পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। অতঃপর সে প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। যখন কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমন্ডল ও ভূ-মন্ডলীয় কোন ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কোরআন এবং হাদীসে একথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

মোটকথা, কোরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তি সঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ পাকের কতৃত্বাধীন, সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরীয়ত সম্মত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এজন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে কেয়ামতের কাছাকাছি কোন এক সময়ে জুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে ভূ-গোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবী যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খন্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন, এ দাবীর সমর্থনে কোন যুক্তি নেই, সুতরাং এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا
رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ
رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ
عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

তরজমা

(৯৭) এরপর তারা আর প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলো না এবং তাতে সুড়ঙ্গও করতে পারেনি।

(৯৮) জুলকারনাইন বললো, এটি আমার প্রতিপালকের বিশেষ মেহেরবানী, এরপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন

এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

(৯৯) সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেব, এ অবস্থায় যে একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, আর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব।

(১০০) এবং সেদিন আমি দোযখকে প্রত্যক্ষভাবে কাফেরদের সম্মুখে উপস্থিত করবো।

(১০১) আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখে পর্দা পড়ে রয়েছিল এবং যারা শ্রবণ করতে পারতো না।

তফসীরুল কোরআন

فَمَا اسْطَاعُوٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهٗ نَقْبًا

অর্থাৎ জুলকারনাইনের দ্বারা ঐ প্রাচীর নির্মিত হওয়ার পর ইয়াজুজ মাজুজ আর ঐ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসতে পারেনি, আর তা অত্যন্ত মজবুত হবার কারণে তারা তাতে কোন ছিদ্রও করতে পারেনি।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ

জুলকারনাইন তখন বললো, এ প্রাচীর আর তা নির্মাণের সামর্থ- এসব কিছুই আমার প্রতিপালকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ অভূতপূর্ব, সুদৃঢ় প্রাচীর শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে আমার কোন কৃতিত্বই নেই। এ অসাধ্য সাধন শুধু আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতেই সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়

লক্ষণীয়, জুলকারনাইন এক অসাধারণ প্রাচীর নির্মাণ করে দুর্ধর্ষ ইয়াজুজ মাজুজকে প্রাচীরের ওপারে বন্দী করেছেন, এটি নিঃসন্দেহে জুলকারনাইনের একটি গৌরবময় অবদান। কিন্তু জুলকারনাইন এজন্যে কোন গর্ব প্রকাশ করেননি, গর্বিত হননি, বরং তিনি বলেছেন,

هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ

"এটি তো শুধু আমার প্রতিপালকের রহমতই"।

অর্থাৎ এ অনন্য-সাধারণ প্রাচীর এবং তার নির্মাণ আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে আমার কোন কৃতিত্বই নেই। এর সব কিছুই আল্লাহ পাকের রহমত, অতএব, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

বস্তুতঃ এটি মানব জাতির জন্যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা। কোন কোন মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে, এবং ঐ অবদানকে উক্ত ব্যক্তির কৃতিত্ব মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই, সে যা করেছে তা শুধু আল্লাহ পাকের রহমত এবং তৌফিকেই করেছে। অতএব, প্রত্যেকের জীবনের সকল

সাফল্যের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর সমীপে মাথা নত রাখাই কর্তব্য।

فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّاۤءَ

"এরপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদার সময় উপস্থিত হবে তখন তা ভেঙ্গে যাবে"।

আলোচ্য আয়াতে "ওয়াদা" শব্দটির তাৎপর্য হলো, কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার জন্যে আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন সে সময়ের উপস্থিতি অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর এবং দজ্জালকে হত্যা করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ ঐ দেয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে আসবে। তাদের সংখ্যা এত বেশী যে কেউ তাদের সংখ্যা নিরুপন করতে পারবে না এবং কেউ তাদেরকে প্রতিরোধও করতে পারবে না। তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আত্মরক্ষা করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করবেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে মহামারী দেখা দেবে, তাদের ঘাড়ে এক প্রকার রোগ দেখা দেবে যার কারণে তাদের সকলের মৃত্যু হবে। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের মূলোৎপাটন করবেন এবং তাদের উপদ্রব থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করবেন।

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا

"আর আমার প্রতিপালকের ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য"।

অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন সে সময় তারা বের হয়ে আসবে। অথবা এর অর্থ হলো, আমার প্রতিপালক যত ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই যথা সময়ে সত্য প্রমাণিত হবে। যেমন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া এবং তার আগে দজ্জাল বের হওয়া এবং আসমান থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ও দজ্জালকে ঈসা (আঃ)-এর হত্যা করা, এরপর ইয়াজুজ মাজুজদের বের হওয়া, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা, অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাদের ধ্বংস হওয়া প্রভৃতি যথা সময় সংঘটিত হবে। কেননা, আমার প্রতিপালকের ওয়াদা ধ্রুব সত্য এবং চিরসত্য।[১]

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর চেহারা মোবারক অত্যন্ত লাল বর্ণ দেখা গেল। তিনি لا اله الا الله পাঠ করে এরশাদ করছিলেনঃ

"আরবদের ক্ষতি সাধনের সময় ঘনিয়ে এসেছে"। আজ ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রাচীরে এতখানি ছিদ্র হয়ে গেছে। এরপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তেরী করে দেখিয়ে দিলেন। তখন উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ!

১। তফসীরে রুহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৯

ভাল লোকদের উপস্থিতিতেও কি আমাদেরকে ধ্বংস করা হবে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, যখন অধিকাংশ লোক মন্দ হয়। এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও সংকলিত হয়েছে।[১]

যেহেতু কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে আর তাদের পূর্বে দজ্জাল এসে মানব জাতিকে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, নাফরমান করার অপচেষ্টায় মেতে উঠবে, তাই আলোচ্য আয়াতের তফসীরে প্রসঙ্গক্রমে তফসীরকারগণ দজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

দজ্জাল প্রসঙ্গ

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মুসলিম শরীফে হযরত নওয়াস এবনে সামআন (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার সকালের দিকে দজ্জালের উল্লেখ করলেন, আলোচনার সময় তাঁর আওয়াজ এমনভাবে ওঠা-নামা করছিল যেন মনে হচ্ছিল দজ্জাল এখানেই উপস্থিত আছে। অতঃপর আমরা যখন অন্য এক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম তখন তিনি আমাদের মধ্যে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের অবস্থা কিরূপ'? আমরা আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি দজ্জালের আলোচনা করেছিলেন তখন আপনার আওয়াজ ওঠা-নামা করছিল, তাতে আমাদের ধারণা হয়েছে দজ্জাল এখানেই কোথাও আছে'। তিনি এরশাদ করলেন, 'দজ্জাল ছাড়াও তোমাদের জন্যে অধিক ভয়ের অপর একটি জিনিস রয়েছে'। কারণ দজ্জাল যদি আমার জীবদ্দশায় আসে তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তার মোকাবেলা করতে পারবো। আর আমি না থাকলে প্রত্যেকে নিজেই মোকাবেলা করবে এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রক্ষা করবেন। দজ্জাল অর্ধ বয়সী এক নওজোয়ান হবে। তার একটি চোখ অন্ধ থাকবে। আমার মতে সে দেখতে আব্দুল উজ্জা বিন কুতুনের অনুরূপ হবে। যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো তার সামনে তেলাওয়াত করে। সে ইরাক এবং সিরিয়ার মাঝখানে হাযির হবে এবং তার ডান ও বাম দিকে লুটতরাজ শুরু করে দেবে। হে আল্লাহর বন্দা সকল! তোমরা (ঈমানের উপর) দৃঢ় পদ থেকো'। আমরা আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! পৃথিবীতে তার অবস্থান-কাল কত হবে'? তিনি এরশাদ করলেনঃ 'চল্লিশ দিন'। ঐ চল্লিশ দিনের প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান। তার পরের দিন হবে এক মাসের সমান, পরের দিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের এই সাধারণ দিনের সমান হবে'। আমরা আরজ করলাম, 'যে-দিনটি এক বছরের সমান হবে সে-দিনটিতে কি এক দিবসের (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজই যথেষ্ট হবে'? তিনি এরশাদ করলেন, 'না। সময়ের ব্যবধান অনুমান করে নিও'। আমরা আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! তার চলার দ্রুততা কিরূপ হবে'? তিনি এরশাদ করলেনঃ 'যেরূপ ধূলির ঝড় মেঘের পেছনে ধাবিত হয়'। কিছু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-১২

লোকের নিকট দিয়ে সে অতিক্রম করবে এবং তাদেরকে সে নিজের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাবে। তখন সেই লোকেরা তাকে মেনে নেবে। দজ্জাল তখন আকাশকে নির্দেশ দেবে যেন সেই লোকদের জন্যে বৃষ্টি বর্ষন করে। সঙ্গে সঙ্গে তখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। জমিনকে নির্দেশ করবে, ফসল উৎপাদন কর। সঙ্গে সঙ্গে জমিন ফসলে ভরে উঠবে। তাদের উষ্ট্রীগুলো যখন জঙ্গল থেকে বিচরণ করে ফিরে আসবে তখন দুগ্ধে পরিপূর্ণ হবে। এরপর দজ্জাল এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাবে, কিন্তু তারা ঐ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। যখন দজ্জাল সেখান থেকে চলে যাবে তখন হঠাৎ তাদের সমস্ত লোক অভাবগ্রস্ত হয়ে যাবে, তাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ থাকবে না। দজ্জাল কোন অনাবাদী স্থান অতিক্রম করার সময় আদেশ দেবে তোমার অভ্যন্তরে যা আছে বের করে দাও। তখন সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচে সংরক্ষিত সম্পদ বের হয়ে তার সঙ্গে চলতে থাকবে। দজ্জাল একজন সুদর্শন যুবককে তরবারী দ্বারা দ্বিখন্ডিত করবে এবং উভয় খন্ডকে আলাদা করে রাখবে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে। দজ্জালের ডাকে উভয় খন্ড একত্রিত হবে এবং ঐ মানুষটি জীবিত হয়ে হাসতে থাকবে। দজ্জাল এ অবস্থায়ই থাকবে, তখন আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পূর্ব দিকের সাদা মিনারের উপর দু'জন ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা অবনত করবেন অথবা উত্তোলন করবেন তখন সাদা মুক্তার ন্যায় তাঁর চেহারা থেকে ঘামের ফোটা পড়বে। তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসের সুগন্ধি পৌছবে। হযরত ঈসা (আঃ) দজ্জালের অনুসন্ধান করবেন এবং লুদ (ফিলিস্তিনের অর্ন্তগত) নামক স্থানে পৌছে দজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি সে সব লোকদের নিকট গমন করবেন, যাদরেকে আল্লাহ্ পাক দজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের চেহারা থেকে ধূলা-বালু পরিস্কার করবেন, আর জান্নাতে তাদের জন্যে যে উচ্চ মর্তবা রয়েছে তার সুসংবাদ প্রদান করবেন। এ সময় হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী আসবে যে আমি (জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীরের ওপার থেকে) আমার এমন বন্দাদেরকে বের করে এনেছি যাদের সাথে লড়াই করার শক্তি কারোরই থাকবে না।

আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেবেন, আমার বন্দাদেরকে কোহে তূরে নিয়ে আস, যেন তারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। হযরত ঈসা (আঃ) কোহে তূরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে (যা আজও বর্তমান আছে) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।[১]

এ ফেতনার দরুন হযরত ঈসা (আঃ) খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবেন। একটা গরুর ঘাসের মূল্য একশত আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) পর্যন্ত হবে। শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ) দোয়া করবেন এবং তাঁর অনুসারীগণ তাঁর পশ্চাতে দন্ডায়মান হয়ে আমিন আমিন বলবেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাকের হুকুমে এক প্রকার মহামারী দেখা দেবে। আরবীতে তাকে না'ফ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫

বলা হয়। নেকড়ে বাঘ ও বকরীর নাক ও গর্দানে এক প্রকার ফোঁড়ার ন্যায় হয়, এ রোগটি তারই ন্যায় এবং প্লেগের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং ইয়াজুজ মাজুজের দল এ মহামারীতে এক রাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) এ সংবাদ অবগত হয়ে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে দুর্গের বাইরে প্রেরণ করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজদের পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধের কারণে মানুষের জন্যে চলাফেরা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। এ বিপদ থেকে নাজাতের জন্যেও হযরত ঈসা (আঃ) সাথীগণকে সহ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়ার জন্যে হাত তুলবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক লম্বা লম্বা গর্দান বিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু প্রেরণ করবেন, এসব জন্তু অনেককে খেয়ে ফেলবে এবং অনেককে লবণাক্ত পানির সাগরে এবং বিভিন্ন দ্বীপে নিক্ষেপ করবে। তাদের রক্ত থেকে মাটিকে পবিত্র করতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সমস্ত কাঁচাবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সে বৃষ্টি খুব বরকতময় হবে যার কারণে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হবে এমনকি, এক সের তরকারী, একটা গরু বা বকরীর দুধ একটি পরিবারের সকলের জন্যে যথেষ্ট হবে। সমস্ত মানুষ শান্তি ও আরামে থাকবে। জীবিত লোকেরা মৃতদের প্রত্যাগমনের জন্যে আকাংক্ষা করবে যে তারা যদি ফিরে আসত তবে তারাও এই শান্তি ভোগ করতে পারত। পৃথিবীর বুকে ঈমানদার ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষ থেকে বিদায় হয়ে যাবে। সমস্ত মানুষ আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকবে। সর্প এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুও মানুষকে কোনরূপ কষ্ট দেবে না। ইয়াজুজ মাজুজদের তরবারির খাপ এবং কামান অনেকদিন পর্যন্ত জ্বালানী হিসেবে কাজে আসবে। সাত বছর পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা থাকবে, এরপর তারা অধিক এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না প্রকাশ পাবে।

এসব ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে সংঘটিত হবে। তিনি দুনিয়াতে চল্লিশ বছর কাল থাকবেন। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন এবং তাঁর সন্তানাদিও জন্মগ্রহণ করবে, অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করবেন এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে তাঁকে দাফন করা হবে। এরপর জাহজাহ বাসিন্দা নামক কাহতান বংশের এক ব্যক্তি ইয়ামনে হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্থানে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়নীতির সাথে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করবেন। তার পরেও কয়েকজন বাদশাহ হবে যাদের রাজত্বকালে ব্যাপকভাবে কুফর ও জাহেলিয়াতের কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়বে এবং দ্বীনি এলম খুব কম হয়ে যাবে।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ

"সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেব, এ অবস্থায় যে তাদের এক দল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে"।

তফসীরকারগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। যখন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, তখন যেহেতু তারা বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই ভিড়ের কারণে একজন আরেকজনের উপর পতিত হয়। অথবা এর অর্থ হল, যখন আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক কেয়ামতের পূর্বে

তারা জুলকারনাইন নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবে তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা বের হবে এবং একের উপর অন্যে পতিত হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করবে, সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, জীব-জন্তু,কীট-পতঙ্গ এমনকি মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। শুধু মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও বায়তুল মোকাদ্দাসে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার উদ্দেশে একে অন্যের আগে যেতে চাইবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর পতিত হবে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ ঘটনা তখন ঘটবে যখন কেয়ামত কায়েম হওয়ার সময় আসবে, সমগ্র মানব জাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। আর জ্বীনেরাও এসে মানুষের সাথে ভীড় জমাবে, আর সকলেই সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং হতবাক হবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বাক্যে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا

আর কবর থেকে মৃতদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থানের জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর হিসাব, পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আমি সকলকে একত্রিত করবো। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে।[১]

বর্ণিত আছে যে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) সমগ্র মানব জাতিকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে শান্তিতে বসবো? শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা মাথা নত করে শিঙ্গা মুখে ধারণ করে অপেক্ষা করছে, কখন হুকুম হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ অবস্থায় আমরা কি বলবো? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

আর এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

"আর আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো একজনও বাদ থাকবেনা"।[২]

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا

"আর সেদিন আমি কাফেরদের সম্মুখে দোযখকে নিয়ে আসবো এবং তাদেরকে দোযখ দেখিয়ে দেব"।

اِلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭২
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-১৩

"আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখে পর্দা পড়েছিল এবং যারা শ্রবণ করতে পারতো না"।

যেহেতু আল্লাহ পাকের অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যেই দোযখ তৈরী করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এক্ষেত্রে দোযখের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জীবনে যাদের চক্ষু কর্ণে পর্দা পড়েছিল, আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ দেখেও তারা দেখেনি এবং আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, কেয়ামতের দিন তাদের চোখ খুলবে এবং প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দোযখ অবশ্যই তাদের সম্মুখে দেখতে পাবে।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করতো না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণ করতো না, তাদের উদ্দেশে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا
وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا
لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

তরজমা

(১০২) যারা কাফের হয়েছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার পরিবর্তে আমার বন্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের আপ্যায়নের জন্যে দোযখকে তৈরী করে রেখেছি।

(১০৩) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তাদের কথা বলে দেব যাদের সকল সাধনা পণ্ড হল?

(১০৪) যাদের সাধনা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হল, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎ

কাজ করছে।

(১০৫) তারাই সে সব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর মোলাকাতকে অস্বীকার করে, পরিণামে তাদের সকল সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে ওজনও দাঁড় করাবো না।

(১০৬) যেহেতু তারা কুফরী ও নাফরমানী করেছে, আমার আয়াত ও রসূলগণকে উপহাস রূপে গ্রহণ করেছে, তাই তাদের পরিণাম হল দোযখ।

(১০৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্যে রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান।

(১০৮) চিরদিন তারা তন্মধ্যে থাকবে, তা থেকে কখনও স্থানান্তর কামনা করবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

সূরায়ে কাহফের প্রারম্ভে তৌহীদ, রেসালত এবং আখেরাতের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর এ তিনটি বিষয় দ্বারা সূরা সমাপ্তও করা হচ্ছে। যারা জেদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে আল্লাহ পাকের বিধান গ্রহণে বিমুখ হয়েছিল তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এভাবে যে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে তারা আল্লাহর জিকর থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[২]

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

কাফের, মুশরেক নাস্তিকরা কি এই ধারণা করে যে আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তাঁর বন্দাদের এবাদত করে আল্লাহ পাকের কঠিন আযাব থেকে তারা রক্ষা পাবে? কখনও তাদের জন্যে নির্ধারিত আযাব থেকে কোন অবস্থাতেই রক্ষা পাবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে عبادى শব্দ দ্বারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, কোন কোন কাফের হযরত ঈসা (আঃ)-এর, আর কোন কোন কাফের হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর এবং কেউ ফেরেশতাদের উপাসনা করে মনে করতো যে, তারা এভাবে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে, অথচ এটি ছিল তাদের নিতান্ত

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৬৪
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭৩

ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন عبادى এর দ্বারা সেই শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কাফেররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ কাফেররা যে মূর্তির পূজা অর্চনা করে, এ শব্দ দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে যাদের বন্দেগী করে, তারা কাফেরদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। যদি তারা এই ভূয়া উপাস্যদের আশায় বসে থাকে তবে তাদের জানা উচিত যে,

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا

"নিশ্চয় আমি কাফেরদের আপ্যায়নের জন্যে দোযখকে প্রস্তুক করে রেখেছি"। তফসীরকারগণ লিখেছেন ঃ কাফেরদের প্রতি বিদ্রুপ করেই نزلا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের আদর আপ্যায়নের জন্য দোযখের অনল শিখা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাদের কুফর শেরক নাস্তিকতা এবং নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তারা ভোগ করবে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি। এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী, কখনও তারা এ শাস্তি থেকে নাজাত পাবেনা। কখনও তাদের ক্ষমা করা হবে না। কেননা, শেরক ও কুফরকে ক্ষমা করা হবেনা বলে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

(নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করা ক্ষমা করবেন না।)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে'? তারা সে সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করছে"।

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেনঃ এ আয়াতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক বলতে খৃষ্টান এবং ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে, এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে, অথচ এদের প্রত্যেকের শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে ক্ষতিগ্রস্ত বলতে সে সব পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা তাদের নিজের ধারণায় মনে করে যে তারা ভাল কাজ করছে, কেননা তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বিরত রয়েছে, অথচ ইসলামী শরীয়তকে তারা অস্বীকার করছে, এমন অবস্থায় তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলো খারেজী ফেরকা। কেননা খারেজীরাই প্রথম দল যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো, আলোচ্য আয়াতে বেদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর মোতাজেলা, রাফেজী, খারেজী এবং আহলে সুন্নতের বিরোধী সকল সম্প্রদায় এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, যারা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে, আর যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো দু'দিনের এ জীবনের সাফল্য লাভ করা, আর যাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দুনিয়ার এ জীবনে উপকৃত হওয়া। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

"তারাই সে সব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর মোলাকাতকে অস্বীকার করেছে"।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে তারা অস্বীকার করেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে সেসব লোকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আখেরাতের কথা স্বীকার করা সত্বেও দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দেয়, আখেরাতের কাজকে ভুলে যায়। কেননা, আখেরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে যে সম্বল সংগ্রহ করবে না সে আখেরাতের নেয়ামত থেকে মাহরুম হবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্বাধিক বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের ব্যাপারে মিথ্যা আকাংক্ষা করেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ পাকের আযাবে ব্যাপারে গাফেল রয়েছে এবং যা ইচ্ছা জীবনে তা করেছে এবং একথা মনে করেছে যে আল্লাহ পাক তো মাফ করেই দেবেন, তিনি রহীম, তিনি করীম। (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)

যদি এ আয়াত দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে

كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

বাক্যটির অর্থ হবে যদিও তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করেনা, কিন্তু কেয়ামতের সার্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে, অথবা তাদের জন্যে যে আযাব আখেরাতে অপেক্ষা করছে তা অস্বীকার করে।

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

"তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হল, কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে আর ওজনও দাঁড় করাবো না"।

কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তা কোন কাজেই আসবে না। এরপর তাদের পাপাচার ব্যতীত আর কিছুই থাকবেনা।

কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবে না

এমন অবস্থায় তাদের আমল ওজন করার কোন প্রয়োজনই হবেনা। কেননা, নেক এবং বদ আমল যদি এক সঙ্গে থাকে তবে তার ওজনের প্রয়োজন। নেক ও বদ- কোন্ আমল অধিক তা প্রমাণ করতে ওজনের প্রয়োজন। যখন কারো নেক আমলই থাকবে না তখন তার আমল ওজনও করা হবেনা। কেননা, যদি তারা কোন ভাল কাজ করেও থাকে, কিন্তু ভাল কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। অথচ তারা ছিল কাফের। আর ওজন না করার তাৎপর্য হল, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তাদের কোন গুরুত্বই নেই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন মোটা লোক এমন হাযির হবে যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মাছির একটি ডানার সমানও তাদের ওজন হবেনা। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আবু নাঈম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আরও একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোন কোন শক্তিশালী মানুষকে কেয়ামতের দিন পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন একটি শস্য দানার সমানও হবেনা। ফেরেশতাগণ এমনি ৭০ হাজার মানুষকে এক ধাক্কায় দোযখে ফেলে দেবেন।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হল, তাদের আমল পরিমাপের জন্যে পাল্লাই রাখা হবে না এবং তাদের আমল ওজন না করেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এর অর্থ হল, যে সব আমলকে তারা নেকী মনে করে, নেক আমলের পাল্লায় সেগুলোর কোন ওজনই হবেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন লোকেরা এমন আমল নিয়ে হাযির হবে যা তাদের ধারণায় তেহামা পাহাড়ের সমান বড় হবে। কিন্তু পাল্লায় তোলার পর তার কোন ওজনই হবেনা। আলোচ্য আয়াত فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ এর এটিই অর্থ।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, শুধু মোমেনদের আমল পরিমাপ হবে এবং কাফেরদের আমলের পরিমাপ হবেনা, এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। যারা বলেন যে কাফেরদের আমলের ওজন হবেনা, তারা দলিল হিসাবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। আর যারা বলেন যে কাফেরদেরও আমলের ওজন হবে, তারা আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন যে আয়াতের এ অর্থ নয় যে কাফেরদের আমলের পরিমাপ করা হবেনা; বরং এর অর্থ হল তাদের আমলের কোন গুরুত্ব হবেনা, কেননা অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ

"আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো"।

এমনিভাবে সূরা মুমেনুনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

(পারা-১৮))

"আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা চিরদিন দোযখে থাকবে"।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) কুরতবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেকের আমলের ওজন হওয়া জরুরী নয়। প্রত্যেক মোমেনেরও নয় এবং কাফেরও নয়। কেননা যে সব মোমেন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন তাদের আমলের ওজন হবে না (যখন হিসাবই হবে না তখন আমলের ওজনের কোন প্রশ্ন ওঠে না)। এমনিভাবে কিছু কাফেরও বে-হিসাব দোযখে প্রেরীত হবে তাদেরও আমলের ওজন হবে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ

(সূরা আর রহমান)

"পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে"।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন যে ইমাম কুরতবীর এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যাদেরকে অবিলম্বে দোযখে প্রেরণ করা হবে তাদের আমলের ওজন করা হবে না। অবশিষ্ট কাফেরদের আমলের ওজন করা হবে।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন আলোচ্য আয়াত-

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন তাদের আমলের কোন গুরুত্ব হবে না। তাদের কুফরী এবং নাফরমানীর কারণে তাদের ভাল কাজগুলো প্রাণহীন হবে। তাদের পূণ্য কর্মে কোন ওজন থাকবেনা। যে সব কাজকে তারা অত্যন্ত দামী বা অতি মূল্যবান মনে করতো,

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৭৯-৮০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭৮

কেয়ামতের দিন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে এবং তাদের কর্মের কোন মূল্য বা গুরুত্ব হবে না, ঈমান এবং এখলাসের অভাবে তাদের পূণ্য কর্ম প্রাণহীন হবে। এরপর তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বস্তুতঃ কাফেরদের পূণ্য কর্মগুলো ঈমানের অভাবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। এরপর তাদের আমলনামায় পাপ আর পাপই থাকবে। তাদের অবস্থা তাদেরকে বোঝাতে পূণ্য কর্মগুলো নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার কোন ওজন হবেনা। আর মন্দ কাজগুলো মন্দ কাজের পাল্লায় রাখা হবে, এভাবে তাদের কুফর ও নাফরমানীর পাল্লা ভারি হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের ওজন কায়েম না করার তাৎপর্য হল, তাদের আমল পরিমাপ না করেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা, পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। কিন্তু তাদের আমলের মধ্যে মন্দ ব্যতীত কিছুই নেই। তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর রসূলগণকে বিদ্রুপ করতো এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহকে অস্বীকার করতো, তাই তাদের আমল ওজন করার কোন প্রয়োজনই নেই, ওজন ব্যতীত তারা দোযখের শাস্তির জন্যে বিবেচিত হবে।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) একথাও লিখেছেন, এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ হল, কেয়ামতের দিন মোমেন কাফের সকলেরই আমলের ওজন হবে, যার উদ্দেশ্য হল ন্যায় বিচার কায়েম করা যেন কারো কোন ওজর-আপত্তি না থাকে। কাফেরদের আমলও পাল্লায় রেখে পরিমাপ করা হবে কিন্তু সেগুলোর কোন ওজন হবে না। কেননা, তারা কুফর ও নাফরমানীর মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا

তাই তাদের শাস্তি হবে দোযখ, কেননা তারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, কুফরী ও নাফরমানী করেছে, আমার নিদর্শন সমূহের এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিদ্রুপ করেছে, তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট ছিল, কিন্তু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুষ্মান থাকা সত্ত্বেও যেন অন্ধ ছিল।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মক্কার জনৈক কাফের দম্ভ প্রকাশ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। তখন তিনি হযরত বোরায়দা (রাঃ)-কে বললেন, এ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৬৫
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭৪

লোকটি তাদের অন্তর্ভুক্ত, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট যাদের গুরুত্ব হবেনা।[১]

এ পর্যন্ত কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন মোমেনদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারীর জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউস (শীতল ছায়াচ্ছন্ন উদ্যান) রয়েছে"।

বস্তুতঃ ঈমানদার ও নেককারগণ তাদের ঈমান ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। বেহেশতের সুশীতল মনোরম ছায়ায় তারা চিরদিন বাস করবে। কেননা, আল্লাহ পাক নেককার মোমেনদের জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট চাও, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া কর, কেননা ফেরদাউস জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর অন্য জান্নাত সমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে, আর তার উপরই করুণাময় আল্লাহ পাকের আরশ অবস্থিত এবং ফেরদাউস থেকেই জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

তিরমিজী ও হাকেম হযরত ওবায়দা এবনে সামের (রাঃ)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত মাআজ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দু' স্তরের মধ্যে তফাত এতখানি যতখানি আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। ফেরদাউস জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। আর এ ফেরদাউস থেকে জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। তার উপর রয়েছে আরশ। যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট বেহেশতের জন্যে দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্যে দোয়া করবে।

বাজ্জার হযরত এরবাজ এবনে সারিয়া (রাঃ)-এর সূত্রে এবং তেবরানী হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্যে দোয়া করবে, তা অন্য জান্নাত সমূহের উপর রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জান্নাত সমূহের মধ্যে ফেরদাউসের চেয়ে উঁচু কোন জান্নাত নেই। কল্যাণকর কাজের আদেশ দানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ফেরদাউস জান্নাতের একটি উপত্যকা। অর্থাৎ সর্বোচ্চে অবস্থিত, সর্বোত্তম এবং সর্ব প্রকার নেয়ামতে পরিপূর্ণ।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-১৫

ইমাম আহমদ (রঃ), তেয়ালুসী এবং বায়হাকী হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফেরদাউসে ৪টি জান্নাত রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি স্বর্ণ নির্মিত। ঐ জান্নাতের সব কিছুই স্বর্ণের, আর দু'টি রূপার।

এবনে আবিদ দুনিয়া ছেফাতুল জান্নাতে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে হারেস এবনে নওফেলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তিনটি জিনিস নিজের দস্তে মোবারকে তৈরী করেছেন। আদমকে (আঃ) স্বহস্তে তৈরী করেছেন। তৌরাতকে নিজ হাত দিয়ে লিখেছেন আর ফেরদাউসকে নিজের হাত দ্বারা তৈরী করেছেন। এরপর এরশাদ করেছেনঃ শপথ নিজের সম্মান এবং উচ্চ মরতবার! এতে (ফেরদাউসে) নিত্য মদ্যপায়ী কখনো প্রবেশ করবে না এবং দাইয়ুসও প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! দাইয়ুস অর্থ কি? তিনি এরশাদ করেনঃ সে ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর মধ্যে মন্দ কাজ দেখে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর দ্বারা মন্দ কাজ করায়।[১]

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

"চিরকাল তারা তাতেই থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হবে না"।

অর্থাৎ তারা জান্নাতুল ফেরদাউসে চিরদিন থাকবে, সেখান থেকে সরবে না। কেননা, জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস হবে না যাতে করে জান্নাত ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾
قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

তরজমা

(১০৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমনকি তার সঙ্গে যদি অন্য একটি সমুদ্রও উপস্থিত করি।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮৩

(১১০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র (তবে পার্থক্য এতটুকু যে) আমার নিকট (আল্লাহ পাকের নিকট থেকে) ওহী আসে। তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ। অতএব, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রতিপালকের বন্দেগীতে কাউকে শরীক না করে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুজুল

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কার কাফেররা ইহুদীদেরকে পরামর্শ দেয় যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা স্বরূপ প্রশ্ন কর। ইহুদীরা বললো, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। মক্কাবাসী এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন ইহুদী হাই এবনে আখতাব গয়রহ বলতে লাগলো, এ আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

"তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে"। অথচ আপনাদের কিতাবেই রয়েছেঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ যাকে কিতাব ও হেকমতের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু আমাদের নিকট তৌরাত রয়েছে তাই আমাদেরকে অধিক পরিমাণে কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ

আলোচ্য সূরায় ইসলামের সত্যতার অনেক দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই সূরার শেষ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণতার কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ (হে রসূল!) আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা ঘোষণা করুন, "যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রগুলো কালিতে পরিণত হয়, আর তা দ্বারা আল্লাহ পাকের হেকমতের কথা এবং তাঁর মহান বাণী লিপিবদ্ধ করা হয় তবে সকল সমুদ্রের সমস্ত পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান বাণী শেষ হবে না"। কেননা সমুদ্রের পানি যত বেশীই হোক, তা সীমিত। আর আল্লাহ পাকের জ্ঞান অনন্ত অসীম, তাই সীমিত বস্তু দ্বারা অসীম বিষয় পেশ করা যায়না। আর এজন্যেই এরশাদ হয়েছে-

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭৬
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮৩

"তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে"।

আল্লাহ পাকের জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোটা যেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে প্রদান করা হয়েছে।[১]

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ ....

"যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলো কলমে পরিণত হয়, আর পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানি কালিতে পরিণত হয় এবং এরপর আরো সাতটি সমুদ্র আনা হয় তবুও আল্লাহ পাকের বাণী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়"।

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম গুণাবলী, তাঁর অন্তহীন বৈশিষ্ট্য সমূহ, তাঁর কুদরত ও হেকমত লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবেনা, অথচ ঐ কলম আর কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের সত্যিকার মা'রেফাত হাসিল করা কার পক্ষে সম্ভব? কে তাঁর প্রশংসার হক্ব আদায় করতে পারে? বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক তেমনই, যেমন তিনি নিজেই ঘোষণা করেন। কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ পাকের ছানা ও ছেফাত বর্ণনা করা এবং তাঁর অগণিত গুণাবলীর বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির তুলনায় একটি শস্য দানা যেমন ক্ষুদ্র এবং সামান্য, ঠিক তেমনি জান্নাত এবং আখেরাতের সীমাহীন নেয়ামত সমূহের তুলনায় দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র।[২]

আলোচ্য আয়াতের كَلِمٰتُ رَبِّى শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ূতি (রঃ) এবনুল মুনজের ও এবনে আবি হাতেমের সূত্রে মুজাহেদ (রঃ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের জ্ঞান।

এমনিভাবে ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যদি সমগ্র বিশ্বের সমুদ্র সমূহের পানিকে আল্লাহ পাকের বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্যে কালি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে ঐ কালি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ পাকের বাণী এবং হেকমত অবশিষ্ট থাকবে।[৩]

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী। এর মধ্যে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণ, সাফল্য এবং অসাফল্যের পথ ও পন্থা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের মহান জ্ঞান সমৃদ্ধ তাঁর নিজস্ব পবিত্র বাণী কোরআনে হাকীমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলোকে কলম হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং সারা বিশ্বের সমস্ত সমুদ্রের পানিকে কালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে এই কলম ও কালি এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাগরগুলো শুকিয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান বাণী

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-১৬
৩। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৯

শেষ হবেনা।[১] কেননা পৃথিবীর বৃক্ষ এবং পানি যত বেশীই হোক না কেন তার একটি সংখ্যা এবং সীমা আছে, অথচ আল্লাহ পাকের মহান বাণী এবং তাঁর জ্ঞানের কোন সীমা নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এতে ইহুদীদের প্রশ্নের জবাব সন্নিবেশিত হয়েছে। যার মর্মকথা হল, আল্লাহ পাকের প্রেরিত কিতাবে নিঃসন্দেহে অনেক কল্যাণ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান বাণীতে যে জ্ঞান সমুদ্র রয়েছে, তার কোন কুল কিনারা নেই, সেই জ্ঞান-সমুদ্রের তুলনায় মানব জাতি যে এলম অর্জন করেছে তা আল্লাহ পাকের ঐ জ্ঞান-সমুদ্রের একটি ফোটা মাত্র।[২]

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার নিকট (আল্লাহ পাকের তরফ থেকে) ওহী আসে, তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির উপর সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন বা নবী রসূলগণের দলপতি, তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বা খাতেমুন নবীয়্যিন, ইহকাল ও পরকালে তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চে। তাই তিনি যেন গর্ব না করেন, এজন্যে তাঁকে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেনঃ আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে আপনি একজন মানুষ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন আমি তোমাদের ন্যায় মানুষই (তবে পার্থক্য এতটুকু যে) আমার নিকট আল্লাহ পাকের ওহী আসে, আমার যত গুণগান সবই আল্লাহ পাকের দান, আল্লাহ পাকের ওহীর মাধ্যমেই তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই তোমাদের একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত আর কেউ বন্দেগীর যোগ্য নয়।

ফেতনার দুয়ার বন্ধ হলো

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের হুকুম দ্বারা আল্লাহ পাক অনেক বড় ফেতনার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন, যে ফেতনায় খৃষ্টানরা পতিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক অনেক মোজেযা দিয়েছেন, তিনি ক্ষণিকের মধ্যে

১। তফসীরে হক্কানী, পারা-১৬, পৃঃ ২৩
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮৪

অন্ধদেরকে চক্ষুষ্মান করে দিতেন এবং অসুস্থদেরকে সুস্থ করে দিতেন, এমনকি মৃতদেরকে জীবিত করতেন। তিনি কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে নাম ধরে ডাকলে মৃতরা জীবিত হয়ে করব থেকে বের হয়ে আসতো। এসব কিছু আল্লাহ পাকের হুকুমেই হতো, আল্লাহ পাকের শক্তি, ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হতো। কিন্তু খৃষ্টানরা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হল। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র বলে বিশ্বাস করলো (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) অথচ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়েও অনেক বেশী মোজেযা দান করেছেন। এমন অবস্থায় লোকেরা যেন কোন ফেতনায় পতিত না হয়, সেজন্যে আল্লাহ পাক এই আদেশ দিয়েছেন যে- "(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই" তবে আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসে। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষণা করুন, এর পাশাপাশি নিজের রেসালতের কথাও ঘোষণা করুন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, এটি পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ আয়াত যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল হয়েছে। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমিও তোমাদের ন্যায় মানুষ, যেমন তোমরা মানুষ। তবে আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসে, আমি তাঁর প্রেরিত রসূল। যদি তোমরা আমার রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন না কর তবে পবিত্র কোরআনের ন্যায় এমন একটি মহা মূল্যবান গ্রন্থ তোমরা পেশ কর, তোমরা আমার নিকট জুলকারণাইনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করেছ, তোমরা আমার নিকট জানতে চেয়েছ আসহাবে কাহফের ঘটনা। আমি সকল ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করেছি, যদি আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী না আসতো তবে এসব ঘটনা আমি কিভাবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম, তা কিভাবে সম্ভব হল? তোমরা মনে রেখ, সকল ওহীর মূল কথা হল তৌহীদ। একথায় বিশ্বাস কর যে তোমাদের মা'বুদ একজনই।

সকল ওহীর মূল কথা তৌহীদ

অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস কর, তৌহীদ পন্থী হও, শেরক বর্জন কর, তোমাদের প্রতি আমার এ আহবান যে তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং শেরক থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। আর আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর। আল্লাহ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে শরীক রয়েছি। কেননা আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ। কিন্তু রেসালত ও নবুওয়্যতের কারণে আমি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, এমনকি জীব্রাঈল ও মিকাঈল আমার পরামর্শ দাতা। জীব্রাঈলই আমার নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী নিয়ে আসে। আল্লাহ

[১] তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮৪

পাক আমাকে নবুওয়্যত ও রেসালতের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, প্রকাশ্যে আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ এবং আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে আমি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি, তোমরা আমার প্রশংসায় সীমা লংঘন করোনা। আল্লাহ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা, তিনিই সকলের ভাগ্য নিয়ন্তা, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, আমি তাঁর বন্দা ও রসূল। অতএব তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, আর আমাকে তাঁর রসূল মেনে নিয়ে আমার অনুসরণ কর।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

"অতএব, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আকাংক্ষা রাখে, তার কর্তব্য হল নেক আমল করা, আর সে যেন তাঁর এবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে"।

এবনে আবিদ দুনিয়া কিতাবুল এখলাসে, এবনে আবি হাতেম তাউসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হজ্জের জন্যে নিদৃষ্ট স্থানে দন্ডায়মান হই, আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আরজী পেশ করি, কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও পছন্দ করি যে লোকেরা এখানে আমার দন্ডায়মান হওয়া দেখুক অর্থাৎ লোকেরা দেখুক যে আমি এখানে দন্ডায়মান রয়েছি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কোন জবাব দেননি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ একজন মুসলমান জেহাদ করতো কিন্তু সে একথাও পছন্দ করতো যে, লোকেরা দেখুক যে সে জেহাদ রত রয়েছে, তখন আলোচ্য আয়াত فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ নাজিল হয়েছে।

এবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জন্দব এবনে জোহাইর যখন নামাজ আদায় করতেন বা রোযা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন আর মানুষের মধ্যে তাঁর নেক আমলের এসব আলোচনা হতে দেখতেন, তখন তিনি খুশী হতেন, আর খুশীতে তিনি তাঁর নেক আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

একটি সন্দেহ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আমার ঘরে জায়নামাজের উপর ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি হাযির হলো। তার হাযির হওয়াতে আমি এজন্যে খুশী হলাম যে সে আমাকে জায়নামাজে দেখতে পেয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আবু হোরায়রা! তোমার প্রতি আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন। তোমার জন্যে দু'টি সওয়াব। একটি হলো গোপনে এবাদত করার, আর দ্বিতীয়টি হলো এবাদতের অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার (তিরমিজী)।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হয়, কোন ব্যক্তি নেক আমল করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে তবে কি এ কারণে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মোমেনের জন্যে তা হলো তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে হাদীস সমূহ বর্ণিত হয়েছে তা এই দু'খানি হাদীসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না, কারো মনে এমন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

সন্দেহ খন্ডন

আলোচ্য হাদীস সমূহে কোন সামঞ্জস্যহীনতা নেই। কেননা আয়াতের অর্থ হলো কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোন কাজ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কামনাও তার থাকে যে মানুষ তার নেক কাজ দেখুক এবং প্রশংসা করুক। এ অবস্থাটিকেই রিয়াকারী বা লোক দেখানোর কাজ বলা হয়। যেহেতু সে ব্যক্তি মানুষকে দেখাতে কোন নেক আমল করেনা এবং কোন বিনিময়ও চায় না আর মানুষকে দেখাবার জন্যে আমলও বৃদ্ধি করে না তাই এ অবস্থাকে রিয়াকারী বলা যাবে না, বরং এটি সে ব্যক্তির জন্যে তাৎক্ষণিক খুশীর ব্যাপার। আর তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। প্রথমতঃ গোপনে এবাদত করার, দ্বিতীয়তঃ এবাদত প্রকাশিত হওয়ার।

হযরত জন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শোনাবার জন্যে নেক কাজ করে আল্লাহ পাকও তার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যে নেক আমল করে আল্লাহ পাকও তার সঙ্গে তাই করেন।

ক্ষুদ্র শেরক থেকে আত্মরক্ষা কর

হযরত মাহমুদ এবনে লবিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি ভয় করি তা হলো ক্ষুদ্র শেরক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ক্ষুদ্র শেরক কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ রিয়াকারী, তথা লোক দেখানোর উদ্দেশে কাজ করা (আহমদ)।

বায়হাকী এই হাদীসে আরেকটি কথা সংযোজন করেছেনঃ যখন আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে তাদের আমলের বিনিময় দান করবেন তখন তাঁদেরকে বলবেন, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশে তোমরা নেক আমল করেছ তাদের নিকট যাও, দেখ তারা তোমাদেরকে কোন পুরস্কার দেয় কি-না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তোমরা ক্ষুদ্র শেরক থেকে আত্মরক্ষা কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ক্ষুদ্র শেরক কি? তখন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, তা হলো রিয়াকারী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি শেরক থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের ব্যাপারে আমার সাথে আর কাউকে শরীক করে (নেক আমলের ব্যাপারে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা করে) আমি তাকে তার শেরকের সঙ্গে পরিত্যাগ করি।

হযরত আবু সাঈদ এবনে আবি ফুযালা বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের নিশ্চিত দিনে যখন লোকদেরকে আল্লাহ্ পাক একত্রিত করবেন তখন (আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে) একজন ঘোষক ঘোষণা করবেঃ যে ব্যক্তি নিজের কৃত নেক আমলে আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে শরীক করেছে সে যেন সওয়াব তারই নিকট চায়। আল্লাহ্ পাক শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)।

হযরত সাদ্দাদ এবনে আউস বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে নামাজ আদায় করেছে সে শেরক করেছে। আর যে লোক দেখানোর জন্যে দান খয়রাত করেছে সে শেরক করেছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ কেয়ামতের দিন সমস্ত আমলনামা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ এগুলো ছুঁড়ে ফেল, আর এগুলো কবুল কর (অর্থাৎ কিছু আমলনামা ছুঁড়ে ফেলার আর কিছু আমলনামা কবুল করার নির্দেশ দেবেন)। ফেরেশতাগণ আরজ করবেন– "(হে আল্লাহ!) আপনার ইজ্জতের কসম, আমলনামায় তো আমরা সেগুলো শুধু লিপিবদ্ধ করেছি যা তারা করেছে (অর্থাৎ কোন ভুল লেখা হয়নি)"। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ "এসব নিক্ষিপ্ত আমল আমাকে ছাড়া অন্যের জন্যে করা হয়েছিল, আর আমি আজ শুধু ঐ সব আমল কবুল করবো যা একমাত্র আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করা হয়েছিল"।

দারে কুতনী শাহর এবনে আতীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু লোককে হিসাবের জন্যে পেশ করা হবে। তাদের আমলনামায় পর্বত সম নেকী লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তুমি অমুক দিন নামাজ আদায় করেছিলে, আর এজন্যে আদায় করেছিলে যেন তোমাকে নামাজী বলা হয়। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই, এবাদত শুধু আমার জন্যই হতে হবে। তুমি অমুক দিন রোযা রেখেছিলে, আর তা এজন্যে রেখেছিল যেন লোকেরা বলে অমুক আজ রোযা রেখেছে। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, এবাদত শুধু আমার জন্যেই হতে হবে। এভাবে একের পর এক আমল বাতিল হতে থাকবে। আর ফেরেশতাগণ তাকে বলতে থাকবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশে তুমি নেক কাজ করতে।

হযরত সাদ্দাদ এবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাক একটি ময়দানে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন, একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, যার আওয়াজ সকলে শ্রবণ করবে, ঘোষণাটি হল, আমি সকল মিথ্যা বানানো শরীকদের চেয়ে উত্তম, পৃথিবীতে যে নেক কাজ এমনভাবে করা হয়েছে যে তাতে অন্যকে শরীক করা হয়েছে, আমি ঐ কাজ শরীকদের জন্যে ছেড়ে দেব, আর আজ শুধু সেই আমলকেই গ্রহণ করবো, যা শুধু আমার জন্যে করা হয়েছে। (এসবেহানী)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অন্যকে দেখানোর জন্যে কোন নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন ঐ কাজটি সে ব্যক্তিকে সোপর্দ করবেন যার জন্যে তা করা হয়েছে, আর এরশাদ করবেনঃ দেখ এই মিথ্যা শরীক তোমার কোন উপকার করে কি-না।

সুফি-সাধকদের দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা

যে আল্লাহ্ পাকের একান্ত নৈকট-ধন্য হওয়ার আকাংক্ষা করে তার কর্তব্য হল নেক আমল করা। অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির যাবতীয় দোষ-ত্রুটিকে দূরীভূত করা। এরপর সৎ কাজে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আত্মনিয়োগ করা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে প্রবৃত্তির দোষ-ত্রুটি বা কুপ্রবৃত্তি নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যে প্রবৃত্তির দোষ-ত্রুটি চূড়ান্তভাবে শেষ করার পরই আমলের মধ্যে নূর পয়দা হয়।

وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

"আর স্বীয় প্রতিপালকের এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে"।

আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো সাথে যেন মনের সম্পর্ক না থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর সঙ্গেই যেন মনের সম্পর্ক না থাকে, শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভই জীবনের সকল কর্মকান্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

(আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২১শে জমাদিউল আউয়াল ১৪১৩হিঃ মোতাবেক ১৯শে নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার আল্লাহ পাকের বিশেষ তৌফিকে সূরায়ে কাহফের তফসীর শেষ হল। হে আল্লাহ! দয়া করে তফসীরে নূরুল কোরআনকে কবুল কর এবং এই তফসীরকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা মরয়ম

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ
نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ
شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ
وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِىْ
وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

তরজমা

(১) কাফ-হা-য়া-আইন ছোয়াদ।

(২) এটি আল্লাহর বন্দা জাকারিয়ার প্রতি আপনার প্রতিপালকের রহমতের বর্ণনা।

(৩) যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডাকেন নিভৃতে।

(৪) জাকারিয়া বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর বার্ধক্যের কারণে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমার মহান দরবারে আরজী পেশ করে আমি কখনও বঞ্চিত হইনি।

(৫) আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আমি আশংকা করি, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, অতএব আমাকে দান কর তোমার নিকট থেকে একজন দায়িত্ব বহনকারী।

(৬) যে আমার এবং ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারীত্ব করবে, এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে কর সন্তোষভাজন।

সূরা মরয়ম প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৬ রুকু ও ৯৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় হযরত মরয়ম (আঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্যে 'মরয়ম' নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন, তখন তাঁরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি জাফর এবনে আবু তালেবকে বললেন, তোমাদের রসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাও, তখন হযরত জাফর (রাঃ) সূরা মরয়মের প্রথম আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ শুনে নাজ্জাশী এত ক্রন্দন করলেন যে তাঁর দাড়ীগুলো ভিজে গেল, তাঁর সঙ্গে ক্রন্দন করলেন খৃষ্টান ধর্মের আলেমগণ, তাঁদের নয়নের অশ্রুর কারণে সম্মুখস্ত কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গেল। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই, যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আঃ), একই কেন্দ্রের আলো। (আহমদ, বায়হাকী, এবনে আবি হাতেম)

এরপর নাজ্জাশী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিছু দিন পর যখন তাঁর এন্তেকাল হয় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়েবানা নামাজ আদায় করলেন।

হুজুর (সঃ)-এর একটি মোযেজা

বর্ণিত আছে, যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ এন্তেকাল করেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তাঁর সম্মুখে রাখা হয়।

হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর এন্তেকাল হয়েছে, অতএব তোমরা দাড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলেন, তখন চার তকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামাজ আদায় করা হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল।[১]

গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে

এ ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা

১। ফতহুল বারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫১

জানাযা আদায়ের কোন প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়না। এর দ্বারা কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি, তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পন্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন, ইয়াজুজ মাজুজ প্রভৃতি। এ সূরায়ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত জাকারিয়া (রাঃ)-এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্মের ঘটনা এ সূরায় স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলীও এ সূরায় উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারা তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত, দুনিয়ার এ জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরী কথা এরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবকে এ সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছে যে দেখ, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কত বরকত নাজিল করেন, আর কত নেয়ামত তিনি তাঁদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের নেককার বন্দাদের পদাংক অনুসরণ করা। কেননা, এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত।

তফসীরুল কোরআন

হযরত জাকারিয়া (আঃ) ছিলেন বণী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে হযরত জাকারিয়া (আঃ) সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতের কামাই ভোগ করতেন, তাঁর কোন সন্তান ছিলনা। তাঁর অন্তরে এ আশংকা ছিল যে আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দ্বীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিক ভাবে এ দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বণী ইসরাঈলে তা ইতিপূর্বেও হয়েছে। এজন্যে তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীত ভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেন।

সূরায়ে মরয়মের শুরু থেকেই আল্লাহ পাক হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর প্রতি তাঁর বিশেষ রহমত নাযিল করার কথা বর্ণনা করেছেন।

كٓهٰيٰعٓصٓ ١

এ অক্ষরগুলোকে 'মুকাত্তাআত' বলা হয়। এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৯৩

এবনে মরদবিয়া কালবী (রঃ)-এর সূত্রে হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেঃ এই হরফে মুকাত্তাআতের অর্থ হলোঃ

كاف هاد عالم صادق

এ বাক্যটির সংক্ষিপ্ত আকার كهيعص

অন্য একটি বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রয়েছে যে ك দ্বারা كريم - ه দ্বারা هاد - ى দ্বারা حكيم- ع দ্বারা عليم এবং ص দ্বারা صادق বোঝানো হয়েছে।

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ

كاف لخلقه অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট।

هاد لعباده তিনি তাঁর বন্দাদের জন্যে পথ প্রদর্শনকারী।

يده فوق ايديهم তাঁর হাত তাদের (মোমেনদের) হাতের উপর।

عالم ببريته তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।

صادق فى وعده তিনি তাঁর ওয়াদায় সত্য।

দারমী, এবনে মাজা এবং এবনে জরীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন,

يا كهيعص اغفرلى

অর্থাৎ হে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ! আমাকে মাফ করুন।[১]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে এ অক্ষর সমূহ আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নাম। এ বিষয়ে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এরও একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছেঃ

هو اسم من اسماء الله تعالى

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ পাকের নাম সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম।[২]

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا

"এ হলো আল্লাহ পাকের বন্দা যাকারিয়ার প্রতি আপনার প্রতিপালকের রহমতের বর্ণনা"।

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

"যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে নিভৃতে অনুচ্চ স্বরে ডেকেছেন"।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) রাতের শেষ প্রহরে অনুচ্চ স্বরে আল্লাহ পাকের দরবারে

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৫৭
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬২৩

অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁর আরজী পেশ করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর আরজী কবুল করেন।

দোয়ার আদব

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ গোপনে দোয়া করার মধ্যে অধিক পরিমাণে এখলাছ থাকে। তাই এটি দোয়া করার সঠিক পন্থা। এতে রিয়া বা লোক দেখানোর সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ এমনিভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়তঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর বার্ধক্যাবস্থায় সন্তান কামনায় লজ্জার কারণেও হয়তো তিনি অতি সঙ্গোপনে দোয়া করেছেন।[১]

চতুর্থতঃ হয়তো তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে তাঁর যে আশংকা ছিল, এ কারণে তিনি তাদের থেকে তাঁর দোয়াকে গোপন রেখেছেন। অথবা যেহেতু বার্ধক্যের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তাই অনুচ্চ স্বরে দোয়া করেছেন।[২]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ) গোপনে দোয়া এজন্যে করেছেন যে তিনি রিয়া বা লোক দেখানো কাজ পছন্দ করতেন না।

نِدَآءً خَفِيًّا

কাতাদা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

اى بقلبه سرا

অর্থাৎ তিনি মনে মনে বলেছেন আর ইমাম কাতাদা (রঃ) একথাও বলেছেন যে আল্লাহ্ পাক পরিচ্ছন্ন, পবিত্র অন্তর এবং গোপন কথা পছন্দ করেন। হাকেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন বণী ইসরাঈল জাতির শেষ নবী। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যেও তিনি শেষ নবী।[৩]

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا

"তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে, আর বার্ধ্যকের কারণে মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে"।

মানব দেহের হাড়গুলো গৃহের খুঁটির ন্যায়, যখন দেহের হাড়ই দুর্বল হয়ে যায় তখন সারাটি দেহ দুর্বল হয়ে যায় অর্থাৎ আমি বার্ধক্যের চরম পর্যায়ে উপনীত।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তখন হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর বয়স কত ছিল, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। আবদুল্লাহ্ এবনে মোবারক (রঃ) বলেছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। আর সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৭১
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৮০
৩। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৪

মতে তাঁর বয়স ছিল সত্তুর বছর। আবদুর রাজ্জাক এবং এবনে আবি হাতেম বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল তখন একশত দশ বছর, আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল আটানব্বই বছর।[১]

وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! তোমার নিকট দোয়া করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণিত হয়েছে, গত জীবনে যখনই আমি তোমার দরবারে দোয়া করেছি, হে আল্লাহ! তুমি কবুল করেছ, এজন্যে আমি আশা করি তুমি আমার দোয়া কবুল করবে। অথবা এর অর্থ হল হে প্রতিপালক! যখনই তুমি আমাকে ডেকেছো, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আর এমন কখনও হয়নি যে তুমি আমাকে আহবান করেছ আমি সাড়া দেইনি, এমন হতভাগ্য আমি কখনও হইনি, তুমি আমাকে তোমার প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে আহবান করেছ, আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তাই এই ঈমানের বরকতে তুমি আমার ফরিয়াদ কবুল কর।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَاۤءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

"আর আমার পরবর্তীকালে আমার আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আমি আশংকা করছি, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তাই তুমি তোমার তরফ থেকে আমাকে একজন দায়িত্ব বহনকারী দান কর"।

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁর অবর্তমানে তাঁর আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের যোগ্য কেউ ছিলনা। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ পাক যে রূহানী নেয়ামত দান করেছিলেন তার হেফাজত এবং প্রচার-প্রসার তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা করতে পারবে না– এ আশংকা করেই হযরত জাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে একটি পুত্র সন্তানের জন্যে আরজী পেশ করেন।

يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

(এমন সন্তান যে আমার এবং ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে কর সন্তোষভাজন।)

সন্তানের জন্যেই সন্তান নয়; বরং এমন সন্তান যে হবে এলমে নবুওয়্যতের অধিকারী। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের অর্থ-সম্পদের কোন ওয়ারিশ হয়না। যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলেম সমাজই হল নবীগণের উত্তরাধিকারী, কেননা নবীগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ অর্থ সম্পদ রেখে যাননা; বরং তারা এলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। এ উত্তরাধিকার যে লাভ করে সে অত্যন্ত মূল্যবান

[১]। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৯১-৯২

উত্তরাধিকার পায় (তথা সে অত্যন্ত বড় মর্তবার অধিকারী হয়)। (আহমদ, আবু দাউদ, এবনে মাজা, দারমী) এ পর্যায়ে আরও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার মদীনা মোনাওয়্যারার বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত লোকদেরকে ডাক দিয়ে একত্রিত করে এভাবে সম্বোধন করলেনঃ আপনারা একটি বিরাট সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

উপস্থিত লোকগণঃ আপনি কোন্ সম্পদের কথা বলছেন?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান উত্তরাধিকার বিতরণ হচ্ছে, অথচ আপনারা ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এ সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

উপস্থিত লোকগণঃ কোথায় এ সম্পদ বিতরণ হচ্ছে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ঃ মসজিদে। একথা শ্রবণ করা মাত্র সকলে অনতিবিলম্বে মসজিদে গমন করলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বাজারেই অপেক্ষা করছিলেন। একটু পরেই এ সমস্ত লোক প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে বললেনঃ আমরা আপনার কথা শ্রবণ করে মসজিদে গমন করলাম, সবকিছু দেখলাম কিন্তু কোথাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিরাস বা উত্তরাধিকার বিতরণ হতে দেখতে পেলাম না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ঃ আপনারা মসজিদে কি দেখলেন?

তারা বললেনঃ আমরা দেখলাম, মসজিদে কিছু লোক নামাজে রত রয়েছেন, কিছু লোক পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছেন, আর কিছু লোক পবিত্র কোরআনে যে সমস্ত বিষয়কে হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রয়েছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, আপনারা একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট কথার তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না!

এই নামাজ, পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত এবং দ্বীন ইসলামের এই এলমই তো আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিরাস বা উত্তরাধিকার। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব)

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এক দিনারও বিতরণ করবে না, স্ত্রীদের ব্যয়ভার এবং কর্মীদের পারিশ্রমিকের পর যদি আমি কিছু পরিত্যক্ত হিসেবে রেখে যাই তবে তা খয়রাত করা হবে।

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَ

অর্থাৎ যে সন্তান উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং ইয়াকুব বংশের।

এর দ্বারা আর্থিক মিরাস উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এলমী এবং রূহানী মিরাস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের এলম এবং আদর্শই প্রকৃত সম্পদ। তাই এ পর্যায়ে আর্থিক বা বৈষয়িক উত্তরাধিকার যে উদ্দেশ্য নয় একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে। কেননা, اٰل يعقوب তথা ইয়াকুব বংশধরদের উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর পুত্র একা সমস্ত ইয়াকুব বংশধরদের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, যেহেতু পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হয়ই, তাই يرثني শব্দটি উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই হয় না। তাছাড়া কোন নবী তাঁর অবর্তমানে স্বীয় ধন-সম্পদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন, একথা কল্পনাতীত। তবুও যদি তিনি কোন ধন-সম্পদশালী ব্যক্তি হতেন তবে এমন সম্ভাবনা থাকতো, কিন্তু হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন, আর এভাবে কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজের উপজীবিকা আহরণ করতেন। এতে শুধু যে শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত তাই নয়; বরং হালাল রুজির অন্বেষণে পরিশ্রম করার মাহাত্মও প্রমাণিত হয়। আর একথাও প্রকাশিত হয় যে হযরত জাকারিয়া (আঃ) কোন ধনী ব্যক্তি ছিলেন না। তাই আর্থিক উত্তরাধিকার যে এ পর্যায়ে উদ্দেশ্য নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। হযরত জাকারিয়া (আঃ) আশংকা করেছিলেন যে তাঁর পরে আত্মীয়-স্বজনরা হয়তো দ্বীনি দাওয়াতের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে অব্যাহত রাখতে পারবে না, তাই তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অত্যন্ত বিনীতভাবে ফরিয়াদ করেছেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি বৃদ্ধ, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কিন্তু তোমার দয়ায় সব কিছুই যে সম্ভব, তুমি তোমার নিজের দান স্বরূপ আমাকে একটি সুযোগ্য এবং তোমার পছন্দনীয় পুত্র সন্তান দান কর, যে শুধু আমারই নয়; বরং ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদেরকে তুমি যে নেয়ামত দান করেছ তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে এবং দ্বীন ইসলামের মহান আদর্শকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করবে।

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

"হে পরওয়ারদেগার! এ সন্তান তোমার পছন্দনীয় করে দিও"।

অর্থাৎ ঐ সন্তান যেন তোমার পছন্দনীয় হয়, তার কথা এবং কাজ যেন তুমি পছন্দ কর। অথবা সে যেন স্বভাব-চরিত্রে, আচার-আচরণে আমার মনের মত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। অথবা এর অর্থ হল, তাকে এমন ভাবে তৈরী করে দিও যেন সে সুখে-দুঃখে এক কথায় সকল অবস্থায় তোমার প্রতি রাজী থাকে।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى
يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ
اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ
مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

তরজমা

(৭) হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে ইয়াহইয়া নামক একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করছি, ইতিপূর্বে আমি এই নামে কারো নামকরণ করিনি।

(৮) জাকারিয়া বলেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে হবে আমার পুত্র যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

(৯) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, তা আমার জন্যে অত্যন্ত সহজ। আর আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, অথচ তুমি কিছুই ছিলে না।

(১০) জাকারিয়া বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন নিদর্শন ঠিক করে দিন। তিনি এরশাদ করেন, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা অবস্থায়ও কারো সাথে তিন দিন কথা বলবেনা।

(১১) এরপর তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বললেন, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় তসবীহ পাঠ করতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দিলেনঃ হে জাকারিয়া! আমি সুসংবাদ দেই যে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবো। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। অর্থাৎ ঐ সন্তানের জন্মের পূর্বেই স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর নামকরণ করেছেন।

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"ইতিপূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি"।

তফসীরকারগণ এ বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। (১) ইতিপূর্বে এ নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। (২) ইতিপূর্বে তার কোন নজির বা দৃষ্টান্তও দেখা যায়নি। অর্থাৎ হে জাকারিয়া! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান করা হবে। তার উচ্চ মরতবা এবং সম্মান স্বরূপ আমি নিজেই তার নামকরণ করলাম ইয়াহইয়া। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, ইতিপূর্বে এ নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আর কাউকে ইয়াহইয়া নাম দেয়া হয়নি।

তফসীরকার সাঈদ এবনে জোবায়ের এবং আতা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের سميا শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, নজির বা দৃষ্টান্ত। এমন অবস্থায় আল্লামা বগভীর মতে, অর্থ হবে যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার ন্যায় কেউ হয়নি। কেননা, ইয়াহইয়া (আঃ) কখনও কোন গুনাহর কাজের দিকে আকৃষ্ট হননি। আর আলী এবনে আবি তালহা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল, ইয়াহইয়া (আঃ)-এর পূর্বে কোন বন্ধ্যা মাতার ঘরে এমন সন্তান কখনও জন্ম গ্রহণ করেনি।

ইয়াহইয়া নামকরণের কারণ

১. ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ পাক ইয়াহইয়া (আঃ)-এর কারণে তাঁর মাতাকে জীবন প্রবাহ দান করেছেন। তাই তাঁর নাম করা হয়েছে ইয়াহইয়া।

২. কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর কলবকে ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা জীবিত করেছেন। এজন্যেই আল্লাহ পাক তাঁর অনুগত বন্দাকে জীবিত এবং পাপীদেরকে মৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

৩. আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এমন পবিত্র জীবন তাঁকে দান করেছেন যে কোন দিন শুধু যে তিনি গুনাহ করেননি তাই নয়; বরং তাঁর অন্তরে কোন দিন গুনাহর কথাও আসেনি। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি দ্বারা গুনাহ হয়, অথবা গুনাহর কথা চিন্তা করে, কিন্তু ইয়াহইয়া এবনে জাকারিয়া দ্বারা এর কোনটিই হয়নি।

৪. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা শহীদ হন, তারা আল্লাহ পাকের দরবারে জীবিত থাকেন।

৫. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি সর্বপ্রথম ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাই তাঁর কলবকে আল্লাহ পাক ঐ ঈমানের বরকতে জীবিত করে দিয়েছেন।[১]

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭

"জাকারিয়া বললো, "হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে হবে আমার পুত্র যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত"।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) যখন এই অসাধারণ সুসংবাদ শ্রবণ করলেন তখন অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত ও আনন্দিত হয়ে আরজ করলেনঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমি কি যৌবন লাভ করবো? অথবা এ বৃদ্ধকালেই শিশুর জন্ম হবে? তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর এ প্রশ্ন أَنَّىٰ (কিভাবে হবে?) অস্বীকৃতির অর্থ বোঝায় না, বরং এ প্রশ্নের অর্থ কৌতূহল বশতঃ জানার চেষ্টা করা যে কিভাবে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, আমাদের উভয়কে যৌবন প্রদান করা হবে অথবা আমরা উভয়ে বৃদ্ধই থাকবো, আর এভাবেই শিশু জন্ম গ্রহণ করবে।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) পুত্রের সুসংবাদ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এ প্রশ্ন করেছেন, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

قَالَ كَذٰلِكَ

"এভাবেই হবে"।

অর্থাৎ যেভাবে সাধারণতঃ শিশু জন্ম গ্রহণ করে ঠিক সেভাবেই। আর আল্লাহ পাকের জন্যে এটি কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর দয়ায় সব কিছুই সম্ভব, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

"আপনার প্রতিপালক বললেন, তা আমার জন্যে সহজ"।

প্রকাশ্য উপকরণের মাধ্যমে যেমন কোন কাজ করা হয় ঠিক তেমনি কোন উপকরণ ব্যতীতও সে কাজটি করা আল্লাহ পাকের পক্ষে অতি সহজ। পরবর্তী বাক্যে একথার পক্ষে একটি প্রমাণ পেশ করা হয়েছেঃ

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

"ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ তুমি তখন কিছুই ছিলে না"।

বস্তুতঃ মানুষ যদি নিজের অতীতকে ভেবে দেখে এবং তার মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন বর্তমান রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং আল্লাহ পাক যে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তা উপলব্ধি করে তখন এ বিষয়টি সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً

"জাকারিয়া বললো, "হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার জন্যে একটি নিদর্শন নিদৃষ্ট করুন"।

অর্থাৎ আমি যে সন্তান লাভ করবো তার কোন লক্ষন বা নিদর্শন নিদৃষ্ট করে দিন, যাতে করে আমি বুঝতে পারি।

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

"আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ নিদর্শন হল তুমি মানুষের সঙ্গে তিন দিন তিন রাত কথা বলতে পারবে না"।

অবশেষে তাই হল। হযরত জাকারিয়া (আঃ) তিন দিন তিন রাত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি, কিন্তু আল্লাহ পাকের জিকর করার সময় কোন অসুবিধা হতোনা। এভাবে তিনি একাধারে তিন দিন তিন রাত আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল ছিলেন।

سَوِيًّا

অর্থাৎ এ সময় স্বাভাবিক স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, কোন রোগের কারণে এ অবস্থা হবেনা। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, কোন রোগ কথা বন্ধ করার কারণ হবেনা।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ

"(আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর জিহ্বা আটকে যায়) এরপর তিনি হুজরা থেকে লোকদের নিকট বের হয়ে আসেন, আর ইঙ্গিতে তাদেরকে বলেন, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাক"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, লোকেরা মসজিদের বাইরে অপেক্ষমান ছিল। এমন সময় হঠাৎ হযরত জাকারিয়া (আঃ) দরজা খুলে বাইরে আসলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইঙ্গিতে বললেন, তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাঁর দরবারে শোকর আদায় করতে থাক।

মুজাহেদ (রঃ) اوحى শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি জমিনে লিখে দিয়েছিলেন, তোমরা নামাজ আদায় করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের سبحوا শব্দটির ব্যাখ্যা হল, তোমরা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাক। কেননা, মানুষ যখন কোন ব্যাপারে আশ্চর্যন্বিত হয় তখন সাধারণতঃ সোবহানাল্লাহ বলে থাকে। আর এক্ষেত্রে এজন্যেও আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।[১]

১। হযরত জাকারিয়া (রঃ)-এর এ ঘটনাটি সূরা আলে-এমরানেও বর্ণিত হয়েছে, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ২৩৮-৪০

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَآ
اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖۗ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১২) (আমি বললাম) হে ইয়াহইয়া, এই কিতাব সুদৃঢ় ভাবে গ্রহণ কর। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।

(১৩) এবং আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা আর সে ছিল পরহেযগার।

(১৪) সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত, আর সে অবাধ্য-নিষ্ঠুর ছিল না।

(১৫) তাকে সালাম তার জন্ম দিনে, মৃত্যুর দিনে আর যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

(১৬) বর্ণনা কর এই কিতাবে মরয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব প্রান্তস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(১৭) এরপর তাদের থেকে সে পর্দা অবলম্বন করে। অনন্তর আমি তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করি। সে তার সম্মুখে পূর্ণ মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়।

(১৮) তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(১৯) ফেরেশতা বলে, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার জন্যে এসেছি।

(২০) মরয়ম বললো, কিভাবে আমার পুত্র হবে? যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ

করেনি, আর আমি ব্যাভিচারিনীও নই।

তফসীরুল কোরআন

يَٰيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তাঁকে দান করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে ইয়াহইয়া! শক্তভাবে আসমানী কিতাব তৌরাত এবং অন্যান্য সহীফা ধারণ কর এবং এর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন কর এবং মানুষকে তৌরাতের উপর আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত কর। তফসীরকারগণ বলেছেন যে পিতার বার্ধক্যের সময় যুবক পুত্রের প্রতি কিতাবের এলমের প্রচার-প্রসার এবং রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কিতাব শব্দ দ্বারা তৌরাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَآتَيْنَٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

"আর আমি তাকে জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি তার শৈশব কালেই দান করেছি"।

একবারের ঘটনাঃ শৈশবকালে একবার ছেলেরা তাঁকে খেলার জন্যে ডাকলো। তখন তিনি বললেন, আমাদের খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আবার কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে الحكم। শব্দ দ্বারা সহনশীল, সম্ভ্রান্ত এবং শান্ত বোঝানো হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

মোটকথা, আল্লাহ পাক তাঁকে শৈশব কালেই এলম এবং হেকমত দান করেছেন যেন তিনি শরীয়তের আহকাম ভালভাবে বুঝতে পারেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কোমল অন্তরের লোক ছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা, অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রতি স্নেহ প্রবণ ছিলেন এবং যখন নামাজ পড়তেন তখন অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকতেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই, তাঁকে পবিত্রতা এবং পবিত্র অন্তর দেয়া হয়েছিল।

زكوة শব্দ দ্বারা এখানে অন্তরের পবিত্রতা বোঝানো হয়েছে যেন গুনাহর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তর পবিত্র থাকে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে زكوة শব্দ দ্বারা নেক আমল বোঝানো হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগত ভাবে পরহেযগার ছিলেন। আল্লাহর ভয় কখনও তাঁর অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তিনি তাঁর পিতা-মাতার খেদমত গুজার ছিলেন। আল্লাহ পাকের এবাদতের পর পিতা-মাতার খেদমতের চেয়ে অধিক আর কোন গুণ নেই।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের হুকুম অর্থ হলো নবুওয়্যত। কেননা, তাঁর শৈশব কালেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে নবুওয়্যত দান করেছিলেন।

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً

আর আমি তাকে আমার তরফ থেকে রহমত এবং গুনাহ থেকে পবিত্র থাকার তওফিক দিয়েছি। রহমত প্রদানের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. ইয়াহইয়া (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত নাজিল করেছেন।

২. তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতার প্রতি রহম করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী حنان শব্দটির অর্থ লিখেছেন, ভয়-ভীতি, সম্মান অথবা রিয্‌ক বা বরকত।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে حنان শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, রহমত, রিয্‌ক, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নম্রতা।

আর زكوة শব্দটির অর্থ, পাপাচার থেকে পবিত্র থাকা। কারো কারো মতে, এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং এখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া।

বিখ্যাত তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, এ শব্দটির অর্থ হল নেক আমল। আর তফসীরকার কালবী (রঃ)-এর মতে, এ শব্দটির অর্থ হল আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যা তিনি ইয়াহইয়া (আঃ)-এর পিতা জাকারিয়া (আঃ)-কে পুত্র সন্তান প্রদানের মাধ্যমে বখশিশ করেছেন।

وَكَانَ تَقِيًّا

আর তিনি ছিলেন পরহেযগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনদিন গুনাহ করেননি, আর কখনও গুনাহর ইচ্ছাও করেননি। তিনি সৃষ্টিগতভাবেই পরহেযগার ছিলেন তথা তাঁর প্রকৃতিতেই পরহেযগারী ছিল।

অতি শৈশবেই তাঁর মধ্যে ছিল নেক আমলের প্রেরণা, সৎ কাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। দয়া-মায়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহ-মনের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ছিল তার আরও একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা-মাতার আদরের কারণে কখনও কখনও সন্তান অবাধ্য অকৃতজ্ঞ উচ্ছৃংখল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি এমন ছিলেন না।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

তিনি ছিলেন পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহারকারী, তাঁদের পরিপূর্ণ অনুগত, তাঁদের সেবা-যত্নে তিনি ছিলেন রত। কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো এবাদত করোনা, আর পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর"।

(আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে এ আয়াতে।)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর পরই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হল পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাগিদ করে এরশাদ করেছেন,

رضا الرب فى رضا الوالدين

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর এ গুণের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)।

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

আর সে অবাধ্য নিষ্ঠুর ছিল না।

অর্থাৎ তিনি অহংকারী এবং আল্লাহর নাফরমান ছিলেন না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, জব্বার جبار সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে রাগান্বিত অবস্থায় মানুষকে প্রহার করে এমনকি, হত্যাকান্ডও করে।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

"তাকে সালাম তার জন্মদিনে, মৃত্যুর দিনে, আর যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে"।

অর্থাৎ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে নিরাপদ রাখা হয়েছে শয়তানের ক্রিয়া-কলাপ থেকে, এমনিভাবে যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে সেদিন তাঁকে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর কেয়ামতের দিন যখন তাঁর পুনরাত্থান হবে তখন তাঁকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

সুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেছেন, মানব জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) মানুষ মায়ের উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসে।

(২) পৃথিবী থেকে বের হয়ে মধ্যলোকে চলে যায়, সেখানে সে এমন কিছু দেখে যা পৃথিবীতে কখনও দেখেনি।

(৩) পুনর্জীবিত হয়ে মানুষ হাশরের ময়দানে পৌছবে, আর এমনি ময়দান ও এমনি গণ জমায়েত সে আর কখনও দেখেনি। আর এ তিন অবস্থায় এবং স্থানেই নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে দান করেছেন।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিশেষ

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৯৩

মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা নিশ্চয় হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর উচ্চ মযাদার বিশেষ নিদর্শন। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদিও আলোচ্য আয়াতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিনের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু এতে উল্লেখিত নিদৃষ্ট সময় উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জন্ম থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্যে রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ

"বর্ণনা কর এই কিতাবে মরিয়মের কথা"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী রুকুতে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে তাঁকে বৃদ্ধ কালে আল্লাহ পাক একটি সু-সন্তান দান করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, হযরত জাকারিয়া (আঃ) বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও রহমত স্বরূপ তিনি লাভ করেন পুত্র ইয়াহইয়া (আঃ)। আর তার চেয়ে বিস্ময়কর হল হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ঘটনা। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের একটি জীবন্ত নিদর্শন।

আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। কোন সৃষ্টি-ই মা'বুদ বা উপাস্য হতে পারেনা। আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইহুদী ও নাছারা উভয় পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধনের জন্যে। কেননা ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো আর খৃষ্টানরা তাঁকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে দাবী করতো। আল্লাহ পাক তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ ঘোষণা করেছেন যাতে করে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন এবং তাঁর বিশেষ রহমত। হযরত ঈসা (আঃ) জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেছেন। সর্ব প্রথম তিনি তাঁর বন্দেগীর কথা ঘোষণা করেছেনঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ

"তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বন্দা"।

এরপর তিনি তাঁর নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের নবুওয়্যতের কথা, বরকতের কথা এবং এবাদতের কথা তথা নামাজ, যাকাত প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজের বিনম্র স্বভাবের কথা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের কথা এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে করে শ্রবণকারী মাত্রই একথা শ্রবণ করে যে আমি আল্লাহর বন্দা। যারা পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের কারণে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করে তারা অসত্য বলে থাকে। জন্ম গ্রহণ করা এবং উপাস্য হওয়া একত্রিত হতে পারে না। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করা উপাস্য হওয়ার দলিল নয়; বরং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এটি হলো সম্মান

এবং মর্যাদার প্রমাণ। হযরত ঈসা (আঃ) স্তন্য পানের সময় বলেছিলেনঃ

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

আল্লাহ পাক আমাকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর এটি একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আঃ) খোদাও নন তাঁর পুত্রও নন। কেননা, যিনি খোদা হবেন তার কোন প্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়না।[১]

তাই এ সত্য উপলব্ধির জন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আর এই কিতাবে মরয়মের কথা বর্ণনা করুন। এই কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কোরআন।

اِذِانْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

"যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব প্রান্তস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে"।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

হযরত মরয়ম (আঃ) গোসল করার জন্যে সকলের নিকট থেকে দূরে তথা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি এবাদতের জন্যে একান্তে চলে যান। যেহেতু ঐ স্থানটি বায়তুল মোকাদ্দাসের পূর্ব দিকে ছিল তাই খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে তাদের কেবলা করেছে।

حِجَابًا

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর তরজমা করেছেন, "লোক-চক্ষুর অন্তরালে"।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তিনি দেয়ালের অন্তরালে বসেছিলেন। তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তিনি পাহাড়ের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ) মসজিদে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঋতুকালে তাঁর খালার গৃহে চলে যেতেন। ঐ সময় শেষ হলে তিনি পুনরায় মসজিদে আগমন করতেন। একদিন যখন তিনি গোসলের উদ্দেশে লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যান তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) একজন পুরুষের বেশে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা (জীব্রাঈল)-কে প্রেরণ করি, সে তার সম্মুখে পূর্ণ মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়"।

رُوْحَنَا

আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যে আল্লাহ পাক রুহের সম্পর্ক নিজের সাথে করেছেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০

এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

سَوِيًّا

(একজন সুদর্শন যুবক রূপে)

অর্থাৎ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবক রূপে হাযির হন। মরয়ম (আঃ) যখন দেখলেন যে একজন অজানা পুরুষ হঠাৎ তাঁর দিকে আসছে তখন তিনি বললেনঃ

قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

"(যদি তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে) যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি"।

অর্থাৎ যদি তুমি মুত্তাকী পরহেযগার হও, তবে তোমার পরহেযগারীর প্রমাণ স্বরূপ তুমি এখান থেকে সরে যাও। আর যদি তুমি পরহেযগার না হও তবুও আমি আল্লাহ পাকের নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মরয়ম (আঃ) জীব্রাঈল (আঃ)-কে মানুষ মনে করেই আল্লাহ পাকের আশ্রয় চেয়েছেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে এজন্যে হাযির হয়েছেন যেন তাকে দেখে মরয়ম (আঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত না হন। কেননা যদি জীব্রাইল (আঃ) আপন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন তবে হয়তো মরয়ম (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। অথবা এর দ্বারা মরয়ম (আঃ)-কে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল।[১]

জীব্রাঈল (আঃ) যখন লক্ষ্য করলেন, মরয়ম (আঃ) ভীত হয়েই আল্লাহ পাকের আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

"ফেরেশতা বললো, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার উদ্দেশেই আমি এসেছি"।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

"মরয়ম বললো, কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যাভিচারিনীও নই"।

হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর নূরানী চেহারা দেখে মরয়ম (আঃ)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে আগন্তুক একজন ফেরেশতা। কিন্তু তিনি বিস্মিত ছিলেন এ বিষয়ে যে বর্তমান অবস্থায় তাঁর সন্তান কিভাবে হবে। "আর আমি আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমান হইনি," যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন, কিন্তু আমি তো আল্লাহ পাকের অবাধ্য নই, বর্তমান অবস্থায় কীভাবে আমার সন্তান হবে!

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮০

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ) জীব্রাঈল (আঃ) প্রদত্ত সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণতঃ যে পন্থায় আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেন হযরত মরয়ম (আঃ) সে পন্থা বা পর্যায়ে পৌছেননি। কেননা, তিনি আল্লাহ্ পাকের এবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন, এছাড়া তাঁর কোন কাজ ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয়। তিনি প্রচলিত পন্থায়ও মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। আর অজানা, অপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পন্থায়ও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ
اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ
قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ
اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيْٓ
اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২১) ফেরেশতা বলে, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন-তা আমার পক্ষে সহজ এবং তাকে আমি এজন্যে সৃষ্টি করবো যে সে হবে মানুষের জন্যে নিদর্শন এবং আমার তরফ থেকে হবে রহমত স্বরূপ, আর তা এক স্থিরকৃত বিষয়।

(২২) এরপর তাকে সে গর্ভে ধারণ করল; এবং পরে তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে যায়।

(২৩) প্রসব বেদনা তাকে খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। মরয়ম বলল, হায়! যদি ইতিপূর্বে আমি মরে যেতাম অথবা যদি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

(২৪) ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহবান করে তাকে বললো, তুমি চিন্তা করো না। তোমার পাদদেশে তোমার পালনকর্তা একটি নহর রেখে দিয়েছেন।

(২৫) আর খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে তোমার দিকে আন্দোলিত কর। পাকা, তাজা খেজুর তোমার উপর পতিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মরয়ম (আঃ)-এর বিস্ময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে যে "কীভাবে আমার সন্তান হবে, আমাকে যে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি" তথা আমার যে বিয়ে-শাদী হয়নি। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ كَذٰلِكِ

"এভাবেই হবে"।

অর্থাৎ বিয়ে হয়নি, কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এতদসত্ত্বেও এভাবেই হবে। আল্লাহ পাকের মর্জি হলে সবই সম্ভব।

মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা

(১) পিতা-মাতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সন্তান দান করেন। এটিই সাধারণ পন্থা। কিন্তু আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তার ব্যতিক্রমও করতে পারেন। যেমন (২) আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পিতা-মাতা কেউ ছিল না। অর্থাৎ নর-নারী ব্যতীতই আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে (৩) মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ব্যতীত। (৪) আর হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এসবই আল্লাহ পাকের কুদরত ও হেকমতের বহিঃপ্রকাশ।[১]

وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا

অর্থাৎ হযরত মরয়ম (আঃ)-এর পুত্র সন্তান লাভ করা হবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত হেকমতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ এবং আমার তরফ থেকে এটি হবে রহমত।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

আর সৃষ্টির প্রথম দিন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে, অথবা এর অর্থ হল লওহে মাহফুজে এটি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, অথবা এর অর্থ হল এ ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا

"এরপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো, এবং পরে তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল"।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর কথায় হযরত মরয়ম নিশ্চিত হলেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর জামায় ফুঁক দিলেন, যখন তিনি ঐ জামা পরিধান করলেন তখন আল্লাহ পাকের কুদরতে তিনি গর্ভ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-২৪
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৯৭

ধারণ করলেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, জীব্রাইল (আঃ) তাঁর জামার আস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, জীব্রাঈল (আঃ) হযরত মরয়ম (আঃ)-এর মুখে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, জীব্রাঈল (আঃ) দূর থেকে ফুঁক দিয়েছিলেন। যাহোক, আল্লাহ পাকের হুকুমে ও কুদরতে জীব্রাঈল (আঃ)-এর ফুঁকের মাধ্যমে হযরত মরয়ম (আঃ) গর্ভ ধারণ করলেন। এরপর তিনি একান্তে চলে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের মরু প্রান্তরের শেষ সীমায় চলে গেলেন, যাতে করে লোকেরা তাঁর বদনাম না করে। গর্ভ ধারণের সময় সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, গর্ভ ধারণ ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম মাত্র এক ঘন্টায় সম্পন্ন হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, অন্য স্ত্রীলোকদের ন্যায় নয় মাস পরেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেন, এক ঘন্টায় তিনি গর্ভ ধারণ করেছেন, দ্বিতীয় ঘন্টায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি গঠন হয়েছে, আর তৃতীয় ঘন্টা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তখন মরয়ম (আঃ)-এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।[১]

পবিত্র কোরআনে রূহ ফুঁকে দেয়ার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু কিভাবে ফুঁক দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই, তাই কোন কোন তফসীরকার এ সম্পর্কে নীরব থাকা উত্তম মনে করেছেন।[২]

প্রসব কাল নিকটবর্তী হলে, হযরত মরয়ম (আঃ) জনবসতি থেকে দূরে চলে যান। তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ স্থানটি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে ঐ স্থানটিকে বায়তুল লহম বলা হয়।

বায়তুল মোকাদ্দাসে হযরত মরয়ম (আঃ)-এর ন্যায় অন্য একজন নেককার ব্যক্তিও মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল ইউসুফ নাজ্জার। হযরত মরয়ম (আঃ)-এর গর্ভ ধারণের অবস্থাটা তিনি সর্ব প্রথম উপলব্ধি করেন। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত হতবাক ছিলেন। একদিকে মরয়ম (আঃ)-এর পবিত্রতা, পরহেযগারী এবং কারামত সমূহের ঘটনাবলী, অন্যদিকে তাঁর গর্ভ ধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইউসুফ নাজ্জার একদিন মরয়ম (আঃ)-কে ইঙ্গিতে বললেন। মরয়ম (আঃ) তাঁর ইঙ্গিত উপলব্ধি করে বললেন, তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম যে ফসল সৃষ্টি করেছিলেন তা কোন বীজ ব্যতীতই করেছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম যে বৃক্ষটি তৈরী করেছিলেন তা-ও পানি ব্যতীতই করেছিলেন। অথচ তিনি পানিতেই বৃক্ষের জীবন রেখেছেন। আল্লাহ পাক পানি এবং বৃক্ষকে ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, এরপর একটিকে আরেকটির উপরকরণ হিসাবে তৈরী করেছেন, তুমি কি মনে কর আল্লাহ পাক পানি ব্যতীত বৃক্ষ সৃষ্টি করতে পারেন না? ইউসুফ নাজ্জার বললেন, আমার বিশ্বাস আল্লাহ পাক

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩০১-৩০২
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮১

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন শুধু আদেশ দেন 'হও' তখন সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। মরয়ম (আঃ) বলেছেন তুমি কি জাননা যে দানা, বীজ, ফসল, পানি, বৃষ্টি এবং বৃক্ষের স্রষ্টা একজনই, তিনি যখন কোন বৃক্ষ উৎপন্ন করতে চান তখন দানা পানির কোন প্রয়োজন তাঁর হয়না। ইউসুফ নাজ্জার বললেন, নিশ্চয় একথা সত্য।

এরপর হযরত মরয়ম (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-কে পিতা-মাতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন। হযরত মরয়ম (আঃ)-এর এসব জবাব শ্রবণ করে ইউসুফ নাজ্জার নিশ্চিত হলেন এবং এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে বিষয়টি নিশ্চয় অদৃশ্য জগতের, এখানে আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমত কার্যকর রয়েছে। এর দ্বারা মরয়ম (আঃ)-এর সম্মান করাই উদ্দেশ্য।[১]

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ

"এরপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষের তলায় নিয়ে আসে"।

অর্থাৎ প্রসব বেদনার কারণে তিনি একটি খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেন। একদিকে চরম যন্ত্রণা, অসহায় অবস্থা, নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের অভাব, নিজের সতীত্ব সম্পর্কে মানুষের কটাক্ষ এবং তাঁর দুর্নামের কারণে তিনি অত্যন্ত অস্থির, ব্যাকুল এবং অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। আর ঐ অবস্থায় তিনি বলেছিলেন,

قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

"হায়! ইতিপূর্বে যদি আমি মরে যেতাম, অথবা একবারে বিস্মৃত হতাম (তবে কত ভাল হতো)"!

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ) যখন দেখলেন যে লোকেরা কটাক্ষ বিদ্রুপ করে তখন তিনি সকলকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেন।

ইমাম মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত মরয়ম (আঃ)-এর মধ্যে গর্ভ ধারণের অবস্থা প্রকাশিত হল, আর সমাজের লোকেরা আপত্তিকর মন্তব্য করতে লাগলো তখন তিনি দূরে সরে গেলেন যেন তাঁকে কেউ না দেখে, আর তিনিও যেন কাউকে না দেখেন। যখন প্রসব বেদনা তাঁকে অত্যন্ত কাতর এবং অসহায় করে ফেললো তখন তিনি ঐ খেজুর বৃক্ষটির তলায় আশ্রয় নিলেন। এ বৃক্ষটি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। ঐ অসহায় অবস্থায়ই তিনি আক্ষেপ করে করে বলেছিলেন, হায়! যদি এ ঘটনার পূর্বেই আমি মরে যেতাম। অথবা যদি একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকতাম, তবে এমন দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম না। অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং আশু দুর্ণাম এবং দুশ্চিন্তার কারণে তিনি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৪৮১-৮২
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা ২০১-০২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-২৬

ফেরেশতার মাধ্যমে প্রদত্ত সুসংবাদও ভুলে যান। তফসীরকারগণ লিখেছেন যে আল্লাহ পাক হযরত মরয়ম (আঃ)-এর অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দিয়েছেন যে এ মুহূর্তে খেজুর বৃক্ষের তলায় পৌঁছে যাও, আল্লাহ পাক এমন নিদর্শন সমূহ দেখাবেন যার কারণে তাঁর অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত হয়, আর খাওয়ার জন্যে খেজুর পাওয়া যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

আলোচ্য আয়াতে হযরত মরয়ম (আঃ) ঐ অবস্থায় অসহনীয় যন্ত্রণার কারণে মৃত্যু কামনা করেছেন। বিপদ ও মছিবতের মুহূর্তেও মৃত্যুর আকাংক্ষা করা বৈধ নয়। অথচ মরয়ম (আঃ) অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মৃত্যুর আকাংক্ষা করেছেন।

তত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বণী ইসরাঈলের শরীয়তে মৃত্যুর আকাংক্ষা করা অবৈধ ঘোষণা হয়েছে এ ঘটনার পর, অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ কথাগুলো তাঁর রসনা দিয়ে বের হয়ে গেছে। অথবা হযরত মরয়ম (আঃ) তাঁর দ্বীনি ক্ষতির আশংকা করছিলেন। আর দ্বীনের হেফাজতের লক্ষ্যেই এসব কথা বলেছেন। এতদ্ব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, কোন প্রকার ফেৎনার ভয়ে মৃত্যুর আকাংক্ষা করা অবৈধ নয়।

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ

"তখন তার নীচে থেকে ডাক দিয়ে বলা হয়, "হে মরয়ম! চিন্তা করোনা, তোমার প্রতিপালক তোমার নীচে একটা ঝর্ণা রেখে দিয়েছেন"।

হযরত মরয়ম (আঃ) যে খেজুর বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তা ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে। তাই নীচে থেকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ডাক দিয়ে বলেছিলেনঃ তুমি চিন্তিত হয়োনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন যে মরয়ম (আঃ) একটি টিলার উপর ছিলেন। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) টিলার নিম্নদেশের সমতল ভূমি থেকে ডাক দিয়ে বলেছেন, "হে মরয়ম, চিন্তিত হয়োনা" অর্থাৎ একাকী এবং অসহায় অবস্থায় থাকার কারণে, প্রয়োজনীয় বস্তুর আয়োজন না হওয়ায় এবং মানুষের বিদ্রুপ ও দুর্ণামের ভয়ে তুমি চিন্তা করোনা।

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

"ঐ দেখ, তোমার প্রতিপালক তোমার নীচে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন"। যাতে করে পানীয় দ্রব্যের কোন অভাব না হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী تحتك শব্দটির তরজমা করেছেনঃ তোমার হুকুমের অধীন করে দিয়েছি। তুমি যখন বলবে তখন নহর প্রবাহিত হবে। আর যখন বিরত থাকার হুকুম দেবে তখন বিরত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) জমিনের উপর পদাঘাত করেন, যার ফলে সুমিষ্ট

পানি বের হয়ে আসে। আর এভাবে শুষ্ক বৃক্ষগুলো জীবন্ত ও ফলবান হয়ে ওঠে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী سرى শব্দের অর্থ সর্দার বা নেতা বলে উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে এই শব্দটি سرو ধাতু থেকে উৎপন্ন মনে করতে হবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! ঈসা (আঃ) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেতা ছিলেন।

وَهُزِّىٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

"আর খেজুর গাছের কান্ডকে তোমার দিকে আন্দোলিত কর, পাকা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে"।

একটি মৃত শুষ্ক বৃক্ষে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতে জীবনী শক্তি প্রবাহিত হয়, তাতে মুহূর্তের মধ্যে ফল ধরে এবং পাকে। এভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত মরয়ম (আঃ)-এর পানাহারের ব্যবস্থা করেন। তাজা এবং পাকা খেজুর এমন স্ত্রীলোকদের জন্যে উপকারী এবং শক্তি বর্ধক হয় যাদের ঘরে সদ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

বস্তুতঃ যিনি প্রকাশ্য কোন উপকরণ ব্যতীত শুষ্ক মাটি থেকে নহর প্রবাহিত করতে পারেন, যিনি মৃত শুষ্ক বৃক্ষকে জীবন্ত করে তাতে ফল ধরিয়ে দিতে পারেন, তিনি পিতা ব্যতীত পুত্র সন্তানও দান করতে পারেন। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই মুশকিল বা কঠিন নয়।

يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا

"হায়! যদি ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু হতো"।

চরম যন্ত্রণা এবং অসহায় অবস্থায় মরয়ম (আঃ) বলেছিলেন, হায়! এর পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত। অথচ ইতিপূর্বে জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, এ অবস্থায় তিনি এমন কথা কিভাবে বললেন?

বিখ্যাত তফসীরকার ঈমান রাজী (রঃ) এর জবাব দিয়েছেনঃ

১. হয়তো চরম কষ্টের সময় জীব্রাঈল (আঃ)-এর মারফত প্রদত্ত সুসংবাদের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

২. নেককারদের এটি প্রথায় পরিণত হয়েছে যখন তাঁরা বিপদগ্রস্ত হন, তখন তাঁরা এমন মন্তব্য করেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) একটি পাখিকে দেখলেন, উড়ে এসে একটি বৃক্ষের ডালায় বসে কিছু ফল খায়, আবার সেখান থেকে উড়ে কোথাও চলে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আক্ষেপ করে বলেছিলেন, হে পাখি! তুমি কত ভাগ্যবান, উড়ে আস, খাবার গ্রহণ কর, আবার উড়ে যাও। তোমার কৃতকর্মের জবাবদেহীর কোন প্রয়োজন নেই। যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেনঃ

"যদি আমার জন্মই না হতো, যদি আমি শিশু হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করতাম কত ভাল হতো, অথবা যদি আমি উদ্ভিদ হতাম কোন জীব জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলতো"!

এমনিভাবে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) কাঠের তৈরী তসবীহ পাঠ

করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, হায়! যদি আমি মানব রূপে জন্ম গ্রহণ না করতাম, কাষ্ঠখন্ড হতাম, তবে তার দ্বারা তসবীহ্ তৈরী হতো এবং আল্লাহ পাকের জিকরে তাকে ব্যবহার করা হতো।

অথবা যখন হযরত আলী (রাঃ) "জামালের" যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, যদি এর বিশ বছর আগে আমার মৃত্যু হয়ে যেত কত ভাল হতো! এমনিভাবে হযরত বেলাল (রাঃ) বলেছিলেন, যদি আমার জন্ম না হতো কত ভাল হতো! এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ এমন মন্তব্য করে থাকেন।

৩. হয়তো মরয়ম (আঃ) একথাটি এজন্যে বলেছিলেন, যদি তাঁর সম্পর্কে যারা আপত্তিকর মন্তব্য করে গুনাহগার হচ্ছিল তারা যেন গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, এ লক্ষ্যেই তিনি এমন মন্তব্য করেছিলেন।[১]

এ সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ)-এর সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে লোকেরা জানবে না, মনগড়া কথা বলবে যা হবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক, এভাবে দুর্ণাম ছড়াতে থাকবে, এভাবে তাঁর মন থাকবে অশান্ত, এবাদত-বন্দেগীতে সৃষ্টি হবে অসুবিধা তাই তিনি বলেছেন, হায়! যদি আমি এর পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতাম কত ভাল হতো![২]

وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

"আর খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে তোমার দিকে আন্দোলিত কর" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এদিকে যে, রিয্ক অন্বেষণের জন্যে সচেষ্ট হওয়া কাম্য।[৩]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা ২০৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-২৬
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৬০৭

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي
مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৬) অতএব, পানাহার কর এবং নয়ন জুড়াও, আর যদি কোন মানুষ দেখতে পাও তবে একথা বলো, নিশ্চয় আমি দয়াময় আল্লাহ পাকের উদ্দেশে রোযা পালনের মানত করেছি, তাই আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না।

(২৭) এরপর শিশুকে কোলে নিয়ে সে নিজের সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলে, হে মরয়ম! তুমি যে এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছ।

(২৮) হে হারুনের ভগ্নি! তোমার পিতা মন্দ লোক ছিল না, আর তোমার মাতাও ব্যাভিচারিনী ছিলনা।

(২৯) তখন সে হাতের ইশারায় নবজাত শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে বলে। তারা বললো, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো?

(৩০) সে বললো, নিশ্চয় আমি আল্লাহ পাকের বন্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী মনোনীত করেছেন।

(৩১) আর আমি যেখানেই থাকিনা কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যে যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন যেন নামায এবং যাকাত আদায় করি।

(৩২) এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন, আর তিনি আমাকে নিষ্ঠুর হতভাগ্য করেননি।

তফসীরুল কোরআন

فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا

হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হযরত মরয়ম (আঃ)-কে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, এখন আর তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ পাক তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরত ও রহমতে টাটকা খেজুরের ব্যবস্থা করেছেন। খেজুরের ডালটি তোমার দিকে টেনে আনলেই তাজা টাটকা পাকা খেজুর তোমার উপর ঝড়ে পড়বে, তুমি ঐ খেজুর খাও, আর তোমার উপত্যকার তলদেশে যে ঝরণা আল্লাহ পাকের রহমতে প্রবাহিত হচ্ছে তার পানি পান কর। আর আল্লাহ পাকের বিশেষ দান স্বরূপ যে পুত্র লাভ করেছ তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। ভবিষ্যতে কি হবে বা কে কি বলবে এ বিষয়ে চিন্তা করোনা। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যিনি শুষ্ক মাটিতে তোমার জন্যে ঝরণা প্রবাহিত করেছেন, মৃত শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের ডালে যিনি তোমার জন্যে তাজা পাকা খেজুর দিয়েছেন, তিনি পিতা ব্যতীত পুত্রও দিতে পারেন।

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا

"আর যদি কোন মানুষকে দেখতে পাও তবে একথা বলো, "নিশ্চয় আমি দয়াময় আল্লাহ পাকের উদ্দেশে রোযা পালনের মানত করেছি, তাই আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না"।

অর্থাৎ যদি কোন মানুষ নবজাত শিশু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে, তখন তুমি কোন কথার জবাব দিওনা, বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে যে আমি আজ আল্লাহ পাকের নামে রোযা মানত করেছি, কোন ব্যাপারেই আজকে আমি কথা বলবো না।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আমাদের রোযায় যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়, তেমনি বণী ইসরাঈলের জন্যে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে কথা-বার্তা থেকেও বিরত থাকার বিধান ছিল। আমাদের শরীয়তে কিন্তু এমন রোযা নিষিদ্ধ আর এমন রোযার মানত করাও বৈধ নয়। বণী ইসরাঈলরা যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতো, তেমনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন কথাও বলতো না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ পাক মরয়ম (আঃ)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে "কারো সঙ্গে কোন কথা বলবে না"। আর হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সঠিক সময়ে তিনি নিজেই কথা বলবেন। বর্ণিত আছে যে হযরত মরয়ম (আঃ) ঐ সময় ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে নয়।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ

"এরপর তাকে কোলে নিয়ে সে নিজের লোকদের নিকট উপস্থিত হয়"।

অর্থাৎ হযরত মরয়ম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে কোলে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উপস্থিত হলেন। বর্ণিত আছে যে, জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হযরত

ঈসা (আঃ)-কে কোলে নিয়ে হযরত মরয়ম (আঃ) আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হাযির হন। অবশ্য কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর ৪০ দিন পর্যন্ত পাহাড়ের গুহায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত হন। পথে নবজাত শিশু ঈসা (আঃ) বলেন, আম্মা আমি আল্লাহর বন্দা এবং মসীহ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার। আর এ কারণেই কুমারী মরয়মের কোলে নবজাত শিশু দেখে তাঁরা এত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলেন যে সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

قَالُوا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

তারা বললো, "হে মরয়ম! তুমি যে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, কুমারী নারীর সন্তান"?

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا

তারা বললো, "হে হারুনের বোন! তোমার পিতা মন্দ লোক ছিলেন না, তোমার মাতাও ব্যাভিচারিনী ছিলেন না, তোমার পূর্ব পুরুষ সকলেই চিরদিন সৎ এবং মহৎ ছিলেন এতদসত্ত্বেও তুমি এমন কাজ করলে"?

হযরত মরয়ম (আঃ) যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁকে হারুনের বোন বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন তমীম গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তমীমের ভাই বলা হয়। কালবী (রঃ) বলেছেনঃ হযরত মরয়ম (আঃ)-এর সম্পর্কে ভাই হয় এমন এক ব্যক্তির নাম ছিল হারুন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুজুর্গ লোক। তাই হারুনের বোন বলে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

হযরত মগীরা এবনে শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি যখন নাজরান পৌঁছলাম, তখন নাজরানবাসী লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোরআনে করীমে يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ পাঠ কর। অথচ মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যকার দূরত্ব বেশী, এ অবস্থায় মরয়ম হারুন (আঃ)-এর বোন কি করে হতে পারেন? আমি বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে বর্ণনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেনঃ তারা নিজেদের নাম, তাদের নবীগণ এবং বিখ্যাত নেককার লোকদের নামের সাথে মিলিয়ে রাখত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে هٰرُوْنَ শব্দটি দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতা হারুনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এই নামে তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ ছিল যাকে মরয়মের ভাই বলা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ বণী ইসরাঈলে একজন অত্যন্ত এবাদত গুজার, পরহেযগার লোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হারুন। যখন তাঁর এন্তেকাল হয়, তখন অন্যান্য লোক ব্যতীত শুধু হারুন নামের চব্বিশ হাজার লোক একত্রিত হয়। মরয়ম (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত নেককার, পরহেযগার, এবাদতগুজার। তাই লোকরা তাঁকে হারুন-ভগ্নি বলে

সম্বোধন করেছে আর তা তারা মরয়ম (আঃ)-এর এবাদত-বন্দেগীর কারণেই করেছে অর্থাৎ বংশ সূত্রে নয়; বরং এবাদত বন্দেগীর কারণেই তাঁকে হারুনের ভগ্নি বলা হয়েছে যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

যারা অর্থ সম্পদ অপচয় করে, তারা হলো শয়তানের ভাই অর্থাৎ শয়তানের ন্যায় তারা আল্লাহর নেয়ামতের অপচয় করে। এজন্যে তাদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

অথবা, মরয়ম (আঃ)-এর এবাদত-বন্দেগীর প্রতি লক্ষ্য করে এ নামকরণ করা হয়েছে।[১]

মরয়ম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান, যিনি মসজিদে আকসার ইমাম ছিলেন এবং অত্যন্ত নেককার পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন আর তাঁর মায়ের নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকুজা। মরয়ম (আঃ)-এর ভ্রতার নাম ছিল হারুন। যিনি এবাদত-বন্দেগী এবং দ্বীনদারী ও তাকওয়া পরহেযগারীর জন্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। আর এজন্যেই তাঁকে يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ বা হারুনের বোন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু বণী ইসরাঈলে নবী রসূল বা আউলিয়ায়ে কেরামের নামানুসারে নামকরণ করা হতো যেমন মুসলমানদের মধ্যে কোটি মানুষের নাম মোহাম্মদ এবং আহমদ দিয়ে রাখা হয়। তেমনি হয়তো হযরত হারুন (আঃ)-এর নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে যেমন কোরআনে করীমে وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ বলা হয়েছে। আর এমনিভাবেই মরয়ম (আঃ)-কে يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ বলা হয়েছে।

যাহোক, মরয়ম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের কটাক্ষ এবং বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা শ্রবণ করে নীরব হয়ে গেলেন এবং নবজাত শিশুর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে তার সঙ্গে কথা বল, সে-ই তোমাদের কথার জবাব দেবে। তারা আরো বেশী রাগান্বিত হয়ে বলল, এতো অত্যন্ত নির্লজ্জ পরিহাস। আমরা এই কোলের শিশুর সঙ্গে কি কথা বলবো? হযরত জাকারিয়া (আঃ) এ সমস্ত খবর পেয়ে মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং শিশুটিকে সম্বোধন করে বললেনঃ যদি তুমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদিষ্ট হও, তবে তোমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা কর।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

"সে বলল, আমি আল্লাহর বন্দা, আমাকে তিনি কিতাব দান করেছেন এবং নবী মনোনীত করেছেন"।

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

---

[১] তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩০৭-০৮

"আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে তিনি বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন যেন নামায এবং যাকাত আদায় করি এর নির্দেশ দিয়েছেন"।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا

"আর আমাকে আল্লাহ্ পাক আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী করেছেন এবং তিনি আমাকে নিষ্ঠুর, হতভাগ্য করেননি"।

বর্ণিত আছে যে, শিশু ঈসা (আঃ) মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে দুগ্ধ পান ছেড়ে দিলেন এবং লোকদের দিকে ফিরে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বলে উঠলেন, আমার মাতা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, আমি আল্লাহর বন্দা (আমি আল্লাহর পুত্র নই)। এভাবে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-ই করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদের বাতুলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

إِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বন্দা," আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ পিতা ব্যতীত অলৌকিকভাবে আমি পয়দা হয়েছি।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সম্মানিত মাতার উপর যে অপবাদের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল তা দূরীভূত করা। কিন্তু তিনি সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের বন্দা, অতএব কেউ যেন আমাকে আর কিছু মনে না করে। এভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খৃষ্টানরা যে আল্লাহর পুত্র বলে অপবাদ দেয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক এসব সম্পর্ক থেকে অনেক অনেক উর্দ্ধে, তিনি সর্ব প্রকার শেরক থেকে পবিত্র। খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের পর ইহুদীদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করছেনঃ

وَجَعَلَنِى نَبِيًّا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমাকে নবী মনোনীত করেছেন, ইহুদীরা যে দাবী করে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নবী নন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথারও প্রতিবাদ করেছেন হযরত ঈসা (আঃ)। মনে রাখতে হবে, যখন তিনি এসব কথা বলেছিলেন তখন তিনি কোলের কচি শিশু, যার পক্ষে কোন কথা বলা তো সম্ভবই নয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়ে সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর সম্মানিত মাতার সম্পর্কে লোকেরা যে অপবাদ দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করে বলেছেন,

وَجَعَلَنِى مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ

আর আল্লাহ্ পাক আমাকে বরকতময় করেছেন। আমার মাতা তোমাদের আরোপিত অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি সতী, সাধ্বী, তিনি পূণ্যের প্রতীক।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাক আমাকে কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জীল দান করেছেন, যা হলো আমার নবুওয়্যতের প্রমাণ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

"আল্লাহ পাক আমাকে নবী বানিয়েছেন"।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে তিনি আমাকে নবী বানাবেন এবং আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করবেন। আর যেহেতু এ সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত, তাই এর নির্দিষ্ট সময়ে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ

অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই গমন করি, বরকত আমার সঙ্গে থাকবে, কেননা আল্লাহ পাক আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন। আর তা একথার প্রমাণ যে আমি আল্লাহ পাকের একজন মোবারক বন্দা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, আল্লাহ পাক আমাকে নামায এবং যাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মোমেনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ "যারা সর্বদা নামায আদায় করে"। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মানুষ সর্বক্ষণ নামাযই আদায় করবে বরং যথা নিয়মে নামাজ কায়েম করবে। এ নির্দেশই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

مَا دُمْتُ حَيًّا

অর্থাৎ "যতক্ষণ আমি পৃথিবীতে জীবিত থাকি"।

এর কারণ এই যে পৃথিবী থেকে আসমানে উত্তোলনের পর শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী থাকে না। কেয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথা নিয়মে শরীয়তের বিধান পালন করবেন। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক আমাকে নামায এবং যাকাতের আদেশ দিয়েছেন। আর নামায এবং যাকাত আল্লাহ পাকের এবাদত। এবাদত এবং বন্দেগী প্রমাণ হলো বন্দা হওয়ার। আর বন্দা হওয়া এবং মা'বুদ বা উপাস্য হওয়া কখনও একত্রিত হতে পারেনা। অতএব খৃষ্টানরা যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বা অন্য কিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ

"আল্লাহ পাক আমাকে আমার মাতার খেদমত গুজার বানিয়েছেন"।

অর্থাৎ তাঁর সেবা-যত্ন করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পিত হয়েছে। একথাটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে আমি পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করেছি এবং আমার মাতা সতী সাধ্বী এবং পূর্ণ পবিত্র, তাঁর সম্মান এবং তা'যীম করা আমার কর্তব্য।

যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন পিতা থাকতেন তবে খেদমত এবং তা'যীমের ব্যাপারে শুধু মাতার উল্লেখ থাকতো না, বরং পিতার কথাও উল্লেখ করা হতো যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ঘটনায় এরশাদ হয়েছেঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

অর্থাৎ ইয়াহইয়া (আঃ) তাঁর পিতা-মাতা উভয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য

وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا

"আর আল্লাহ পাক আমাকে নিষ্ঠুর হতভাগা করেননি" যে আমি আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করবো; বরং আল্লাহ পাক আমাকে নেককার এবং বিনয়ী করেছেন। কেননা যার মধ্যে বিনয় থাকে না, যে অহংকারী হয় তার ধ্বংস অনিবার্য। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে যারা নামায কায়েম করে না এবং যাকাত আদায় করে না এবং মাতার অবাধ্য হয় তারা নিঃসন্দেহে অহংকারী এবং বদ নসিব হয়। আর বিনয়ী এবং নেককার হওয়া একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দা ছিলেন। কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে আমি যদি আমার স্রষ্টা আল্লাহ পাকের বা কোন সৃষ্টির হক্ব যথাযথভাবে পালনে বিরত থাকি তবে তা হবে আমার দূর্ভাগ্য এবং বদ নসিবী।

এ বিবরণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে কোন মানুষ তার গুণাবলী পরিচয় পেশের উদ্দেশে নিজে বর্ণনা করতে পারে; ইসলামী শরীয়ত তা নিষেধ করে না। যদি উদ্দেশ্য শুধু পরিচয় দেয়াই হয়, গর্ব এবং গৌরব করা না হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন جبار এবং شقى অর্থাৎ নিষ্ঠুর এবং হতভাগা সে-ই হয় যে ক্রোধের বশীভূত হয়ে হত্যাকান্ড করে। পিতা-মাতার অবাধ্য সেই হয় যে প্রকৃতপক্ষে হতভাগা হয় যে অহংকারী হয় তাকেই চরিত্রহীন বলা হয়।

একবার একজন স্ত্রীলোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে হতবাক হয়ে বলেছিল, সেই উদর অত্যন্ত মোবারক যাতে আপনি লালিত-পালিত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩০

হয়েছেন। আর সে বক্ষ অত্যন্ত মোবারক যে আপনাকে দুগ্ধ পান করিয়েছে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করলেন, সে ব্যক্তি মোবারক যে আল্লাহ্ পাকের কিতাব পাঠ করে এবং এরপর তা মেনে চলে এবং অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ না হয়।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যাকাত আদায়ের আদেশ প্রদানের যে কথা রয়েছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে তাঁর নিকট কখনও অর্থ-সম্পদ ছিল না এমন অবস্থায় তাঁর প্রতি যাকাত প্রদানের এ নির্দেশের তাৎপর্য কি? কোন কোন তফসীরকার এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেনঃ আয়াতের অর্থ হলো, যদি কখনও আমার নিকট অর্থ-সম্পদ আসে তখন তিনি আমাকে যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যাকাত অর্থ আর্থিক যাকাত নয়; বরং এর অর্থ হলো, অধিক পরিমাণে কল্যাণ সাধন করা। অথবা এর অর্থ হলো, আমার প্রতি এই হুকুম হয়েছে যে যতদিন আমি জীবিত থাকি, আমি যেন তোমাদেরকে নামায এবং যাকাত আদায়ের আদেশ দিতে থাকি।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের جبارا শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেনঃ অবাধ্য, অহংকারী। আর তিনি شقى শব্দের ব্যাখ্যা করেছেনঃ আল্লাহর নাফরমান। অথবা সে ব্যক্তি যে গুনাহ্ করে কিন্তু তওবা করেনা।[২]

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, হযরত ঈসা (আঃ) মায়ের কোলে বসে যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি صيغه ماضى তথা অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এর কারণ এই যে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা অনিবার্য অপরিহার্য এবং সুনিশ্চিত। তাই তিনি অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন অনাগত ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জন্যে। কেননা যা ঘটবে তা অবশ্যই ঘটবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআনে করীমে অনাগত ভবিষ্যতের কোন কার্যকে অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন কেয়ামতের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছেঃ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

"আল্লাহ্ পাকের আদেশ এসে পড়েছে সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করোনা"।

কেয়ামত যেহেতু অবশ্যই আসবে তাই এ বর্ণনা ধারা ব্যবহৃত হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২১৫
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩০৯-১০

وَالسَّلٰمُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣ ذٰلِكَ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٣٤ مَا كَانَ
لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٣٥ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٣٦ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٣٧ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ
يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٨

তরজমা

(৩৩) আমার প্রতি সালাম রয়েছে আমার জন্ম দিনে, মৃত্যুর দিনে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।

(৩৪) এ হলো মরয়ম-তনয় ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

(৩৫) সন্তান গ্রহণ আল্লাহ্ পাকের পক্ষে শোভন নয়। তিনি পাক, পবিত্র, তিনি মহিমময়। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

(৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকই আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর। আর এটিই সরল সঠিক পথ।

(৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যকার দলগুলো নিজেদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। অতএব, ধ্বংস কাফেরদের জন্যে যখন তারা মহা দিবসের সম্মুখীন হবে।

(৩৮) যেদিন তারা আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত সুস্পষ্টভাবে শুনবে এবং দেখবে। কিন্তু জালেমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমার প্রতি শান্তি, নিরাপত্তা, যেদিন আমি সৃষ্টি

হয়েছি, আমার জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে আল্লাহ পাক আমাকে হেফাজত করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা আমি সেদিনও লাভ করবো যেদিন আমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক কবরের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করবেন, এমনিভাবে সালাম বা নিরাপত্তা সেদিনও থাকবে যেদিন আমাকে পুনর্জীবন দিয়ে কবর থেকে উঠানো হবে অর্থাৎ সেদিন আল্লাহ পাক আমাকে কেয়ামতের কঠিন বিপদ থেকে এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ এটি হল হযরত ঈসা (আঃ)-এর অষ্টম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতি স্তরের জন্যে রহমত, শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ কথাটিও তাঁর এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ যে তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের অতি পছন্দনীয় বিশিষ্ট বন্দা, আল্লাহ পাকের রহমতেই তিনি লাভ করেছেন এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী। অতএব, তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূলও। খৃষ্টানরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা সত্য নয়, আর ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা-ও অসত্য।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণের পর কয়েক বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হয়ে জীবন যাপন করবেন, এরপর মদীনা মুনাওয়্যারায় তাঁর এন্তেকাল হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায়ে মোবারকে তাঁকে দাফন করা হবে। আর আল্লাহ পাকের কুদরতে সেখানে একটি কবরের স্থান অবশিষ্ট রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোলের কচি শিশুর মুখে এসব বিস্ময়কর কথাবার্তা শ্রবণ করে লোকেরা হতবাক হয়ে এ সত্য উপলব্ধি করে যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, তাঁর বিশেষ বন্দা ও রসূল এবং তাঁর মাননীয়া মাতা হযরত মরয়ম (আঃ) নিঃস্পাপ, নিস্কলঙ্ক, পবিত্র। আর একথাও বর্ণিত আছে যে এসব কথা বলার পর হযরত ঈসা (আঃ) নীরব হয়ে যান, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন শিশুরা কথা বলে তার পূর্বে আর কোন কথা বলেনি।[১]

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

"এ হলো মরয়ম-পুত্র ঈসা"।

অর্থাৎ উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহে যাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তিনি ঈসা এবনে মরয়ম। আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির বর্ণনা-শৈলীর মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্তবার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এত সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট লোকেরা অন্যায় অসুন্দর কথা বলে এবং জ্বলন্ত

১। তফসীরে কুরতবী, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৮৮
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩১০-১১

সত্যকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায় এবং তাঁর সম্পর্কে অযথা বিতর্ক ও কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং অমূলক সন্দেহ পোষণ করে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের প্রিয় এবং নৈকট্য-ধন্য বন্দা এবং তাঁর নবী। আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে তাঁর জন্ম। শৈশবেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে পূর্ণ জ্ঞানী মানুষের ন্যায় কথা বলার তৌফিক দান করেছেন। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি খোদা নন এবং খোদার পুত্রও নন, যেমন খৃষ্টানরা বলে বেড়ায়; বরং তিনি আল্লাহ্ পাকের একজন প্রিয় বন্দা। আর যেভাবে অভিশপ্ত ইহুদীরা তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় তিনি তা-ও নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল। যারা তাঁর বংশে কলংক আরোপ করে নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে প্রকৃত সত্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল।

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ

"তাঁর সম্পর্কে এটিই সত্য কথা যাতে তারা কলহে লিপ্ত"।

তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বন্দা ও নবী। তাঁর মাতা পবিত্র, নিষ্কলংক। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ এর ذٰلِكَ অব্যয় দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী একটি বাক্যের প্রতি।

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ

(আমি আল্লাহর বন্দা, আল্লাহ্ পাক আমাকে কিতাব দান করেছেন।)

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই হলো ঈসা এবনে মরয়মের প্রকৃত পরিচয়। নিঃসন্দেহে তিনি মরয়মের পুত্র যাকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরতের নমুনা স্বরূপ পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন।[১]

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ

"সন্তান ধারণ করা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে অশোভন, তিনি পবিত্র। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়"।

সন্তান-সন্ততি গ্রহণ আল্লাহ্ পাকের শানের বরখেলাফ। তিনি এসবের বহু উর্দ্ধে। তাঁর শান এবং মহিমা বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন كُنْ (হও), যেন তা হয়ে যায়। তাঁর এক 'কুন' শব্দের ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব সন্তান-সন্ততির তাঁর কী প্রয়োজন? মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় বা বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ঐ ব্যক্তির সন্তানেরা, অথবা যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমেই তার বংশ রক্ষা পায়।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২১৭

মহা-মহীম, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ পাকের এসবরে কোন প্রয়োজন নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হওয়ার প্রশ্নেই ওঠে না, তিনি চিরঞ্জীব। আর সকল সৃষ্টিরই লয় আছে, তিনি মহান স্রষ্টা, তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"বিশ্ব বক্ষ্রান্ডের বুকে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব"।

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ কথাটি হযরত ঈসা (আঃ)-এরই, ইতিপূর্বে তাঁর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন,

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ

নিশ্চয় আমি আল্লাহর বন্দা। এরপর আলোচ্য বাক্যটি তারই উপসংহার। আর এ দু' বাক্যের মধ্যে রয়েছে,

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

এ হল ঈসা এবনে মরয়ম।

অর্থাৎ এ পর্যন্ত যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হল, তিনিই হলেন মরয়ম পুত্র ঈসা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে। (وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ) এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে আপনি কিতাবে ঈসা এবং মরয়মের আলোচনা করুন, এরপর মানুষকে একথাও জানিয়ে দিন যে আল্লাহ পাকই আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন পুত্র, পৌত্র নেই, অতএব তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, নিরংকুশ তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করাই হল সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ। পৃথিবীতে যত নবী রসূল আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই মানব জাতিকে এ সত্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

বস্তুতঃ ঈমানকে সুদৃঢ় এবং আমলকে সঠিক করার নামই হল সিরাতুল মুস্তাকীম। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা আর ঐ বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকাই হল কল্যাণ লাভের পন্থা, আর এটিই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে যেহেতু আল্লাহ পাকই মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তাই এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করাই মানুষের কর্তব্য। আর তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই হল সরল সঠিক পথ বা সীরাতুল মুস্তাকীম।[১] যেমন সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

"আর শুধু আমারই বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ"।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ

"এরপর তাদের মধ্যকার দলগুলো নিজেদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। অতএব, ধ্বংস কাফেরদের জন্যে যখন তারা মহা দিবসের সম্মুখীন হবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন احزاب বা দলগুলো হল ইহুদী এবং খৃষ্টান অথবা খৃষ্টানদের বিভিন্ন ফেরকা। খৃষ্টানদের মধ্যে তিনটি বড় বড় ফেরকা ছিল।

(১) নেস্তুরিয়া ফেরকা তারা বলতো, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

(২) আর ইয়াকুবীয়া ফেরকার ভ্রান্ত মত হল, ঈসা ছিলেন খোদা। খোদা পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, এরপর আসমানে প্রত্যাবর্তন করেছেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

(৩) আর মালাকাইয়া ফেরকা বলতো, হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর বন্দা এবং রসূল।[২]

আর এ মতই সঠিক। এটিই ইসলামের আকীদা।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"অতএব, ধ্বংস কাফেরদের জন্যে যখন তারা মহা দিবসের সম্মুখীন হবে"।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য, তাদের জন্যে সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন। অতএব, বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হল, কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ

"যেদিন তারা আমার নিকট আসবে, সেদিন তারা কত সুস্পষ্টভাবে শুনবে এবং দেখবে"।

আলোচ্য আয়াতের দু'টি বাক্যই আশ্চর্যবোধক, অর্থাৎ কি আশ্চর্য যখন দেখা এবং

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২২০
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা--৪৯০
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১২

শোনার একান্ত প্রয়োজন ছিল, সত্যকে গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয় ছিল তখন তারা চোখে দেখেনি কানেও শোনেনি, সত্যের প্রতি কর্ণপাত করেনি, কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন দেখা-শোনা কোন কাজেই আসবে না তখন মনে হবে তাদের দৃষ্টি শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু তা তাদের জন্যে কোনভাবেই উপকারী হবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এতে রয়েছে কাফেরদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী, তাদেরকে এর দ্বারা কেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ দু'টি বাক্য দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে শুনিয়ে দিন এবং তাদেরকে সেই কঠিন দিনের অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করুন।

لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"কিন্তু এ জালেমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে"।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদেরকে জালেম বলা হয়েছে, কেননা তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে। তারা নিজেদের চক্ষু এবং কর্ণ সত্য উপলব্ধির জন্যে, সঠিক পথ গ্রহণের জন্যে ব্যবহার করেনি, পথভ্রষ্ট এবং দিশেহারা অবস্থায় তারা জীবন অতিবাহিত করেছে। তাই তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই জালেমরা তখন সত্য কথা শ্রবণ করবে যখন তা তাদের কোন কাজে আসবেনা, আর তখন তারা সত্যকে দেখবে যখন তা তাদের জন্যে কোন প্রকারেই উপকারী হবেনা।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৮

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ
هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا
يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا
نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ
عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৩৯) (হে রসূল!) তাদেরকে পরিতাপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, তারা ঈমান আনেনা।

(৪০) নিশ্চয় আমিই সমগ্র পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুর একমাত্র মালিক, আর তাদের সকলকে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।

(৪১) আর (হে রসূল!) এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথাও উল্লেখ করুন, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী।

(৪২) যখন তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! যারা শ্রবণ করেনা এবং যারা দেখতে পায়না এবং তোমার কোন কাজেও আসেনা, কেন তুমি তাদের বন্দেগী কর?

(৪৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট এসেছে এমন জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি, অতএব আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবো।

(৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের তাবেদারী করোনা, শয়তান তো দয়াময় আল্লাহ পাকের অবাধ্য।

(৪৫) হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, এমন অবস্থায় তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।

তফসীরুল কোরআন

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ

"(হে রসূল!) তাদেরকে পরিতাপের দিন সম্পর্ক সতর্ক করে দিন যখন সকল সিদ্ধান্ত

হয়ে যাবে"।

সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ

এ আয়াতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে (হে রসূল!) আপনি মানুষকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন, সেদিন হবে ভাল মন্দ সকলের জন্যেই অত্যন্ত আক্ষেপ ও পরিতাপের দিন। মন্দ লোকেরা তাদের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করবে যে কেন সেই মন্দ কাজগুলো করেছি। সেদিন কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি মাটি মাটিই থাকতাম, মানব রূপ ধারণ না করতাম তবে কত ভাল হতো! পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَقُولُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا (সূরা নাবা)

"কাফের বলবে, হায়! যদি আমি মাটিই থাকতাম"!

এমনিভাবে যারা নেককার তারাও আক্ষেপ করবেন, হায়! যদি আরও নেক আমল করতাম কত ভাল হতো! কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَقُولُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

"সে বলবে, হায়! যদি আমার এ জীবনের জন্যে আমি কিছু করে পাঠাতাম, তবে কত ভাল হতো"!

যাহোক, কেয়ামতের দিনকে আক্ষেপ এবং পরিতাপের দিন বলা হয়েছে, আর সে দিনের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করার আদেশ দেয়া হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে।

আক্ষেপ কখন হবে

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আক্ষেপ তখন হবে যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, আর দোযখীরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আর মৃত্যুকে জবেহ করে দেয়া হবে। জান্নাতীদেরকে বলা হবে তোমরা চিরদিনের জন্যে জান্নাতে থাকবে, আর দোযখীদেরকে বলা হবে তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন বেহেশত দোযখের মধ্যস্থলে মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে হাযির করা হবে এবং সকলের সম্মুখে তাকে জবেহ করে ঘোষণা করা হবে, বেহেশতবাসীগণ এখন চিরদিন বেহেশতে বাস করবে, কখনও তাদেরকে বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত থেকে মাহরুম করা হবেনা, এমনিভাবে দোযখবাসীরাও চিরদিন দোযখে থাকবে, কখনও আর তাদের মৃত্যু হবেনা। তাই কাফেরদের আক্ষেপের অন্ত থাকবে না। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। (বোখারী শরীফ)

তেবরানী ও আবু ইয়ালা হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ শুধু সেই সময়ের জন্যে আক্ষেপ করবেন, যা তারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের স্মরণ ব্যতীত অতিবাহিত করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই আক্ষেপ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করবেন, এ আক্ষেপ কেমন হবে? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যদি মৃত ব্যক্তি নেককার হয় তবে সে এজন্যে আক্ষেপ করবে, আরও অধিক পরিমাণে নেক আমল কেন করলো না। আর যদি মৃত ব্যক্তি বদকার হয় তখন এজন্যে আক্ষেপ করবে যে মন্দ কাজ থেকে কেন বিরত হলোনা।[১]

বর্ণিত আছে, জান্নাতবাসীগণ এ ঘোষণার কারণে এত খুশি হবেন যে, যদি মৃত্যু বাকী থাকতো তবে অতি খুশির কারণে তারা মরে যেত, এমনিভাবে দোযখবাসীরা আক্ষেপ করে এমন চিৎকার করবে যে যদি মৃত্যু থাকতো তবে তারাও মরে যেত।

কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে

এজন্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে, কখনও দোযখ থেকে তারা নাজাত পাবেনা। ইমাম কুরতবী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর লিখেছেন, আমি এ সম্পর্কে আমার التذكرة بامور الاخرة নামক গ্রন্থে এ পর্যায়ে কোরআনে করীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের উল্লেখ করে প্রমাণ করেছি যে কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে, তারা কখনও দোযখ থেকে নাজাত পাবেনা।[২]

হাফেজ আসকালানী (রঃ) বোখারী শরীফের টীকায় লিখেছেনঃ ইমাম কুরতবী (রঃ) (মৃত্যুকে জবেহ করার হাদীস সম্পর্কে) লিখেছেন, দোযখীদের আযাবের কোন শেষ নেই, কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে, কখনও তাদের মৃত্যু আসবেনা, কখনো তারা দোযখ থেকে নাজাত পাবেনা। যারা এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, কয়েকদিন পর দোযখীদের দোযখ থেকে বের করে দেয়া হবে অথবা দোযখ খালি থাকবে বা খতম হয়ে যাবে, তবে এ ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের আওতা থেকে বের হয়ে যাবে যা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন।[৩]

বস্তুতঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত দুঃখ এবং আক্ষেপের আরেকটি কারণও হবে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি ঘর জান্নাতের এবং একটি ঘর দোযখের দেখানো হবে। এরপর বলা হবে, হে কাফেররা! যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে এবং নেক আমল করতে তবে জান্নাতের এই ঘরে থাকতে, এরপর

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩১৩-১৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩৩
২। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৪৯১-৯৩
৩। ফতহুল বারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৬৩

বলা হবে হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা কুফরী ও নাফরমানী করতে তবে দোযখের এই ঘরে থাকতে, আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় কর যে তিনি দয়া করে তোমাদেরকে ঈমান এবং নেক আমলের তৌফিক দান করেছেন। একথা শ্রবণ করে কাফেরদের দুঃখ ও চিন্তার অন্ত থাকবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর ওয়াজ ও বয়ানে একথাটি বলতেনঃ

وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ কাফেররা আজ গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং গাফলতের আবর্তে নিপতিত রয়েছে, তারা কেয়ামতের মহা বিপদের দিনের ব্যাপারে বিশ্বাসই করেনা, তাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ এ বিষয়ে ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করেনা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং চির শান্তি, চির মুক্তির যে নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন তার প্রতিও তারা ঈমান আনেনা। তাই তাদেরকে অনেক আক্ষেপ করতে হবে, অনেক অনুতাপ করতে হবে কিন্তু অনুতাপে তাদের কোন লাভ হবেনা।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

অর্থাৎ অবশেষে একদিন সকলের উপরই মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান কার্যকর হবে, সকলকেই চিরতরে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে এবং কারোই কিছু থাকবে না। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু এক আল্লাহ্ পাকের হাতেই থেকে যাবে।

وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ

"আর আমার কাছেই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে"।

অর্থাৎ কবর থেকে পুনরুত্থানের পর আমার নিকটই তাদেরকে হাযির করা হবে, আমি তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবো।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি কত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন আর কিভাবে তিনি তাঁর পিতাকে তৌহীদের প্রতি আহবান করেছেন, আর কিভাবে শেরক ও মূর্তি পূজার বাতুলতা প্রকাশ করেছেন এবং তৌহীদের দাওয়াতের সময় কিভাবে পিতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন এবং কিভাবে তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের পিতাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এমনকি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আর আল্লাহ পাক তাঁর মরতবা বুলন্দ করেছেন, তাঁকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান করেছেন এসব কিছুর বিবরণই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত আদম (আঃ)-এর দু' হাজার বছর পর এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর এক হাজার বছর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত, এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে হযরত মরয়ম (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনায় সে সব বিভ্রান্ত লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যারা কোন জীবিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক মনে করতো, আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনায় সেই মুশরেকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতো এবং সে মূর্তিগুলোকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করতো। কেয়ামতের দিন তারা সর্বাধিক আক্ষেপ করবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সূরায় মূলতঃ তিনটি বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে (১) তৌহীদ, (২) নবুওয়্যত এবং (৩) হাশর। যারা তৌহীদকে অস্বীকার করে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন জীবিত বুদ্ধিমান মানুষকে মা'বুদ বা উপাস্য মনে করে যেমন খৃষ্টানরা। আর দ্বিতীয় দল হল যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রাণহীন কোন কিছুকে উপাস্য মনে করে অর্থাৎ যারা মূর্তি পূজা করে।

হযরত ঈসা (আঃ) এবং মরয়ম (আঃ)-এর ঘটনায় মুশরেকদের প্রথম দলের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনায় মুশরেকদের দ্বিতীয় দলের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য সূরায় এ হল তৃতীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে এভাবেঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যেভাবে জাকারিয়া (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন।[২]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার তাৎপর্য

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরব দেশে যুগ যুগ ধরে অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আরব জাতি তাঁকে জাতির পিতা মনে করতো। এজন্যে কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০০
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২২২

"এবং যে নিজেকে নির্বোধ করে রেখেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম থেকে কে বিমুখ হতে পারে"?

যেহেতু আরবরা বলে বেড়াতো যে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের অনুসারী, তাই এ পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। এ কারণে যখন আরবরা তাঁকে সম্মানিত মনে করে তাই তাদের হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করা উচিৎ। তিনি ছিলেন তৌহীদবাদী, তৌহীদের জন্যেই তাঁকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়েছে। আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভক্ত এবং তাঁর ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করতো, অথচ তারা ছিল শেরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে তাদেরকে শেরক ও পৌত্তলিকতা বর্জন করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভক্ত বা অনুসারী হওয়ার দাবী করার পর মুশরেক বা পৌত্তলিক হওয়া নিতান্ত ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহীদ তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে নিকট আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর পিতাকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন। দেশ থেকে হিজরত করেছেন, তবু আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন। যদি তোমরা তাঁর ভক্ত হয়ে থাক, যদি সত্যি সত্যিই তোমরা তাঁর অনুসারী হও তবে শেরক ও পৌত্তলিকতা বর্জন কর।

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

'সিদ্দীক' শব্দের ব্যাখ্যা

তফসীরকারগণ এ শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেনঃ (১) সাধারণতঃ অতি সত্যবাদী ব্যক্তিকেই সিদ্দীক বলা হয়। (২) যিনি কখনও মিথ্যা বলেননি। (৩) যিনি সত্য বলতে অভ্যস্ত হয়েছেন। আর এ অভ্যাসের কারণে কখনও অসত্য কথা বলেননি। (৪) যার আকীদা ও বিশ্বাস ঠিক হবে, যার কথা সত্য হবে, যে তার আমলের মাধ্যমে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে। (৫) আল্লাহ্ পাকের সমস্ত গায়বী গুণাবলী, আম্বিয়ায়ে কেরাম, ফেরেশতাগণ এবং কেয়ামত এক কথায় আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে সত্য জানবে এবং আমলের মাধ্যমে স্বীয় বিশ্বাসের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

বস্তুতঃ যে নিজের কথাকে সর্বদা সত্যে পরিণত করে, সর্বদা যার অন্তরে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বর্তমান থাকে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আগত প্রত্যেকটি বিষয় যে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যক্তিকেই সিদ্দীক উপাধি প্রদান করা হয়।

যেহেতু সিদ্দীক হওয়ার জন্যে নবী হওয়া একান্ত অপরিহার্য নয়, অথচ ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নবী তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

"তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করা এবং তার উপর আমল করা প্রত্যেক মোমেনের একান্ত কর্তব্য। যারা তা করে তাদেরকে "সালেহীন" বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেক সালেহকে সিদ্দীক বলা হয় না, বরং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমেই এ মর্তবা লাভ করা যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম সরাসরি এ মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু উম্মতীদেরকে আল্লাহর নবীর অনুসরণের মাধ্যমেই এ মর্তবা লাভ করতে হবে। কোন উম্মতীই যখন নবীর অনুসরণে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখন তার ক্বলবে বিশেষ নূর বিচ্ছুরিত হয়, এভাবে সে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। সে সময় তাকে "সিদ্দীক" হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

"আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হয় তাদের হাশর হবে সে সব লোকদের সঙ্গে যাদেরকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ"।

এ চারদলই হবে আল্লাহ পাকের নেয়ামতপ্রাপ্ত অন্য মোমেনদেরকে তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সিদ্দীক। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও যারা বিশিষ্ট তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্দীক। কেননা, স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সিদ্দীক বলেছেন।[১]

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا

"যখন তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "হে আমার পিতা! যারা শ্রবণ করেনা এবং দেখতে পায় না এবং তোমার কোন কাজেও আসে না, কেন তুমি তাদের বন্দেগী কর"?

অর্থাৎ তাদের শ্রবণ শক্তি নেই, দেখার শক্তিও নেই, কারো কোন উপকার করারও শক্তি নেই, এমন অবস্থায় কোন্ যুক্তিতে তুমি তাদের পূজা কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে তার পথভ্রষ্টতার কথা বলেন এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক করলেন। হাতে বানানো নিস্প্রাণ জড় পদার্থকে পূজা করার উদ্দেশ্য কি?

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩১৬

নিঃসন্দেহে এ কাজটি সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا

"হে আমার পিতা! আমার নিকট এসেছে এমন জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি, অতএব আমার অনুসরণ কর, আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করবো"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর বিধি-নিষেধের যে এলম আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন তা আপনাদের নিকট নেই। তাই এ ব্যাপারে আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল সঠিক পূণ্য পন্থা প্রদর্শন করবো যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সমূহ কল্যাণ। অতএব, কল্যাণের পথ অবলম্বন করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

فَٱتَّبِعْنِىٓ

اتبع অর্থ কারো পেছনে চলা, তথা তার অনুসরণ করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হে আমার পিতা! আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমাকে আল্লাহ পাক তৌহীদ এবং আখেরাত সম্পর্কে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা আপনাদের নিকট নেই। অতএব, আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে মঞ্জিলে মকসুদে তথা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌছে দেব। আর আপনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সফল হবেন, আল্লাহ পাকের পথই সরল সঠিক পথ। এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই ভুল শুধুই ভুল।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

"হে আমার পিতা! শয়তানের তাবেদারী করোনা, শয়তান তো দয়াময় আল্লাহ পাকের অবাধ্য"।

শয়তানের অনুগামী হয়োনা

বস্তুতঃ শয়তানের প্ররোচনাতেই মানুষ শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। মূর্তি পূজা করে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে এবং পাপাচারকে অতি সুন্দর করে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করে। এজন্যে সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে বণী আদম! আমি কি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা, নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু"।

তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেন, হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করবেন না, নিশ্চয় শয়তানের দয়াময় আল্লাহ পাকের অবাধ্য।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ

"হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, এমন অবস্থায় তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু"।

আল্লাহ পাকের রহমত নিঃসন্দেহে অনন্ত অসীম, তাঁর দয়া মায়া সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু হে আমার পিতা! যদি আপনি কুফর ও নাফরমানী থেকে বিরত না হন তবে আমার ভয় হয় একদিন আল্লাহ পাকের আযাব আপনাকে পাকড়াও করে বসবে।

فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا

"এমন অবস্থায় তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু"।

শয়তানের উপর যেভাবে লা'নত হয়েছে, আপনার প্রতিও সেই লা'নত পড়বে। আর আখেরাতে যেভাবে শয়তান আযাব ভোগ করবে সেই আযাব বা শাস্তি আপনাকেও ভোগ করতে হবে।

আল্লামা বয়যাভী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে শয়তানের অবাধ্য নাফরমান হওয়ার কথাই উল্লেখ হয়েছে। আর কোন গুনাহর কথা বলা হয়নি, হয়তো এ কারণে যে, সকল গুনাহর মূল উৎসই হল আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমান হওয়া। অতএব, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।[১]

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ
عَنْ آلِهَتِي يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَ
أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ
أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩১৬-১৮

তরজমা

(৪৬) তাঁর পিতা তাঁকে বললো, "হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি তা থেকে বিরত না হও তবে আমি পাথর মেরে তোমার প্রাণ নাশ করবই, আর চিরদিনের জন্যে তুমি আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও"।

(৪৭) ইব্রাহীম বললেন, তোমার প্রতি সালাম, আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল"।

(৪৮) আমি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তাদেরকে পরিত্যাগ করছি, আমি আমার প্রতিপালকেরই বন্দেগী করবো, আশা করি আমার প্রতিপালকের বন্দেগী করে আমি বঞ্চিত থাকবো না।

(৪৯) অতঃপর ইব্রাহীম যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের পূজা করতো তাদের থেকে দূরে সরে যান, তখন আমি তাকে দান করলাম এসহাক এবং ইয়াকুবকে। আর প্রত্যেককে আমি নবী করলাম।

(৫০) আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত থেকে, আর তাদের সত্য কথাকে দান করলাম উচ্চ মর্যাদা।

(৫১) আর এই কিতাবে উল্লেখ কর মূসার কথা, তিনি ছিলেন আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বন্দা এবং তিনি ছিলেন রসূল ও নবী।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে যখন তৌহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন এবং মূর্তি পূজার ভয়াবহ পরিণামের কথা তাকে শুনিয়ে দিলেন এবং এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তাঁর পিতাকে উপদেশ দিলেন এবং বিনম্র ও বিনীত ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন, তখন তাঁর পিতা আত্ম সংশোধনের লক্ষ্যে হেদায়েতের পথ অবলম্বনকে পছন্দ করল না, বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়তে লাগলো, আর তা সে করে কুফর ও মূর্খতার কারণে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি হে আমার পিতা! বলে সম্বোধন করেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করে তখন হে আমার পুত্র! বলে সম্বোধন করার স্থলে তাঁর নাম ধরে ডাকে এবং অত্যন্ত ধমকের সুরে কথা বলে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ

"তাঁর পিতা তাঁকে বললো, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের দেব দেবী থেকে বিমুখ"?

এরপর সে অত্যন্ত ধমকের সুরে আরও বললোঃ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا

"যদি তুমি তা থেকে বিরত না হও তবে আমি পাথর মেরে তোমার প্রাণ নাশ করবই, আর চির দিনের জন্য তুমি আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কালবী (রঃ) মোকাতেল (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) لارجمنك শব্দটির তরজমা করেছেন, "আমি তোমাকে গালি দেব", "আমি তোমাকে মন্দ বলে বের করে দেব"। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বাক্যটির তরজমা করেছেন, "আমি পাথর মেরে তোমার প্রাণ নাশ করব"।

وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا

তফসীরকার কালবী (রঃ) এ আয়াতের তরজমা লিখেছেন, তুমি সুদীর্ঘ সময়ের জন্যে আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও, তথা আমার চোখের আড়ালে চলে যাও।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) ও একরামা (রঃ) مليا শব্দটির তরজমা করেছেন, সুদীর্ঘ সময়। আর সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল, চিরকাল অর্থাৎ তুমি আমাদের নিকট থেকে চিরকালের জন্যে সরে পড়।

কাতাদা ও আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল ভালোয় ভালোয় তুমি সরে পড়। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমার নিকট থেকে তুমি ভালো অবস্থায় দূরে সরে পড়, নতুবা আমার তরফ থেকে তুমি দুঃখ পাবে।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا

ইব্রাহীম বললেন, "তোমার প্রতি সালাম, আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, এই যদি হয় আপনার অভিপ্রায় তবে আমি আপনাকে জানাই সালাম, আমি চললাম, আমি আপনার জন্যে আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরফ থেকে সালাম ছিল বিদায় বাণী। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

যখন মূর্খ লোকেরা আল্লাহর নেককার বন্দাদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলে তখন তারা বলে সালাম। আর এখানে 'সালাম' কথাটি উচ্চারণের ব্যাখ্যা এই, আমার তরফ থেকে আপনাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেয়া হবেনা, আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করেন তবে আমার তরফ থেকে আপনি কোন প্রকার দুঃখ পাবেন না। আর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কোন কোন তফসীরকার سَاَسْتَغْفِرُلَكَ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এর অর্থ এই নয় যে আমি মুশরেক পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবো, বরং এর অর্থ হল, আমি

আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে শেরক ও কুফর থেকে তওবা করার ও ঈমান আনয়নের তৌফিক দান করেন। কেননা মুশরেকের জন্যে ঈমান আনার দোয়া করা যেতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন বলেছেন,

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ

(অচিরেই আমি আপনার জন্যে আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।)

তখন মুশরেকের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা নিষিদ্ধ বলে তাঁর অজানা ছিল, কিন্তু যখন তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আপনার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবো, যতক্ষণ না আমাকে এর থেকে বিরত রাখা হয়। অবশেষে এ আয়াত নাজিল হয়ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ (সূরা বারাআত)

"নবী ও মোমেনদের জন্যে উচিত নয়, মুশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা"।

এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে প্রত্যেক নবীর জন্যে বিশেষ একটি দোয়ার অনুমতি রয়েছে যা কবুল করা হয়। যদি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার ঈমানের তৌফিকের জন্যে দোয়া করতেন তবে তা অবশ্যই কবুল হতো, কিন্তু তার তকদীরে ঈমান লিপিবদ্ধ ছিলনা, তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার ঈমানের জন্যে দোয়া করেননি।

كَانَ بِىْ حَفِيًّا

"নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, আমার প্রতি রয়েছে তাঁর অশেষ দয়া"।

কালবী (রঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেন, তিনি আমার দোয়া সম্পর্কে অবগত, আর তিনি তা কবুল করেন। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হল, তিনি আমাকে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন (এমনকি তিনি আমার বদদোয়াও কবুল করেন)।

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তাদেরকেও"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিদায় বেলায় তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন, আমার উপদেশ যখন তোমাদের কোন কাজে আসছেনা, এমন অবস্থায় তোমরা যখন আত্ম-সংশোধনের পথ গ্রহণ করছো না, তখন আমিও তোমাদেরকে এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদেরকে ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করলাম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন তাঁর মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেলেন পবিত্র ভূমির দিকে। এভাবে তিনি শেরকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ

করে মুশরেকদের থেকে দূরে সরে পড়লেন।

وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّىْ شَقِيًّا

"আমি আমার প্রতিপালকেরই বন্দেগী করবো, আশা করি আমার প্রতিপালকের বন্দেগী করে আমি বঞ্চিত থাকবো না"।

অর্থাৎ আমি অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে আমার প্রতিপালকের এবাদত বন্দেগী করতে থাকবো। আর তাঁর বন্দেগী করে আমি বঞ্চিত হবোনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হবোনা। যখনই আমি তাঁকে ডাকবো তাঁর তরফ থেকে সাড়া পাব, তিনি তোমাদের উপাস্যদের ন্যায় নন, তোমরা যাদের পূজা কর তাদেরকে ডেকে জবাব পাওনা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عَسٰۤى শব্দটির অর্থ হল, আশা করি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বিনয় প্রকাশার্থেই এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। নতুবা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর বন্দেগী অবশ্যই কবুল হয় এবং দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। আর এ শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে দোয়া কবুল করা বা এবাদতের সওয়াব দান করা শুধু আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীর উপরই নির্ভর করে। আর পরিণামের কথা কেউ জানেনা।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

"এরপর ইব্রাহীম যখন তাদের থেকে এবং তাদের বাতিল উপাস্যদের থেকে দূরে সরে যান তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করি"।

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আত্মীয়-স্বজন, আপনজনকে পরিত্যাগ করে এমনকি, স্বদেশ ছেড়ে হিজরত করে চলে যান সিরিয়ায়, তখন আল্লাহ্ পাক প্রবাস জীবনে পরকে আপন করে দেন, আত্মীয়-স্বজনের স্থলে ইসহাক এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর ন্যায় পুত্র দান করলেন, যাতে করে তাঁর নয়ন ও মন তৃপ্ত হয় আর তাঁদের বংশধরদের মধ্যেও অনেকে নবী মনোনীত হয়েছেন।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয় হযরত ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর উল্লেখ হয়েছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা বলা হয়নি। কেননা, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কোন নবী হননি। অথবা এর কারণ হল হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর কারণ হল, হযরত ইসমাঈল (আঃ) অতি শৈশবেই নির্বাসিত হয়েছিলেন। এজন্যে তাঁর সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১]

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২০

"আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার রহ্মত থেকে"।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ– অর্থ সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সম্মান। আল্লাহ পাক এসবই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দান করেছিলেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের রহমত শব্দটির দ্বারা কিতাব ও নবুওয়্যত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

"এবং তাদের সত্য কথাকে উচ্চ মর্যাদা দান করি"।

অর্থাৎ পরবর্তী কালে পৃথিবীতে তাদেরকে সুনাম সুখ্যাতি এবং উচ্চ মর্যাদা দান করি।

বস্তুতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক বিশেষ রহমত দানে ধন্য করেন। পৃথিবীতে তাঁর নামকে অবিস্মরণীয় করে রাখেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের নিকটই তাঁকে আল্লাহ পাক চির শ্রদ্ধেয়, চির অনুসরণীয় করে রাখেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেনঃ

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ

এই দোয়া কবুল হওয়ার প্রকৃত প্রমাণ স্বরূপই যুগে যুগে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুনাম রয়েছে অমর অক্ষয় হয়ে। উম্মতে মোহাম্মদীয়া প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে كما صليت على ابرهيم বাক্যের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্মরণ করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুখ্যাতি কোন বিশেষ যুগ, দেশ বা জাতির মধ্যে সীমিত নয়; বরং সর্বত্র সর্বকালে তাঁর সুনাম অব্যাহত রয়েছে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا

"আর এই কিতাবে মুসার কথা উল্লেখ করুন, তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের নির্বাচিত এবং পছন্দনীয়, আর তিনি ছিলেন রসূল ও নবী"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর আলোচনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা কালিমুল্লাহ (আঃ)-এর কথা শুরু হয়েছে। এ সূরার এটি চতুর্থ ঘটনা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মহান আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরেকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর উম্মত হওয়ার দাবীদার ইহুদীদেরকে সাবধান করা হয়েছে। যদি ইহুদীরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করে তবে তাদের কর্তব্য হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا

"(হে রসূল!) এই কিতাবে মূসা (আঃ)-এর উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের মনোনীত, পছন্দনীয়, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন"।

وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا

তিনি ছিলেন নবী ও রসূল। যাঁর কাছে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহর নবী, নবীদের মধ্যে যাঁদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যাঁর নিকট কিতাব আসে, যিনি শরীয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রসূল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নবী ও রসূল ছিলেন এবং পাঁচজন বিশিষ্ট নবী ও রসূলের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁরা হলেন হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (অঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।[১]

এ আয়াত সমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

১. তিনি আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।

২. তিনি রসূল ও নবী ছিলেন।

৩. তাঁর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন।

৪. আল্লাহ্ পাক তাঁকে নৈকট্য-ধন্য করেছেন।

৫. হযরত মুসা (আঃ)-এর আরজী কবুল করে আল্লাহ্ পাক তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ)-কে নবী মনোনীত করেছেন।[২]

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ
اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَ
كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩৬
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৩

তরজমা

(৫২) আর তূর পর্বতের ডান দিক থেকে আমি তাকে আহবান করি, এবং নিগুঢ় কথা বলার জন্যে আমি তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।

(৫৩) আর আমি আমার রহমতে তার ভাই হারুনকে নবী মনোনীত করলাম।

(৫৪) আর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন কথায় সাচ্চা এবং তিনি ছিলেন রসূল ও নবী।

(৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিতেন এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট তিনি ছিলেন সন্তোষভাজন।

(৫৬) আর স্মরণ করুন এই কিতাবে উল্লেখিত ইদ্রিসের কথা, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী।

(৫৭) আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।

(৫৮) এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নেয়ামত দান করেছেন, তারা সকলেই নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আদমের বংশধরদের থেকে, তাদের কিছু ছিলেন সেই বংশ থেকে যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম। আর কতক ছিলেন ইব্রাহীম ও ইয়াকুবের বংশধর থেকে, আর সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আমি হেদায়েত দান করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ পঠিত হয় তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় পতিত হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও হযরত মূসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) মাদিয়ান থেকে মিসরের দিকে গমন করছিলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল তূর পর্বত। হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রীর জন্যে একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল। তিনি আগুনের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ঠিক তখনই আল্লাহ্ পাক তাঁকে ডাক দেন এবং প্রত্যক্ষ আলাপে মূসা (আঃ)-কে ধন্য করেন (এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে ত্বোয়াহা-য় স্থান পেয়েছে)।

وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا

"আর নিগুঢ় তত্ত্ব বলার জন্যে তাকে নিকটবর্তী করি"।

বর্ণিত আছে যে ঐ অবিস্মরণীয় মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে আল্লাহ পাকের মহান কালাম শ্রবণ করেন এবং তার অসাধারণ মাধুর্য উপলব্ধি করেন। ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উপনীত হন এবং তিনি আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করেন যে তৌরাত লিপিবদ্ধ করার গায়বী কলমের শব্দ পর্যন্ত শ্রবণ করেন।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, আবুল আলীয়া আলোচ্য বাক্যাংশটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য-ধন্য হয়েছিলেন যে, তৌরাত লিপিবদ্ধ করার সময় কলমের শব্দ পর্যন্ত তিনি শুনেছিলেন।

এবনে আবি হাতেম, সাঈদ এবনে জোবায়ের থেকেও একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম কাতাদা (রঃ) থেকেও একথা বর্ণিত আছে। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তিনি আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার তৌফিক পেয়েছেন তবে দীদার নসিব হয়নি। তখনই হযরত মূসা (আঃ) আরজী পেশ করেছিলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তোমার দীদার নসিব কর। ঐ সময় আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছিলেন, হে মুসা! যদি আমি তোমার অন্তরকে কৃতজ্ঞ এবং রসনাকে আমার স্মরণকারী বানিয়ে দেই এবং তোমাকে এমন স্ত্রী প্রদান করি যে কল্যাণকর কাজে তোমার সহায়ক হয়, তাহলে মনে করবে তোমাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, যাকে এসব জিনিস না দেয়া হয় তাকে যেন কোন কল্যাণই দেয়া হয়নি।[১]

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

"আর আমি আমার রহমতে তার ভাই হারুনকে নবী মনোনীত করলাম"।

হযরত হারুন (আঃ) বয়সে হযরত মূসা (আঃ)-এর বড় ছিলেন, কিন্তু মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে হারুন (আঃ)-কে নবী মনোনীত করার আরজী পেশ করেছিলেন, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে মনোনীত করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এজন্যেই হযরত হারুন (আঃ)-কে "হেবাতুল্লাহ" (আল্লাহর দান) বলা হতো। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবীতে নিজের ভাইয়ের জন্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বড় সুপারিশ আর কেউ করেনি।[২]

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا

" আর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন কথায় সাচ্চা এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। আরবদের আদি পিতা ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এরই বংশধর ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজনই নবী হয়েছিলেন। তিনি হলেন নবীগণের দলপতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩৬
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৪

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চারটি গুণের উল্লেখ রয়েছে।

১. তিনি ছিলেন অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

২. তিনি ছিলেন নবী ও রসূল।

৩. তাঁর পরিবারবর্গকে তিনি এবাদত-বন্দেগীর আদেশ দিতেন,

৪. আর তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের অত্যন্ত পছন্দনীয়।

অঙ্গীকার রক্ষা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য

তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই, তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এক ব্যক্তিকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন। তিনি তার নিদৃষ্ট স্থানে এক বছর কাল অপেক্ষা করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁকে জবেহ করা হলে তিনি সবর করবেন, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এ ওয়াদাও পূর্ণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার আবদুল্লাহ এবনে উবাই নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও গমন করেছিলেন। যখন তার বাড়ীর কাছে লোকটি পৌঁছল তখন সে বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করবেন, তাহলে আমি বাড়ী থেকে আসি। লোকটি চলে গেল এবং তাঁর কথা ভুলে গেল। তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষার্থে ঐ স্থানেই অপেক্ষা করেছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ লোকটির অপেক্ষা করেছিলেন।

ইমাম শা'বী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যদি কারো সঙ্গে অপেক্ষা করার ব্যাপারে ওয়াদা করা হয় তবে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? তিনি বলেন, যদি দিনে ওয়াদা করে তবে দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, আর যদি রাত্রে ওয়াদা করে তবে রাত্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর চেয়ে ইসমাঈল (আঃ) যে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ হল আলোচ্য আয়াত। কেননা, ইতিপূর্বে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সম্পর্কে শুধু নবী বলা হয়েছে। আর ইসমাঈল (আঃ)-কে নবী ও রসূল উভয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الله اصطفى من ولد ابرهيم اسمعيل

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে (আঃ) বিশেষ ভাবে মনোনীত করেছেন।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৩২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৪

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিতেন এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট তিনি ছিলেন সন্তোষভাজন"।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর পরিবারবর্গকে নামায এবং যাকাত আদায়ের আদেশ দিতেন এবং নিজের পরিবারবর্গের সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে নামাজ ও যাকাতের শব্দ দ্বারা সেই শরীয়ত উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা পালন করা তাঁর উপর ফরজ ছিল। এজন্যে শারীরিক এবাদতের মধ্যে নামাজ ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

مَرْضِيًّا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যতের জন্যে পছন্দ করেছিলেন, আর তিনিও আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর উপর রাজী ছিলেন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

আর স্মরণ করুন এই কিতাবে উল্লেখিত ইদ্রিসের কথা, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী।

হযরত ইদ্রিস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রপিতামহ ছিলেন এবং হযরত শীষ (আঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আখনুক। তিনি অধিক পরিমাণে কিতাব পাঠ করতেন, সেজন্যে তাঁকে ইদ্রিস বলা হয়। আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর প্রতি ত্রিশখানি সহীফা নাজিল করেছেন। হযরত ইদ্রিস (আঃ) সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লেখেন এবং সর্ব প্রথম কাপড় সেলাই করেন, সর্ব প্রথম সেলাই করা কাপড় পরিধান করেন। তাঁর পূর্বে লোকেরা চামড়াকে পোশাক হিসাবে ব্যবহার করতো। তিনি সর্ব প্রথম অস্ত্র তৈরী করেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী যুগেই হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে তিনি শুধু যে সর্ব প্রথম কলমের ব্যবহার করেছেন এবং কাপড় সেলাই করেছেন তাই নয়; বরং তিনিই সর্ব প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং অংক শাস্ত্র ও ওজন পরিমাপের দ্রব্য সামগ্রীর প্রচলন করেন। শবে মে'রাজে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চতুর্থ আসমানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে একথার বিবরণ রয়েছে।

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

"আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদার উন্নীত করেছি"।

এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। উচ্চস্থান তথা নবুওয়্যত এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী

বলেছেন, এর অর্থ হল জান্নাত। আর কারো কারো মতে, এর তাৎপর্য হল চতুর্থ আসমান বা ষষ্ঠ আসমান।

হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর আসমানের উত্তোলনের ঘটনা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) কা'বে আহবারের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে হযরত ইদ্রিস (আঃ) একবার সারা দিন চলেছিলেন। প্রখর রৌদ্রের কারণে তাঁর কষ্ট হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এই আরজী পেশ করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! একদিন রোদ্রে চলার কারণে আমার এত কষ্ট হয়েছে, পাঁচশত বছরের দূরত্ব যে একদিনে অতিক্রম করতে বাধ্য হবে তার কি অবস্থা হবে? হে আমার প্রতিপালক! সূর্যের তাপ কমিয়ে দাও, আর যে ফেরেশতা এই সূর্য পরিচালনা করে তার বোঝাও হালকা করে দাও। পরদিন ফেরেশতা উপলব্ধি করলেন যে সূর্যের তাপ কমে গেছে এবং বোঝাও হালকা হয়ে গেছে। তখন ঐ ফেরেশতা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলেন, সূর্যের তাপ কম হওয়ার কারণ কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমার এক বন্দা ইদ্রিস এজন্যে দোয়া করেছে, আমি তার দোয়া কবুল করেছি। ঐ ফেরেশতা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব করিয়ে দিন। আল্লাহ পাক তাঁকে এর অনুমতি দান করলেন। তখন সূর্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর নিকট নিকট আসলেন। ইদ্রিস (আঃ) তাঁকে বললেন, আমি শুনেছি তুমি অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেশতা, মালাকুল মউতের নিকটও তোমার বেশ সম্মান রয়েছে। অতএব, তুমি মালাকুল মউতের নিকট আমার সুপারিশ কর যেন সে আমার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু অবকাশ দেয় যাতে করে আমি আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী ও বন্দেগীতে অধিক পরিমাণে সময় দিতে পারি। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ পাক কারো মৃত্যুকে বিলম্ব করেন না, যাহোক আমি বিষয়টি নিয়ে মালাকুল মউতের সঙ্গে কথা বলবো। এরপর সূর্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা হযরত ইদ্রিস (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেন, আর সূর্য উদিত হওয়ার কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করতে দেন। এরপর মালাকুল মউত আজরাইল (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেন, আপনার নিকট আমার একটি কাজ আছে, বণী আদমের মধ্যে আমার একজন বন্ধু আছে, আপনি তার মৃত্যুকে কিছুটা বিলম্ব করুন। মালাকুল মউত বললেন, এ ক্ষমতা আমার নেই তবে হ্যাঁ তুমি যদি চাও তবে আমি এতটুকু করতে পারি যে মৃত্যুর পূর্বে তাকে আমি এ সম্পর্কে অবগত করতে পারি, যেন পূর্বেই সে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সূর্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বললেন, আচ্ছা। মালাকুল মউত তখন তাঁর রেজিষ্টারে ইদ্রিস (আঃ)-এর নাম দেখলেন এবং বললেনঃ তুমি এমন ব্যক্তির সম্পর্কে কথা বললে, ভবিষ্যতে যার মৃত্যু কখনও হবেনা, তখন সূর্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বললেন, তা কি করে হয়? মালাকুল মউত বললেন, আমি আমার রেজিষ্টারে দেখলাম যে ঐ ব্যক্তি সূর্য যেখানে উদিত হয় সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তাঁর মৃত্যু হয়েই গেছে, সে এখন জীবিত নেই।

ফেরেশতা বললেন, আমি তো তাঁকে সূর্য উদিত হওয়ার কাছে রেখে আপনার নিকট এসেছি। তখন মালাকুল মউত বললেন, তুমি এখন গিয়ে দেখ তাঁকে মৃত পাবে। এ ফেরেশতা নিদৃষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলেন, ইদ্রিস (আঃ)-এর মৃত্যু হয়ে গেছে। ওহাব এবনে মোনাব্বাহ (রঃ) বলেছেন, আসমানে ইদ্রিস (আঃ) জীবিত আছেন না-কি মৃত, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। একদল তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, তিনি আসমানে জীবিত অবস্থায় বর্তমান রয়েছেন। শুধু তিনিই নন; বরং চারজন নবী আজো জীবিত আছেন। খিজির (আঃ) এবং ইলিয়াস (আঃ) জমীনে এবং ইদ্রিস (আঃ) ও ঈসা (আঃ) আসমানে।

ওহাব এবনে মোনাব্বাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ প্রত্যহ একা ইদ্রিস (আঃ)-এর এত এবাদত আসমানে পৌছত, যত এবাদত সমগ্র বিশ্ববাসীর তরফ থেকে পৌছত। ফেরেশতাগণ এ কারণে অত্যন্ত বিস্মিত হন। স্বয়ং মালাকুল মউত আজরাইল (আঃ) ইদ্রিস (আঃ)-এর সাক্ষাতে আগ্রহী হন এবং আল্লাহ্ পাকের অনুমতি নিয়ে মানব রূপ ধারণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। হযরত ইদ্রিস (আঃ) সর্বদা রোযা রাখতেন, যখন ইফতারের সময় হল তখন তিনি মালাকুল মউতকেও খাবার গ্রহণের জন্যে আহবান করলেন। কিন্তু তিনি খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তিন দিনই এমন হল। তখন ইদ্রিস (আঃ)-এর নিকট মালাকুল মউতের অস্বীকৃতি অপছন্দনীয় হল। তাই তিনি তৃতীয় রাতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতে চাই, আপনি কে? মালাকুল মউত বললেন, আমি যমদূত, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি নিয়ে এসেছি। হযরত ইদ্রিস (আঃ) বললেন, আপনার কাছে আমার একটি কাজ আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ আছে? হযরত ইদ্রিস (আঃ) বললেন, আপনি আমার রূহ কবজ করে নিন। ফেরেশতা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্ পাক তাঁর মধ্যে রূহ ফেরত দিলেন। মালাকুল মউত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে রূহ কবজ করার আবেদন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য কি ছিল? ইদ্রিস (আঃ) বললেন, আমি মৃত্যুর কষ্টটা উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম, যেন মৃত্যুর জন্যে আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি (অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন আমার স্বাভাবিক মৃত্যু আসবে তা সইবার যোগ্যতা যেন আমার মধ্যে থাকে, আর মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যেন আমি অবগত থাকি)। এরপর হযরত ইদ্রিস (আঃ) মালাকুল মউতকে বললেন, আপনার কাছে আমার একটি কাজ আছে। আজরাইল বললেন, তা কি? ইদ্রীস (আঃ) বললেন, আমাকে আপনি আসমানে নিয়ে যাবেন, যাতে করে আমি সেখানকার অবস্থা দেখতে পারি এবং আমাকে আপনি জান্নাত ও দোযখের দিকেও নিয়ে যাবেন। আল্লাহ্ পাক মালাকুল মউতকে ইদ্রিস (আঃ)-এর ইচ্ছা পূর্ণ করার অনুমতি দিলেন। তাই মালাকুল মউত ইদ্রিস (আঃ)-কে দোযখের নিকট পৌছালেন। হযরত ইদ্রিস (আঃ) বললেনঃ দোযখের ব্যবস্থাপকের নিকট বলে দোযখের দুয়ারর খোলার ব্যবস্থা করুন, আমি ভেতরে গিয়ে দেখতে চাই। মালাকুল মউত তাই করলেন। হযরত ইদ্রিস (আঃ) বললেন, আপনি দোযখ তো দেখিয়ে দিয়েছেন এখন জান্নাত দেখিয়ে দিন। মালাকুল মউত তাঁকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যান এবং জান্নাতের দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে যান। ইদ্রীস (আঃ) তখন একটি বৃক্ষের ডালা আঁকড়ে ধরে বললেন, আমি আর এখান থেকে বাইরে

যাবনা। তখন ফেরেশতার মধ্যে ও ইদ্রিস (আঃ)-এর মধ্যে এ বিষয়ে কথা-বার্তা হতে লাগলো। আল্লাহ্ পাক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তখন ঐ ফেরেশতা এসে ইদ্রিস (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বাইরে কেন যাবেন না? ইদ্রিস (আঃ) জবাব দিলেন, কারণ হল আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আমিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দোযখে অবতরণ করবে, আমি দোযখে অবতরণ করেছি। আর আল্লাহ্ পাক একথাও বলেছেন, জান্নাতীগণ কখনও জান্নাত থেকে বের হবেনা। এজন্যে আমি এখন আর জান্নাত থেকে বের হবোনা। তখন আল্লাহ্ পাক মালাকুল মউতের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, আমার অনুমতি ক্রমেই সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে আর আমার আদেশ ক্রমেই সে বের হবে (তোমরা তাকে বের করার চেষ্টা করোনা) এ কারণেই হযরত ইদ্রিস (আঃ) সেখানে জীবিত রয়েছেন।

এটিই হল আলোচ্য وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা।[১]

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ

"এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা সকলেই নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন"।

এ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত যে সব পয়গম্বরের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁরা সকলেই আল্লাহর পাকের বিশেষ রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং দয়া বর্ষিত হয় সর্বক্ষণ। তাঁরা সকলেই আদম সন্তান। হযরত ইদ্রিস (আঃ) ব্যতীত সকলেই হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকায় আরোহণকারীদের বংশধর। কেউ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর, যেমন হযরত ঈসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ)। কেউ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর, যেমন হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে বিশেষ ভাবে রহমত দান করেছেন এবং নবুওয়্যত ও রেসালত দানে যাঁদেরকে তিনি ধন্য করেছেন তাঁরা সেই ভাগ্যবান লোকদেরই অন্তর্গত।

أُولٰٓئِكَ

অর্থাৎ জাকারিয়া (আঃ) থেকে ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে সমস্ত নবীগণ।

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে দ্বীন দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ দান করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩২৪-২৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৩০১-০২
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা ১০৫-০৭

مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ

অর্থাৎ আদমের বংশধরদের থেকে যেমন হযরত ইদ্রিস (আঃ)।

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

আর যাঁদেরকে আমি নূহের তরীতে আরোহন করিয়েছি তাদের বংশধরদের থেকে। বিশেষতঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধরদের থেকেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)।

وَاِسْرَائِيْلَ

আর ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের থেকে যেমন মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ)।

وَاجْتَبَيْنَا

অর্থাৎ নবুওয়্যত, রেসালত এবং হেদায়েতের জন্য আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

"যখন তাদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পঠিত হয়, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় পতিত হয়"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমতের অন্বেষণে তাঁরা সেজদায় পতিত হতেন এবং আযাবের ভয়ে ভীত হতেন। এত উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান লাভের পরও তারা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে এতটুকু গাফলত করতেন না। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁদের বিনয়ের অন্ত ছিলনা। আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণ মাত্র তাঁরা ক্রন্দন করতেন এবং সেজদায় রত হতেন। এবনে মাজা, এসহাক, এবনে রাহবীয়া এবং বাজ্জার হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং কান্নাকাটা কর, যদি কান্না না আসে অন্তত কান্নার ভাব সৃষ্টি কর।[১]

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) সূরা মরয়ম তেলাওয়াত করেন এবং এ আয়াত পাঠ করে আল্লাহ পাকের উদ্দেশে সেজদা করেন, এরপর বলেন সেজদা তো হল, কান্না কোথায়। (এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর)।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩২৬-২৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩৯

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ
أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ
ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـًٔا ﴿٦٠﴾ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ
ٱلرَّحۡمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِيًّا ﴿٦١﴾ لَّا يَسۡمَعُونَ
فِيهَا لَغۡوًا إِلَّا سَلَٰمًاۖ وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيهَا بُكۡرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾
تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

তরজমা

(৫৯) এরপর অপদার্থরা তাদের স্থলবর্তী হয়, তারা নামাজ বিনষ্ট করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়। অতএব তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি দেখতে পাবে।

(৬০) কিন্তু যে তওবা করলো, ঈমান আনলো এবং নেক আমল করলো তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম হবেনা (তাদের কোন হক্ব বিনষ্ট হবেনা)।

(৬১) তা স্থায়ী জান্নাত-যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং দয়াময় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের, নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে।

(৬২) সেখানে তারা সালাম ব্যতীত কোন অহেতুক কথা শুনবেনা, সেখানে রয়েছে তাদের জন্যে সকাল বিকাল রিয্‌কের ব্যবস্থা।

(৬৩) আমার বন্দাদের মধ্যে যারা পরহেয্‌গার তাদেরকে আমি যে বেহেশতের উত্তরাধিকারী করবো, এটি সেই বেহেশত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনের উল্লেখ ছিল যাঁরা ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বন্দা। আর এ আয়াতে তাঁদের পরবর্তী লোকদের অবস্থা ও পরিণতি বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা দ্বীনকে বর্জন করে হয়েছিল ভাগ্যাহত, আর যারা দুনিয়ার লোভে মোহে ছিল মুগ্ধ মত্ত। ফলে তাদের পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এরশাদ হয়েছেঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদের অবস্থা তো ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাদের পরবর্তীরা ছিল অত্যন্ত অযোগ্য, অপাত্র, তারা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শকে পরিত্যাগ করে এবং দুনিয়ার মায়ায় মোহে মুগ্ধ মত্ত হয়ে যায়। দ্বীনের গুরুত্বকে তারা ভুলে যায়।

أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

এমনকি তারা নামাজকেও বিনষ্ট করে।

নামাজ বিনষ্ট করার তাৎপর্য

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ বাক্যটির তরজমা করেছেন, তারা নামাজের সময় নষ্ট করে আদায় করে। সাঈদ এবনে উসাইদ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হল আছরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু না হলে তারা জোহর পড়ে না, আর আছরের নামাজ তারা মাগরিবের সময় শুরু হলে পড়ে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) নামাজ বিনষ্ট করার ব্যাখ্যায় বলেছেন, মকরূহ পন্থায় নামাজ আদায় করা এবং নামাজের আদব এবং সুন্নত বর্জন করাই নামাজ বিনষ্ট করার অর্ন্তভুক্ত। আর তাদের মুগ্ধ-মত্ত হওয়ার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ পাকের আনুগত্য পরিত্যাগ করা, কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হওয়া এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইতিপূর্বে নেককার লোকদের বিশেষতঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ ছিল, এ আয়াত থেকে মন্দ লোকদের অবস্থা এবং তাদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীরা এমন ছিল যে নামাজের গুরুত্বও তাদের অন্তরে ছিলনা। নামাজ বিনষ্ট করতেও তারা দ্বিধাবোধ করতো না, অথচ নামাজ হল দ্বীন ইসলামের খুঁটি এবং সর্বোত্তম আমল। আর তারা দুনিয়ার লোভ ও মোহে মত্ত হয়ে পড়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, আখেরাতের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে নামাজ বিনষ্ট হওয়ার যে কথা রয়েছে তার তাৎপর্য হল, নামাজকে বর্জন করা। এজন্যেই ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এবং আরো অনেকের মতে, নামাজকে যারা পরিত্যাগ করে তারা কাফের। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এরও একটি অভিমত অনুরূপই ছিল। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছেঃ বন্দার মধ্যে এবং শেরকের মধ্যে সীমান্ত হল নামাজ পরিত্যাগ করা। অন্য আর একখানি হাদীসে রয়েছে, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হল নামাজের। যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল।

অথবা নামাজ বিনষ্ট করা হল নামাজকে সঠিক সময়ে আদায় না করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোরআনে করীমে নামাজের ব্যাপারে অনেক তাগিদ রয়েছে, কোথাও নামাজের হেফাজতের আদেশ রয়েছে, কোথাও নামাজের সময়ের ব্যাপারে গাফলত না করার তাগিদ রয়েছে, কোথাও সঠিক সময়ে নামাজ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৭

পড়ার নির্দেশ রয়েছে। লোকেরা বললো, আমরা মনে করেছি যে এর অর্থ হল নামাজকে ছেড়ে দেয়া। তখন তিনি বললেন, নামাজ ছেড়ে দেয়া হল কুফর। হযরত মসরুক (রঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজতকারী গাফেলের অন্তর্ভুক্ত হয়না। নামাজ নষ্ট করার অর্থ হল তার সঠিক সময়ে আদায় না করা। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, এর অর্থ নামাজ ছেড়ে দেয়া নয়; বরং নামাজকে সঠিক সময়ে না পড়া।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এসব মন্দ লোক কেয়ামতের পূর্বে আসবে, যখন দুনিয়াতে নেককার লোক থাকবে না। তখন তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর মত লম্ফঝম্ফ দিতে থাকবে। হযরত আতা এবনে আবু রোবাহ (রঃ) বর্ণনা করেন, এরা শেষ জমানায় আসবে। হযরত মুজাহেদ (রঃ) একথাও বলেছেন, তারা আল্লাহকে ভয় করবে না এবং মানুষ থেকে লজ্জা করবে না।

এবনে আবি হাতেম সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই মন্দ লোকগুলো ষাট বছর পরই দেখা দেবে, যারা নামাজকে বিনষ্ট করবে আর আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে যাবে, আর কেয়ামতের দিন তারা তার শাস্তি ভোগ করবে। এরপর এমন অযোগ্য লোক আসবে যারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের হলক থেকে নীচে নামবে না।[১]

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"অচিরেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওয়াহাব এবনে মোনাব্বাহ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের غى শব্দটি দোযখের একটি গভীর গর্তের নাম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) লিখেছেন, জাহান্নামে এমনি একটি স্থান রয়েছে যে জাহান্নামও তার তাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। যারা সর্বদা ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকে, যারা স্থায়ী মদ্যপায়ী, যারা সুদখোরী থেকে বিরত হয় না, যে সব সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাদের জন্যে এ স্থানটি নিদৃষ্ট।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার আতা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে غى হল এমন একটি স্থান, যেখানে পানির বদলে পূজ এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। কা'ব (রঃ) বলেছেন, غى হল জাহান্নামের ভেতর অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থান। আর তাতে একটি কূপ আছে, যাকে বাহিম বলা হয়। দোযখের অগ্নি যখন নির্বাপিত হতে থাকে, তখন ঐ কূপের মুখ খুলে দেয়া হয় যার কারণে দোযখের অগ্নি পুনরায় বৃদ্ধি পায়। আল্লামা বগভী বর্ণনা করেছেন, আবু উমামা বাহিলী বলেছেন, দোযখের গভীরতা এত অধিক যে যদি উপর থেকে কোন জিনিস নিক্ষিপ্ত হয় তবে সত্তুর বছরের পথ অতিক্রম করে নীচে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৪০

পড়বে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হযরত এর নীচেও কিছু আছে? হযরত আবু উমামা বললেন, হ্যাঁ আছে, "গাঈ এবং আসাম"।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, সাঈদ এবনে মনসুর, হান্নাদ, ফরিয়ানী, হাকেম এবং বায়হাকী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন غى হল জাহান্নামের এমন একটি স্থান বা নহর যা অত্যন্ত গভীর। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে غى হল দোযখের ভেতর গরম পানির নহর যা অত্যন্ত গভীর। যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ) বলেছেন, غى জাহান্নামের একটি অত্যন্ত গভীর, দুর্গন্ধময় স্থান।

তেবরানী এবং বায়হাকী হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি দশ উকীয়া ওজনের পাথর উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সত্তুর বছরেও তার নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে না, এরপর "গাঈ এবং আসাম" পর্যন্ত যাবে। আমি আরজ করলাম গাঈ এবং আসাম কি বস্তু? তখন তিনি এরশাদ করলেন, এ হল দোযখের নিম্ন দেশের দু'টি নহর, যার মধ্যে দোযখীদের পূজ এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। আর এ দু'টি নহরের কথাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

আরও এরশাদ হয়েছে,

مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির আভিধাণিক অর্থই গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ তারা জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলবে। জান্নাতের পথ থেকে তারা দূরে সরে যাবে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে সকল মন্দ কাজকে غى বলা হয়। আর সকল কল্যাণকর কাজকে رشاء বলা হয়। এজন্যেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী غيا শব্দের অর্থ করেছেন, ধ্বংস। আর কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল আযাব। আযাব হোক বা ধ্বংস, ক্ষতি বা ব্যর্থতা সবই মন্দ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর কোন কোন আলেম বলেছেন, আয়াতের অর্থ হল দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হওয়ার শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا

"কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা"।

অর্থাৎ তাদের কোন হক্ব বিনষ্ট করা হবে না। যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় আনন্দ উল্লাসে

মত্ত হওয়া থেকে তওবা করে এবং নামাজ বর্জন থেকে তওবা করে, কুফর ও নাফরমানী থেকে তওবা করে, ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল করে তারা জান্নাতে যাবে তাদের কোন হক্ব বিনষ্ট হবেনা। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এদিকে যে তওবা এবং ঈমানের পর ইতিপূর্বে যে কুফরী ও নাফরমানী করেছে, তার জন্যে পাকড়াও করা হবেনা। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইসলাম পূর্বের সমস্ত অপরাধকে দূরীভূত করে। (মুসলিম শরীফ)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

আলোচ্য আয়াতের এ শব্দগুলো একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে উপরোল্লেখিত সতর্কবাণী কাফেরদের জন্যে। আর যে কুফর ও নাফরমানীর পর ঈমান আনে তার জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের সতর্কবাণী শুধু কাফেরদের জন্যে নয়; বরং পাপাচারী মোমেনদের জন্যেও রয়েছে এ সতর্কবাণী। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা দ্বারা জানা যায় যে ব্যাভিচারী, মদ্যপায়ী এবং অন্যান্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত লোকদের জন্যে غى নামক স্থানের শাস্তি নিদৃষ্ট রয়েছে অর্থাৎ এ শাস্তি শুধু কাফেরদের জন্যে নয়; বরং পাপাচারী মোমেনদের জন্যেও।[১]

অবশ্য যে গুনাহর পর তওবা করবে অর্থাৎ নামাজের ব্যাপারে অলসতা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জন করে যে আন্তরিক ভাবে তওবা করবে, আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন। কেননা, হাদীস শরীফে আছে গুনাহ থেকে যে ব্যক্তি তওবা করে সে যেন বে-গুনাহ হয়ে যায়। এরপর তারা যে নেক আমল করবে তার সওয়াব তারা পাবে। আর যারা ঈমানদার ও নেককার হবে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ

সেই বসবাসের বাগান, যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সঙ্গে করেছেন তাদের না দেখা অবস্থায়। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে।

অর্থাৎ যারা গুনাহ থেকে তওবা করবে তারা সেই জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে, আল্লাহ পাক যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, তা হবে চিরস্থায়ী, আর এই জান্নাত তারা দেখেও নাই; কিন্তু না দেখেও তাদের পূর্ণ একীন এবং বিশ্বাস রয়েছে সেই জান্নাতের উপর। নিশ্চয় আল্লাহ পাকের ওয়াদা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে কেননা, আল্লাহ পাকের ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয়না। আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সাথে জান্নাত প্রদানের যে ওয়াদা করেছেন তা তাদের গায়বের প্রতি ঈমান আনার এবং গায়বী খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস করার কারণে সেই ওয়াদা অবশ্যই আল্লাহ পাক পূর্ণ করবেন।

إِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَأْتِيًّا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩২৭-২৯

(নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে।)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا

"আর জান্নাতে তারা কখনও ফজুল বা অহেতুক কথা শ্রবণ করবে না যা তারা শুনবে তা হল সালাম বা শুভেচ্ছা সম্ভাষণ"।

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

"সেখানে সকাল বিকাল তাদের জীবিকা রয়েছে"।

অর্থাৎ সর্ব প্রকার রিয্‌ক তাদের জন্যে মওজুদ থাকবে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আরববাসীর নিকট সেকালে জীবনের আরাম-আয়েশ বলতে ছিল, সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট ভরে খাবার লাভ করা। আল্লাহ পাক তাই আরবদের অবস্থা মোতাবেক সকাল সন্ধ্যা খাবার সরবরাহের কথা ঘোষণা করেছেন।

জান্নাতবাসীগণকে তোহ্‌ফা প্রদান করা হবে

সাঈদ. এবনে মনসুর এবং হাকেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে পরিমাণ খাবার তারা দুনিয়াতে লাভ করতো আখেরাতেও সে পরিমাণই পাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে রাত ও দিনের পরিমাণ মোতাবেক রিয্‌ক তাদেরকে প্রদান করা হবে।

এবনুল মুনজের বর্ণনা করেছেন যে ওলীদ এবনে মুসলেম বলেছেন, জোহায়ের এবনে মোহাম্মদের নিকট এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, জান্নাতে রাত হবেনা, সেখানে সর্বদা নূর বা আলোয় ঝলমল করবে। পর্দা ছেড়ে দিলে রাতের ধারণা হবে, আর পর্দা উঠিয়ে দিলে দিনের ধারণা হবে।

হাকীম তিরমিজী আন নাওয়াদের গ্রন্থে হযরত আবু কোলাবা ও হাসান বসরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! জান্নাতে কি রাত্র হবে। তিনি এরশাদ করলেন, সেখানে শুধু নূরের চমক হবে, সকাল সন্ধ্যার আনাগোনা হবে, যে সময় মানুষ দুনিয়াতে নামাজ আদায় করতো, ঐ সময়গুলোতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিস্ময়কর তোহ্‌ফা বন্দাগণকে দান করা হবে। আর নামাজের সময়গুলোতে ফেরেশতারা এসে বেহেশতবাসীদেরকে সালাম করবে।[১]

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

"আমার বন্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী পরহেযগার তাদেরকে আমি যে বেহেশতের উত্তরাধিকারী করবো, এটি হল সেই বেহেশত"।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করবে তথা আল্লাহ পাককে ভয়

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২৯

করে তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন যাপন করবে, তারাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

(উত্তরাধিকারী করবো) نُوْرِثُ

আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি দ্বারা "জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবো" বলে যে ঘোষণা রয়েছে তার ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে ছিলেন, জান্নাতই ছিল তাঁর আদি বাসস্থান। তাই আদম সন্তানগণ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারীত্ব সাব্যস্ত হবে তাকওয়া ও পরহেযগারীর মানদন্ডে বিচার করার মাধ্যমে। যারা মোত্তাকী ও পরহেযগার, তারাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এখানে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী করার অর্থ হল, মালিকানা প্রদান করা। এমন নয় যে কেউ ইতিপূর্বে মালিক ছিল, তার মৃত্যুর পর পরবর্তীরা মালিক হবে। মালিকানা প্রদান অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে وراثت, বা উত্তরাধিকার হল সর্বাধিক মজবুত সূত্র। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার বা বাতিল করে দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথা বলেছেন, মোমেনগণ জান্নাতে এমন এমন এমারতও লাভ করবেন যা প্রকৃত পক্ষে দোযখীদের জন্যে ছিল অর্থাৎ যদি তারা কুফরী ও নাফরমানী না করতো তবে এসব এমারত উত্তরাধিকারী হিসাবে লাভ করতো। কিন্তু তাদের কুফরী ও নাফরমানীর শোচনীয় পরিণতিতে যেহেতু তারা দোযখের অধিবাসী হয়েছে, তাই তাদের জন্য নিদৃষ্ট বাড়ী-ঘরগুলো পরহেযগার মোমেনগণ লাভ করবে।

এবনে মাজা এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি গৃহ থাকবে, একটি জান্নাতের আর একটি দোযখের। যখন কেউ মৃত্যুর পর দোযখে যাবে তখন জান্নাতে সংরক্ষিত তার ঘরটি জান্নাতবাসীগণ পেয়ে যাবেন। আর কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক একথাই এরশাদ করেছেনঃ

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

অর্থাৎ তারাই হবে উত্তরাধিকারী।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস এবনে মাজায় সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের উত্তরাধিকারীকে মিরাস প্রদান থেকে পলায়ন করবে অর্থাৎ মিরাস দেবে না, আল্লাহ পাক জান্নাতে তার মিরাস কেটে দেবেন।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ
لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ
عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৪) এবং আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা, আমাদের সম্মুখে, পেছনে এবং তার মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর, আপনার প্রতিপালক কিন্তু কিছুই ভুলবার নন।

(৬৫) আসমান জমিন ও তাদের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সকলেরই প্রতিপালক তিনি, অতএব, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর বন্দেগীতেই ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন আর কাউকেও জান?

(৬৬) আর মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব?

(৬৭) মানুষ কি স্মরণ করেনা যে আমি প্রথম থেকেই তাকে সৃষ্টি করেছি এবং সে কিছুই ছিলনা।

(৬৮) অতএব, আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সমবেত করবই, এরপর তাদেরকে নতজানু অবস্থায় দোযখের পাশে উপস্থিত করবো।

(৬৯) এরপর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য তাকে টেনে বের করবোই।

(৭০) এরপর আমি ভাল করেই জানি তাদের মধ্যে কে দোযখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আম্বিয়ায়ে কেরামের বন্দেগীর বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতে

ফেরেশতাগণের বন্দেগীর উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত। ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত আসমান থেকে নীচে অবতরণ করে না এবং তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের তাবেদারীতে মশগুল থাকে। কখনও তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেনা।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কি বিষয় আমার মোলাকাত থেকে আপনাকে বিরত রাখে? (অর্থাৎ কি কারণে আপনি আমার নিকট আসেননি?) তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, একবার জিব্রাঈলকে (আঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি আরও বেশী আসতে পারেন না? অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, জিব্রাঈল (আঃ) কয়েকদিন যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হননি। তখন কাফেররা বলতে লাগলো, জিব্রাঈল তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন। একদিকে জিব্রাঈল (আঃ) আসেন না, অন্যদিকে কাফেরদের কষ্টদায়ক কথার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) যখন আসেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ কয়েক দিন না আসার কারণ কি? আর অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেছেন, বর্তমানের চেয়ে অধিক মাত্রায় আপনি কেন আসেন না? এর জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে নাজিল করে জিব্রাঈলকে (আঃ) বলতে বলেছেন,

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ

অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত আমরা অবতরণ করতে পারিনা।[২]

এবনে আবি হাতেম একরামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার জিব্রাঈলের (আঃ) আসতে চল্লিশ দিন বিলম্ব হয়েছিল। এবনে মরদবিয়া হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ পাকের নিকট পৃথিবীর কোন্ স্থানটি সবচেয়ে প্রিয় আর কোন্ স্থানটি সবচেয়ে ঘৃণ্য? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি জানিনা, আমি জিব্রাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু জিব্রাঈলের (আঃ) আগমনে অনেক দিন বিলম্ব হল। যখন জিব্রাঈল (আঃ) আসলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আপনি এবার অনেক দিন পর আসলেন। আমার ধারণা হতে লাগলো, হয়তো আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারই জবাবে জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১০
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৪২

"আর আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা"।

আবু নাঈম দালায়েলে এবং এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোরায়েশ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন এবং রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আর এর জবাব তখন তাঁর জানা ছিল না। এজন্যে তিনি দ্বিতীয় দিন এর জবাব দেয়ার ওয়াদা করলেন। তাঁর একীন ছিল যে জবাব ওহী দ্বারা জানা যাবে। কিন্তু জিব্রাঈল (আঃ) পনেরো দিন পর্যন্ত আসলেন না, কোন ওহীও নাজিল হলোনা। পনেরো দিন পর যখন জিব্রাঈল (আঃ) আসলেন তখন তাঁকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা হল।

আল্লামা বগভী (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), একরামা (রঃ), মোকাতেল (রঃ) ও কালবী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আগামী কাল বলবো। তিনি এ সময় ইনশাআল্লাহ বলেননি। এর পরিণতি এই হয়েছে যে জিব্রাঈল (আঃ) অনেকদিন পর্যন্ত আসেননি। যখন জিব্রাঈলের (আঃ) না আসার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি অনেক বিলম্ব করেছেন, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পরিবর্তন হতে লাগলো, আর আমি অধীর আগ্রহে আপনার অপেক্ষা করছিলাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, আমিও আপনার সাথে মোলাকাতের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম। কিন্তু আমি হুকুমের গোলাম, যখন আমাকে প্রেরণ করা হয় শুধু তখনই আমি হাযির হই, যখন আমাকে বিরত রাখা হয় তখন আমি বিরত থাকি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আমাদের সম্মুখে পেছনে এবং তার মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর, আপনার প্রতিপালক কিন্তু কিছুই ভুলবার নন"।

مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا

আমাদের অগ্র প্রশ্চাত।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর অর্থ হল, আসমান জমীন। জমিনে অবতরণ কালে আসমান পেছনে থাকে এবং পৃথিবী থাকে সম্মুখে। এমনিভাবে প্রত্যাবর্তন কালে পৃথিবী থাকে পেছনে, আর আসমান থাকে সম্মুখে। অর্থাৎ আসমান জমীনের সম্পূর্ণ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। আর অগ্র-পশ্চাত সময়ের দিক থেকেও হতে পারে, অর্থাৎ অতীত পেছনে এবং ভবিষ্যত সম্মুখে। আর বর্তমানকে মাঝখানে বলা যেতে পারে।

مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا

এর দ্বারা বর্তমান সময় থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সময় হতে পারে। আর مَا خَلْفَنَا হল অতীতের ঘটনাবলী অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"আর আপনার প্রতিপালক আপনাকে ভুলবার নন"।

একথার তাৎপর্য হল, আল্লাহ পাক আপনাকে ভুলে যাবেন বা ছেড়ে দেবেন, আর কখনও ওহী প্রেরণ করবেন না, আর কখনও আমি আপনার নিকট হাযির হবনা, আদৌ এমন কিছু নয়। তবে ওহী প্রেরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত।[১]

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ

"আসমান জমীন এবং তাদের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সবারই প্রতিপালক তিনি, অতএব শুধু তাঁরই বন্দেগী করো আর তাঁর বন্দেগীতেই সুদৃঢ় থাক"।

হে নবী! যখন একথা জানা গেলো যে আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দান আর তিনিই নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, তিনিই সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, তিনি আপনাকে ভুলে যাবেন একথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। অতএব আপনি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন। একাগ্রচিত্তে তাঁর বন্দেগী করুন। কাফেররা কি বললো না বললো তাতে আপনার কিছু যায় আসেনা। যেহেতু স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট তাই কাফেরদের কথায় আপনি চিন্তিত হবেন না। অথবা এর অর্থ হলো কাফেরদের তরফ থেকে আপনার প্রতি যে নির্যাতন-উৎপীড়ন হচ্ছে তার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যাতে করে আপনি আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে সুদৃঢ় থাকতে পারেন।

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا

তাঁর নামের আর কাউকে কি তুমি জানো? অর্থাৎ আল্লাহ পাকের গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা, সারা পৃথিবীতে তাঁর নামের আর কাউকেও কি তুমি জানো?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ বাক্যাংশের অর্থ হল, তাঁর ন্যায় এবাদতের যোগ্য আর কাউকে কি তোমরা জানো?

কালবী (রঃ) এ বাক্যাংশের অর্থ বলেছেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কাউকে কি পাও? যাঁর নাম আল্লাহ। পৌত্তলিকরা মূর্তিকে উপাস্য মনে করতো কিন্তু আল্লাহ বলতোনা। এর কারণে হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদ হলো প্রকাশ্য এবং সুপ্রমাণিত। তাঁর ন্যায় কেউ নেই, আর উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাও কারো নেই, অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো শুধু আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা আর এ পর্যায়ে যত কষ্ট হয় তা সহ্য করা।

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا

"অথচ যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তারা বলে যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন কি পুনরায় আমাকে জীবিত করে বের করা হবে"?

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩২

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে আলোচ্য আয়াতে 'আল ইনসান' শব্দটি দ্বারা উবাই এবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর কারো কারো মতে আবু জেহেল। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়ছে। কেননা তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো। বর্ণিত আছে যে আবু জেহেল কিংবা উবাই এবনে খালফ একটি বড় হাড় খন্ড হাতে নিয়েছিল এবং তাকে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলেছিল। এরপর সে বলেছিল, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ধারণা হলো আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে, অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে আমাদের পুনরুত্থান হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো, তারা বলতো আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তখন পুনর্জীবন লাভ করা কি করে সম্ভব হবে? তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

অর্থাৎ মানুষ যখন কেয়ামতকে অস্বীকার করে, মানুষ যখন তার পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে তখন কি সে তার অতীতকে ভুলে যায়? সে কি জানেনা যে একদিন তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

(সূরা দাহর)

"কাল প্রবাহে মানুষের উপর এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা"।

أَنَّا خَلَقْنَٰهُ

"নিশ্চয় আমিই ইতিপূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি, তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই মানুষকে তাঁর বিশেষ কুদরতে শূন্যলোক থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। যার কোন অস্তিত্ব ছিলনা, তাকে অস্তিত্ব দান করা যদি কঠিন না হয়, তবে কোন মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান কেন কঠিন হবে? যিনি প্রথম বার তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবন দান করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

প্রথম বার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনর্জীবন দান করা স্বাভাবিকভাবেই সহজ হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথচ তার জন্যে একাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এ কাজ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, আদম সন্তানেরা বলে, যেভাবে আল্লাহ পাক আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, পরে পুনরুত্থান করবেন না। অথচ

পুনরুত্থানের চাইতে প্রথম সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন হয়। আর আমাকে বণী আদমের কষ্ট দেয়া হলো এই যে সে বলে, আমার সন্তান-সন্ততি আছে অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়, আমার কোন দৃষ্টান্ত নেই, আমার পিতা-মাতা নেই, আমার কোন সন্তান-সন্ততিও নেই। আমি আমার নিজের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং যে শয়তানদের তারা পূজা অর্চনা করতো, আমি তাদেরকে একত্রিত করবো। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে হাযির করবো, যেখানে তাদের নিক্ষেপ করা হবে।[১]

আর একথাই এরশাদ হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

"অতএব, আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সমবেত করবই, এরপর তাদেরকে নতজানু অবস্থায় দোযখের পার্শ্বে উপস্থিত করবো"।

আল্লাহর অবাধ্য, নাফরমান, কাফের, মুশরেকরা যে সব শয়তানের প্ররোচনায় দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করতো, আল্লাহ পাক তাদেরকে সেই শয়তানের সঙ্গে কেয়ামতের কঠিন দিনে একত্রিত করবেন। তখন তারা এত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেনা; বরং নতজানু অবস্থায় থাকবে। এর দ্বারা তাদের দুরবস্থার বিবরণই দেয়া হয়েছে।

جِثِيًّا

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির অর্থ বলেছেন, 'দলে দলে'। অর্থাৎ কাফেরদেরকে এবং শয়তানদেরকে দলে দলে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।

হাসান বসরী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল হাঁটুর উপর পতিত অবস্থায় তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রত্যেক কাফেরকে একটি শয়তানের সঙ্গে জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ ভাগ্যবান হোক বা ভাগ্যাহত তথা মোমেন হোক কিংবা কাফের, সকলকে আল্লাহ পাক দোযখের পার্শ্বে একত্রিত করবেন। নেককারদেরকে এ দৃশ্য দেখিয়ে সন্তুষ্ট করবেন যে তোমাদেরকে দোযখের এই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করেছি। আর দোযখীদের আক্ষেপ বৃদ্ধি করার জন্যে যে ঈমানদার ও নেককারগণ জান্নাতে চলে গেছেন এবং তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

আবদুল্লাহ এবনে আহমদ এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে নাবেতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে দৃশ্য যেন আমার সম্মুখেই রয়েছে যে তোমরা দোযখ থেকে দূরে আল-করম নামক স্থানে হাঁটুর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৪৪

উপর বসে আছ। শেখ এবনে হাজার আসকালানী বলেছেন যে আল-করম হল সেই উঁচু স্থান যেখানে কেয়ামতের দিন উম্মতে মোহাম্মদিয়া অবস্থান নেবে। আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, সুদীর্ঘ সময় হিসাবের পূর্বে প্রত্যেককে অপেক্ষমান থাকতে হবে।[১]

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا

"এরপর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে যে দয়াময়ের সর্বাধিক অবাধ্য তাকে টেনে বের করবোই"।

অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যারা অধিকতর দুষ্ট প্রকৃতির এবং গুরুতর শাস্তির যোগ্য তাদেরকে সাধারণ কাফেরদের থেকে পৃথক করা হবে এবং সর্ব প্রথম তাদেরকেই দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। যারা নাফরমানীতে সীমা লংঘনকারী, যারা চরম অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাদেরকে সর্বপ্রথম দোযখে নিক্ষেপ করার জন্যে পৃথক করা হবে।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا

"এরপর আমি ভাল করেই জানি তাদের মধ্যে কে দোযখে প্রবেশের অধিকর যোগ্য"।

কুফর, শেরক এবং নাফরমানীতে যারা দুনিয়াতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং সাধারণ কাফেররা তাদের অনুসারী হয়ে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তাদেরকেই সর্বপ্রথম দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। প্রত্যেক দল থেকে এমন জঘন্য লোকদেরকে বাছাই করা হবে। আর আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত যে কে সবচেয়ে বড় অপরাধী, আর কার শাস্তি গুরুতর হওয়া উচিৎ।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ

আলোচ্য আয়াতাংশের আরেকটি ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ দোযখীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ

(প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে) আয়াতাংশ দ্বারা যদি কাফের, গুনাহগার এবং মুসলমান সকলকেই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তবে أشد (সর্বাধিক) শব্দটি দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যাবে যে আল্লাহ পাক গুনাহগার মুসলমানদেরকে সর্বাধিক মাফ করে দেবেন। কিন্তু বগভী (রঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণ كل شيعة (প্রত্যেক সম্প্রদায়) দ্বারা শুধু মাত্র কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে বাক্যের বর্ণনা ভঙ্গি এরূপ অর্থই দাবী করেছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়াবে যে, আমি কাফেরদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে তাদের কুফরীর স্তর অনুযায়ী বাছাই করবো এবং অপরাধ অনুযায়ী একের পর এক দোযখে নিক্ষেপ করবো। যে অধিক বিদ্রোহী (কাফের)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৫

হবে তাকে সর্ব প্রথম, এরপর তার চেয়ে কম বিদ্রোহীকে, এরপর তার চেয়ে কম বিদ্রোহীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

অথবা এর অর্থ হলো প্রত্যেক কাফেরকে দোযখের সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে যা তার জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে।

وَاِنْ
مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ
اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ
خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ
اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا
السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৭১) আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে। এটি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ, যা অবশ্যই কার্যকর হবে।

(৭২) এরপর আমি মুত্তাকীদেরকে রেহাই দেব এবং পাপাচারীদেরকে উপুড় করে দোযখে ছেড়ে দেবো।

(৭৩) আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, দু'দলের মধ্যে কার বাড়ী-ঘর ভালো? আর কার মজলিস উত্তম?

(৭৪) আর তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ছিল তাদের চেয়ে উত্তম।

(৭৫) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে থাকে দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন যতক্ষণ না তারা আযাব অথবা কেয়ামত দেখতে পাবে যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট, কার বাড়ী-ঘর মন্দ আর কে দলবলে দুর্বল।

তফসীরুল কোরআন

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

(এরপর আমি তাদেরকে অবশ্যই দোযখের পাশে হাযির করব।) তাই এরপর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ

"আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে"।

প্রত্যেককে পুলসিরাত পার হতে হবে

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! বদকার-নেককার নির্বিশেষে সকলকেই দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এর কারণ এই যে, দোযখের ওপর দিয়েই রয়েছে বেহেশতের পথ, আর এ পথেরই নাম পুলসিরাত। যারা ঈমানদার এবং পরহেযগার হবে তারা নিজ নিজ মর্যাদা মোতাবেক নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। কিন্তু যারা পাপীষ্ঠ তারা পুলসিরাতের উপর থেকে দোযখে নিপতিত হবে। এরপর প্রত্যেকের আমল অনুসারে শাস্তি ভোগ করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুপারিশে দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত লাভ করবে, অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়ায়ও কিছু লোক নাজাত পাবে। আর শুধু কাফেররাই চিরদিনের জন্যে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, তখন দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মসনদে আহমদে এ পর্যায়ে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আবু সুমাইয়া বর্ণনা করেন যে আলোচ্য আয়াতে দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করার যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে এর ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, মোমেনগণ তাতে প্রবেশ করবে না। আর কেউ কেউ বলেছেন প্রবেশ করবে, তবে তাকওয়া পরহেযগারীর কারণে নাজাত পেয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, হ্যাঁ প্রত্যেককেই দোযখে প্রবেশ করতে হবে, নেককার এবং বদকার। কিন্তু মোমেনদের জন্যে দোযখের অগ্নিকে সুশীতল করা হবে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে করা হয়েছিল। এরপর মুত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে নাজাত দেয়া হবে।

খালেদ এবনে মে'দান (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌঁছে যাবেন তখন বলবেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে প্রত্যেককে দোযখে প্রবেশ করতে হবে কিন্তু আমাদের তা করতে হয়নি। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এরশাদ হবেঃ তোমরা তো দোযখ অতিক্রম করেই এসেছ, কিন্তু আল্লাহ পাক সে মুহূর্তে দোযখের আগুনকে ঠান্ডা করে রেখেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় ক্রন্দন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন ক্রন্দন করছো? তিনি বললেন, আপনাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে। তখন তিনি আলোচ্য আয়াত وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا তেলাওয়াত করে বললেন, আমি এ আয়াতের কারণে কাঁদছি। কেননা আমি জানিনা দোযখে প্রবেশের পর আমি নাজাত পাব কি-না, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

হযরত আবু মায়সারা (রঃ) যখন রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্যে বিছানায় যেতেন তখন কাঁদতে থাকতেন এবং এমন অবস্থায় কখনও বলতেন, হায়! যদি আমার জন্মই না হতো! একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ কান্নাকাটার কারণ কি? তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ আয়াতের কারণে। একজন বুযুর্গ তাঁর ভাইকে বলেছিলেন, একথা জানা আছে কি যে দোযখ অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, একথা জানা আছে কি যে দোযখ পার হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, না, একথা জানা নেই। তখন বুযুর্গ বললেন, তাহলে এই হাসি তামাশার কি যুক্তি আছে? এরপর ঐ ব্যক্তির মুখে তার মৃত্যু পর্যন্ত কখনও হাসি দেখা যায়নি।

নাফে এবনে আযরাক নামক এক ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতের واردها শব্দের অর্থ দোযখে প্রবেশ করতে হবে একথা মানতো না। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মর্মে দলিল স্বরূপ অন্য একখানি আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

"নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর সবাই দোযখের ইন্ধন হবে, তোমরা তাতে প্রবেশ করবে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে ভাল-মন্দ সকলকেই দোযখ অতিক্রম করতে হবে।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সকলকেই দোযখে প্রবেশ করতে হবে তবে প্রত্যেকেই তার নিজের আমল মোতাবেক অতিক্রম করবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। সকলকেই এ অগ্নির মুখোমুখি হতে হবে। তবে কেউ কেউ বিদ্যুত গতিতে অতিক্রম করে যাবে, আবার কেউ ঝড়ের বেগে, কেউ উড়ন্ত পাখীর ন্যায়, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ দ্রতগামী উটের ন্যায়, কেউ পায়ে হাঁটা দ্রুতগামী মানুষের ন্যায় অতিক্রম করবে। এমনকি, সবশেষে যে মুসলমান পার হবে তার কেবলমাত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে (ঈমানের) নূর থাকবে, সে কোন রকমে উঠি-পড়ি করে পুলসেরাত পার হবে। পুলসেরাত পিছলে পড়ার মত একটি বস্তু। তার উপর বাবলা এবং খরের কাঁটার মত কাঁটা আছে। দু'দিকে ফেরেশতাদের সারি থাকবে। তাদের হাতে আঁকড়া থাকবে তা দিয়ে তারা মানুষকে ধরে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তলোয়ারের ধারের চেয়ে

অধিক তীক্ষ্ণ হবে এ পুলসেরাত। প্রথম দল বিদ্যুতের বেগে তখনই পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল ঝড়ের বেগে পার হবে। তৃতীয় দল দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়। চতুর্থ দল দ্রুতগামী জন্তুর ন্যায়। ফেরেশতাগণ তখন সব দিক থেকে দোয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ! হেফাজত কর, হে আল্লাহ! রক্ষা কর।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, দোযখ তার পিঠের উপর সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবে। যখন ভাল ও মন্দ সকলে সমবেত হবে তখন আল্লাহ পাকের আদেশ হবে, যারা তোমার অংশের তাদেরকে রেখে দাও, আর জান্নাতীদেরকে ছেড়ে দাও। এরপর দোযখ সমস্ত মন্দ লোককে তার লোকমা হিসাবে গ্রহণ করবে। সে পৃথিবীর মন্দ লোকদেরকে এভাবে চেনে যেমন তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে চেন; বরং তার চেয়েও অধিক। শ্রবণ কর দোযখের দারোগাদের দেহের দৈর্ঘ একশ' বছরের পথের দূরত্বের সমান। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি গুর্জ রয়েছে তা দ্বারা একবার আঘাত করলে সাত লক্ষ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মসনদে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার প্রতিপালকের দরবার থেকে আমি এই আশা করি যে বদর এবং হুদায়বিয়ার জেহাদে যে ঈমানদারগণ শরীক হয়েছে তাদের একজনও দোযখে যাবে না। একথা শ্রবণ করে হযরত হাফছা (রাঃ) বলেন, তা কি করে সম্ভব? কেননা আল্লাহ পাক কোরআন করীমে এরশাদ করেছেনঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

(তোমাদের সকলকেই তার উপর পৌঁছতে হবে।)

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী আয়াত

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

(এরপর আমি মুত্তাকী লোকদেরকে নাজাত দেব এবং জালেমদেরকে উপুড় করে দোযখে ছেড়ে দেব) তেলাওয়াত করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আরও একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছেঃ যার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবে না, তবে শুধু শপথ পূর্ণ করার জন্যে। এই হাদীস দ্বারা আলোচ্য আয়াতই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, একজন সাহাবীর জ্বর হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্যে তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের এরশাদ হলো, এই জ্বর একটি অগ্নি। আমি আমার বন্দাদেরকে এ জন্যে জ্বরগ্রস্ত করি যেন দোযখের আগুনের বদলা হয়ে যায়। হযরত মুজাহেদ (রঃ) একথা বলে আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি দশবার সূরা এখলাছ পাঠ করবে তার জন্যে জান্নাতে একটি মহল তৈরী হয়। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, তাহলে তো আমরা এভাবে জান্নাতে অনেকগুলো মহল বানাতে পারি। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সব চেয়ে উত্তম এবং সব চেয়ে বেশী দিতে সক্ষম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় থেকে এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাকে আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন, শোহাদা এবং ছালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আবার যে ব্যক্তি কোন বিনিময়ের উদ্দেশে নয়, বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে মুসলমান সেনাবাহিনীর পেছন দিক থেকে তাদেরকে পাহারা দিয়ে হেফাজত করে সে দোযখের আগুন চোখেও দেখবে না; তবে শুধুমাত্র শপথ পূর্ণ করার জন্যে। কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই তার উপর পৌঁছতে হবে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের সকল মানুষকে সম্বোধন করেছেন। তাতে মোমেন-কাফের ভাল-মন্দ, নেককার-গুনাহগার সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের وارد শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

(এক) ورود অর্থ عبور এবং مرور অর্থাৎ অতিক্রম করা, আর এ শব্দটি দ্বারা পুলসেরাত অতিক্রমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আলোচ্য শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্মকথা হবে মোমেন কাফের সকলকে পুলসেরাত পার হয়ে যেতে হবে।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের বা জালেম, তারা পুলসেরাত থেকে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। পুলসেরাত পার হবার গতি নির্ধারিত হবে নেক আমলের ভিত্তিতে। যার নেক আমল যত বেশী হবে, সে তত দ্রুত পুলসেরাত পার হয়ে যাবে। আর এটিই আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে প্রত্যেককে অবশ্যই পুলসেরাত পার হতে হবে।

(দুই) ورود শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা। এমন অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, আলোচ্য আয়াত কাফেরদের উদ্দেশে নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ কাফের মাত্রকে অবশ্যই দোযখে প্রবেশ করতে হবে। নেককারগণ দোযখে প্রবেশ করবেন না, যারা এ মত পোষণ করেন, তারা দলিল হিসেবে এ আয়াত পেশ করেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

"নিশ্চয় যাদের জন্যে পূর্বাহ্নে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৪৬

অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল বলেন যে, আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা শুধু কাফেরদের উদ্দেশে নয়; বরং সকল মানুষের উদ্দেশেই। আর মানুষ মাত্রকেই দোযখে প্রবেশ করতে হবে, তবে মোমেনদের জন্যে আল্লাহ্ পাক দোযখের অগ্নিকে শীতল করে দেবেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নিকে সুশীতল করে দিয়েছিলেন। কারণ অগ্নি দ্বারা পুড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। যে ফেরেশতাগণ দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত, দোজখের অগ্নি দ্বারা তারা দগ্ধ হয়না।

হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি মোজেযা ছিল এই, একই পাত্রের পানি যখন ফেরাউনের লোকদের হাতে থাকত, তখন তা রক্তে পরিণত হতো। পক্ষান্তরে, যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের হাতে ঐ পাত্রটি আসত, তখন তার পানি সুস্বাদু শরবতে পরিণত হতো। ঠিক এভাবে দোযখের অগ্নি মোমেনদের জন্যে ক্ষতিকর হবে না, কিন্তু কাফেরদের জন্যে হবে বিপজ্জনক। একবার মদীনা মোনাওয়্যারায় খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে একটি বাড়ীতে আগুন ধরে যায়, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে এ দুর্ঘটনার খবর দেয়া হলে তিনি অগ্নির নামে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির ভাষা ছিল এমনঃ

اسكنى يا نار باذن الله

"হে অগ্নি! আল্লাহর হুকুমে থেমে যাও"।

হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ দাতার হাতে এ চিঠিটি দিয়ে বললেন, আমার এই চিঠিটি অগ্নির উপর নিক্ষেপ কর। ফলে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নির্বাপিত হলো। এতেও একথাই প্রমাণিত হয় যে, অগ্নি দ্বারা পুড়ে যাওয়া আল্লাহ্ পাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই মোমেনগণ দোযখে প্রবেশ করলেও তারা থাকবেন নিরাপদ।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি কথা বলেছেন। হতে পারে দোযখের বিস্তৃত এলাকায় এমন কোন স্থান রয়েছে, যেখানে অগ্নি নেই। মোমেনগণকে সেখানেই রাখা হবে। আর কাফেরদেরকে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নির মধ্যে।[১]

একটি প্রশ্ন ও জবাব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, মোমেনদেরকে দোযখে প্রবেশ করার পরও নিরাপদে রাখা হবে, দোযখের অগ্নিকে তাদের জন্যে সুশীতল করা হবে। তাহলে দোযখে প্রবেশ করানোর তাৎপর্য কি?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়েছেন।

(এক) ঈমানদারদের আনন্দ বৃদ্ধি করা এ মর্মে যে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এমন ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন এবং এজন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া। আর দোযখের কঠিন আযাব প্রত্যক্ষ করার পরই আল্লাহ্ পাকের এই বিরাট

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১৬
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা ২৪২-৪৩

নেয়ামতের শোকর গুজারীর ভাব বৃদ্ধি পাবে।

(দুই) কাফেরদের আক্ষেপ এবং দুঃখ বৃদ্ধি করা এ মর্মে যে, যাদেরকে আমরা দুনিয়াতে দরিদ্র এবং অপমানিত মনে করতাম, তারা আজ পরমানন্দে রয়েছে, আর আমরা বিপদগ্রস্ত রয়েছি।

(তিন) এর দ্বারা মুসলমানদেরকে ইসলামের দুশমনদের অবমাননা এবং শাস্তি দেখানো সম্ভব হবে।

(চার) কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, শেষ বিচারের কথা তারা মিথ্যাজ্ঞান করত, তা এক মহা সত্য।

(পাঁচ) মুসলমানগণ দোযখকে দেখে জান্নাতের নেয়ামতের কদর করবে এবং জান্নাতের স্বাদ অধিকতর উপলব্ধি করবে। কেননা, অন্ধকার দেখেই আলোর মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়।[১]

দোযখে প্রবেশ সম্পর্কে আরও কিছু কথা

এবনে জরীর গনীম এবনে কায়সের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে লোকেরা দোযখে প্রবেশ করার ব্যাপারে আলোচনা করলে হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অগ্নি সকল লোককে আটকে রাখবে। ভাল-মন্দ সকলেই তাতে থাকবে। এরপর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, 'তোমার আপন সাথীদেরকে রেখে দাও এবং আমার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দাও'। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যারা দোযখের সাথী হবে তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। যেভাবে মানুষ তার সন্তানকে চেনে, ঠিক তেমনি দোযখ তার সাথীদেরকে চিনবে। আর মোমেনগণ এভাবে বের হয়ে যাবে যে তাদের পোশাকও শুস্ক হবে না।

আল্লাম সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কোন কোন আলেম আলোচ্য আয়াতের ورود শব্দের অর্থ 'প্রবেশ করা' বলেছেন। ইমাম কুরতবী (রঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আর দলিল হিসেবে হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো কারো মতে, আলোচ্য আয়াতের ورود শব্দটির অর্থ হলো অতিক্রম করা। ইমাম নববী (রঃ) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে এতে পুলসেরাত অতিক্রম করার কথা বোঝানো হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন যে পুলসেরাত অতিক্রম করাই হলো দোযখে প্রবেশ করা। আর প্রবেশ করার অর্থ এই নয় যে সে অগ্নিতে প্রবেশ করবে; বরং দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করাই প্রবেশ করার নামান্তর; সে যেভাবেই হোক।

যদি এ সন্দেহ করা হয় যে বায়হাকী হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫১৭
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৪৪
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৪১

দিয়েছেন যে ورود শব্দের অর্থ হলো প্রবেশ করা ব্যতীত দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা। আমি বলবো, হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার অর্থ হলো ভেতরে প্রবেশ করা।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, ছলফে ছালেহীন দোযখে প্রবেশ করার ব্যাপারে ভয় করতেন। কেননা দোযখে প্রবেশ করার বিষয়টি নিশ্চিত। কিন্তু বের হয়ে আসা নিশ্চিত নয়। এ কারণে বুযুর্গানে দ্বীন এ বিষয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন।

কাফেরদের একটি ভুল ধারণার জবাব

পূর্ববর্তী আয়াতে পরকালকে অস্বীকারকারীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, আমি ঐ সকল কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। এ জালেমরা যখন ঐ সকল আয়াত শুনতো যার মধ্যে তাদের লাঞ্ছনাপূর্ণ আযাবের আলোচনা থাকতো তখন তারা বিদ্রুপ করতো এবং গর্বের সাথে দরিদ্র মুসলমানদেরকে বলতো যে যদি সত্যিই পরকাল এসেও যায়, তবু আমরা সেখানে তোমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকবো, যেরূপ দুনিয়াতে আমরা ধন-দৌলত, মান-সম্মান ইত্যাদির দিক থেকে তোমাদের চেয়ে উত্তম রয়েছি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের ভুল ধারণার জবাবে এরশাদ করেছেন, এ জালেমদের অবস্থা হলোঃ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য আয়াত পাঠ করা হয় এবং পরকাল সংঘটিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তার জবাব দিতে তারা অক্ষম হয়ে মূর্খের মত ঈমানদারদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই বল দেখি তোমরা এবং আমরা এই দুই দলের মধ্যে কোন্ দলটি সম্মানের দিক থেকে অধিক ভাল এবং শক্তির দিক থেকে উত্তম? পরকাল অস্বীকারকারী কাফেররা যখন পরকাল সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ খন্ডন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন প্রশ্ন করে যে বল দেখি দুনিয়াতে কারা অধিক সম্মানিত এবং কাদের পরিবেশ এবং সমাজ উত্তম? পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

(আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, দু'দলের মধ্যে কার বাড়ী-ঘর ভাল, আর কার মজলিস উত্তম?)

অতএব, যেভাবে এ পৃথিবীতে আমরা সম্পদ এবং সম্মানের অধিকারী এবং তোমরা দারিদ্র এবং অপমানের শিকার, ঠিক তেমনি আখেরাতেও আমরাই হবো সম্মানিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন; আর আখেরাতে তোমরা হবে অপমানিত। যদি তোমরা সত্যের উপর থাকতে আর আমরা বাতিল পন্থী হতাম তবে তোমাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল হতো।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হয়, অথবা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লামের বর্ণনার মাধ্যমে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় যে, কাফেরদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, এমন অবস্থায় কাফেররা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো এবং মুসলমানদেরকে বলত, তোমাদের একথার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমান অবস্থার আলোকেই ভবিষ্যত সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। যদি আমাদের ভবিষ্যত ভয়াবহ হতো, যদি আমরা অন্যায়কারী অপরাধী হতাম, তবে কি আজ আমরা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং এত ধন-সম্পদ, এত ক্ষমতা লাভ করতাম। তোমরাই দেখ, তোমাদের চেয়ে আমাদের বাড়ী-ঘর, আমাদের জীবন-জীবিকা-পরিবেশ উন্নত এবং উত্তম কি-না। আর এ অবস্থাই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আমরা ভুল পথে নেই, আমাদের ভবিষ্যতও অন্ধকার নয়, দুনিয়ার ন্যায় পরকালেও আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় থাকব।

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ ছিলেন চরম দুর্যোগের সম্মুখীন। পক্ষান্তরে, কাফেররা ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত। তাই তারা এসব কথা বলেছে। কাফেরদের এসব আস্ফালনের জবাব পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا

"কত জাতিকেই তো আমি ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি, যাদের ধন-সম্পদ ঐশ্বর্য তোমাদের চেয়ে অধিক এবং উত্তম ছিল"।

আলোচ্য আয়াতের اثاثا শব্দটির অর্থ আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন ধন-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম। তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) লিখেছেন পোশাক-পরিচ্ছেদ। আর আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে এ শব্দটির তরজমা লেখা হয়েছে গৃহ-সামগ্রী। বস্তুতঃ কাফেররা তাদের সাজ-সরঞ্জাম, অর্থ-সম্পদ, গৃহ-সামগ্রী প্রভৃতি নিয়ে গর্ব করতো। তাদের বাড়ী-ঘর, জীবন যাত্রা উন্নত ছিল বলে তারা অহংকারী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হয়েছিল। আর এজন্যে মুসলমানদেরকে তারা ঠাট্টা বিদ্রোপ করতো। তাই আলোচ্য আয়াতে (وَكَمْ اَهْلَكْنَا) আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ ইতিপূর্বে তোমাদের চেয়েও অধিকতর নেয়ামতের অধিকারী কত জাতিকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া আল্লাহ পাকের প্রিয় হওয়ার দলিল নয়। যারা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করার পরও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক অবেশেষে ধ্বংস করেছেন যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় প্রভৃতি। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত না হও, তবে তোমাদেরকেও অনুরূপ শোচনীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। এরপর আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে থাকে দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন, যতক্ষণ না তারা আযাব অথবা কেয়ামত দেখতে পাবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে"।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে সর্ব প্রকারে সতর্ক করা সত্বেও যারা পথভ্রষ্ট থাকতে চায় (হে রসূল!) তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত থাকতে দিন, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِيْنٌ

"আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত"। এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক কারো উপর জবরদস্তি করে সৎ পথে আনতে চান না। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই, ভালো-মন্দ, সুপথ ও বিপথ দেখিয়ে দেয়াই কর্তব্য এবং প্রত্যেককে পথ গ্রহণের সুযোগ এবং স্বাধীনতা দেয়া হয়। দুনিয়ার জীবন যত সুদীর্ঘই হোক এবং এখানে যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করা হোক অবশেষে এ জীবনের অবসান ঘটবে। যে সৎ পথে থাকবে তার চির সাফল্য যেমন সুনিশ্চিত, ঠিক তেমনি যে বিপথে পরিচালিত হবে তার কঠিন কঠোর শাস্তিও অবধারিত। এ কাফেররা হয়তো দুনিয়াতে আযাব দেখবে অথবা মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিনের আযাবের মুখোমুখি হবে। দুনিয়াতে তাদেরকে বন্দী করা হতে পারে বা হত্যা করাও হতে পারে, আর আখেরাতের শাস্তি তো অনিবার্য ও অবধারিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

মক্কায় কাফেররা শুধু যে সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখান করছিলো তাই নয়, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণকে চরম নির্যাতনও করছিলো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যারা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি নয়, যারা পথভ্রষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিন, আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দেবেন এবং তাদের জন্যে নির্ধারিত সময়ে আযাব আসবে, অথবা মৃত্যুর পর তারা কেয়ামতের কঠিন দিনের আযাব ভোগ করবে আর তখন তারা প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাবে।

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا

"অদূর ভবিষ্যতে তারা জানতে পারবে যে কার ঘর-বাড়ি মন্দ এবং কার দলবল দুর্বল"।

যেহেতু কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিলো, তোমরা দেখ কার বাড়ি-ঘর উত্তম? আর কাফেরদের এ কথারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে কার বাড়ি-ঘর মন্দ এবং কার দলবল দুর্বল কেননা, কাফেররা সেদিন দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়াতে ইবলিস ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরাই ছিল কাফেরদের সাহায্যকারী। কেয়ামতের দিন তারাও হবে কোপগ্রস্ত, অতএব, তাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবেনা, কাফেররা সেদিন থাকবে চরম বিপদে।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا
وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ
يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

তরজমা

(৭৬) আর যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেন অধিকতর হেদায়েত এবং স্থায়ী সৎ কাজই আপনার প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আস্তানা রাখে।

(৭৭) (হে রসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন যে আমার আয়াত সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে যে আমি অবশ্যই ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করবো।

(৭৮) সে কি অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে সে কি কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

(৭৯) কখনই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো।

(৮০) সে যে বিষয় সম্পর্কে কথা বলে তা আমার অধিকারেই থাকবে, আর সে আমার নিকট আসবে একা।

(৮১) তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে যেন তারা তাদের সাহায্য করে।

(৮২) কখনই নয়, বরং তারা তাদের বন্দেগী অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

হেদায়েত বৃদ্ধি করার তাৎপর্য

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

যেভাবে আল্লাহ পাক গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি যারা হেদায়েত প্রাপ্ত, যারা সজ্ঞানে, নিজের বিচার-বুদ্ধিতে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাদের বিচার-বুদ্ধি আরও বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তারা অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যারা হেদায়েত প্রাপ্ত আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা হেদায়েত প্রাপ্ত, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ পাক তাঁদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাঁদেরকে নৈকট্য-ধন্য করেন। দুনিয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক কখনও অনেক নেয়ামত দান করেন, আর মোমেনগণ কখনও থাকে দারিদ্র-প্রপীড়িত। কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে কাফেররা আল্লাহ পাকের প্রিয় আর মোমেনগণ অপ্রিয়, বরং মোমেনদেরকে এই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ কম দিয়ে তাঁর হেদায়েত অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর কাফেরদেরকে যে ধন-সম্পদ দেয়া হয় তা এই কারণে যে তাদেরকে ঢিল দেয়া হয় এবং তাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অর্থে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েত আরও বৃদ্ধি করে দেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে যারা নেককার, আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেন। এর তাৎপর্য হলো ঈমানের পর আল্লাহ পাক তাদেরকে এখলাছ দান করেন, অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাদের সওয়াব বৃদ্ধি করে দেবেন।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, মোমেনের প্রকৃত সম্পদ হলো হেদায়েত। আর আল্লাহ পাক তাদের এই হেদায়েতের পুঁজি বৃদ্ধি করে দেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর জন্যে ঈমান বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ৩৪৪-৪৫
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৪৮
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৬১৪

স্থায়ী নেক আমল

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

"আর স্থায়ী নেক আমলই আপনার প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আস্তানা রাখে"।

অর্থাৎ যে নেক আমল সর্বদা অব্যাহত থাকে, আপনার প্রতিপালকের নিকট তা সওয়াবের দিক থেকে উত্তম আর এমন আমলের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত।

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ

স্থায়ী নেক আমল হলো সে আমল যার উপকারিতা সর্বদা লাভ করা যায়।

অথবা সে আমল যার উপকারিতা মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভ করবে, হাদীস শরীফে দৃষ্টান্ত স্বরূপ "সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ", "ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" "ওয়াল্লাহু আকবর, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ"– এ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে।

এ পর্যায়ে আয়াতের অর্থ হবে আখেরাতে পৌছার পরই সকলে এ সত্য উপলব্ধি করবে যে সম্মান এবং শান্তি নির্ভর করে নেক আমলের উপর, আর প্রকৃত সম্পদ হল খাঁটি ঈমান, বিশুদ্ধ আকীদা এবং নেক আমল; দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা বা দ্রব্য সামগ্রী নয়। কেননা, এসব কিছু ক্ষণস্থায়ী জীবনে উপকারী হলেও চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন মূল্যই নেই।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বৃক্ষের একটি ডালা ধরে নাড়া দিলে তার শুষ্ক পাতা ঝরতে থাকে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ দেখ, যখন মানুষ এই দোয়া পাঠ করবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুল্লিাহ"– তখন ঠিক এভাবেই তার গুনাহগুলো ঝরে যায়। সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে তিনি বললেন, হে আবু দারদা! তুমি সর্বদা এ দোয়া পাঠ করতে থাক, সে সময় আসার পূর্বে যখন তুমি এ দোয়া পাঠ করতে পারবে না। এটিই হল স্থায়ী নেক আমল আর এটিই জান্নাতের ভান্ডার। এই হাদীস শ্রবণ করার পর হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর অবস্থা এই ছিল যে তিনি এই হাদীস বয়ান করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর শপথ! আমি এই কলেমাগুলো পাঠ করতেই থাকবো, কখনও এ কলেমা পাঠ করা থেকে বিরত থাকবো না, যদি আমাকে কেউ পাগলও বলে।[২]

أَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا

"(হে রসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে আমার আয়াত সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৩০
১। বাকীয়াতুস সালেহাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা ৪৩০-৩৩

এবং বলে যে আমি অবশ্যই ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করবো"?

শানে নুজুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত খোবাব এবনুল আরত বর্ণনা করেছেন, আমি কামারের কাজ করতাম, আস এবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির কিছু কাজ আমি করেছিলাম। আমার পারিশ্রমিক তার কাছে বাকি ছিল। একদিন আমি তাকে আমার প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা করলাম। আস জবাব দিল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তুমি মোহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবো না। তখন আমি বললাম, খুব ভাল করে শ্রবণ কর, যখন তুই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করবি তখনও আমি কুফরী করবো না। আস বললো, মৃত্যুর পর কি পুনরায় আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ উঠানো হবে। তখন আস বললো, তবে সেখানেও আমি ধন-সম্পদ লাভ করবো, আর সেখানেই তোমার পাওনা আদায় করবো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খোবাব (রাঃ) বলেছেন, আমি মক্কায় আস এবনে ওয়ায়েলের জন্যে একটি তরবারী তৈরী করেছিলাম, এর পারিশ্রমিক তার নিকট আমার পাওনা ছিল। তার নিকট পারিশ্রমিক দাবী করলে সে এসব কথা বলে।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হল, আখেরাতের নেয়ামত এবং সম্পদ শুধু ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব হয়। তাই কাফেরদের এ স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হবেনা, আখেরাতে তারা হবে চরম বিপদগ্রস্ত।

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

"কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, সে কি অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে? অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে সে কি কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে"?

অর্থাৎ কাফেররা পরকালেও ধন-সম্পদ লাভ করবে এমন দাবী যে তারা করছে তারা ভিত্তি কি? তারা কি আল্লাহ পাকের অদৃশ্য জগত দেখে এসেছে? অথবা তারা কি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছে? আর একথা সর্বজনবিদিত, এর কোনটিই হয়নি। গায়বী খবর জানার যোগ্যতা কাফেরদের হয়না। আর অবাধ্য কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক কোন প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন না। তাই তাদের এসব কথা ভিত্তিহীন, অলীক। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, তাঁর বিধান মেনে চলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, শুধু তারাই এমন প্রতিশ্রুতি লাভের সুযোগ পায়।

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির তরজমা করেছেনঃ সে কি লওহে মাহফুজ দেখেছে? মুজাহেদ (রঃ) এ বাক্যটির তরজমা করেছেনঃ সে কি গায়বী এলম অর্জন করেছে যার ভিত্তিতে আখেরাতে ধন-সম্পদ লাভের দাবী করছে?

أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

(সে কি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছে?)

অর্থাৎ সে কি তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে? কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, সে কি কোন নেক আমল করেছে? আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক কি তার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি তাকে বেহশতে প্রবেশ করাবেন?

كَلَّا

(অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়।)

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا

"আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব"।

অর্থাৎ এ কাফেররা যে ভিত্তিহীন দাবী করছে তা আমি লিখে রাখছি, আর তাদের এ অহংকার ও অন্যায় অনাচারের শাস্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। আখেরাতে অর্থ-সম্পদ তো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা; বরং দুনিয়াতে তার যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে এসবও তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাকে আমার নিকট হাযির হতে হবে একা।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কথা লিপিবদ্ধ করার তাৎপর্য হল তা সংরক্ষণ করা। কেননা, ফেরেশতাগণ সর্বদা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করে থাকে, আর তা আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই করে থাকে।

আযাব বৃদ্ধি করার তাৎপর্য হল, কাফের হওয়ার কারণে তাদের আযাব নিদৃষ্ট রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা দ্বীন ইসলামের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ইসলামের বিধানকে বিদ্রুপ করেছে এবং মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে তাই তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।[১]

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

যে বিষয় সম্পর্কে সে কথা বলে, অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তা আমার অধিকারেই থাকবে, সে আমার নিকট আসবে সম্পূর্ণ একা।

অর্থাৎ তার সব কিছু ছেড়ে তাকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হবে, আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সে একা হাযির হবে যেদিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছনঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪৬

"সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পলায়ন করবে, কেননা সেদিন মহা বিপদের সম্মুখীন হবে, কেউ কারো সাহায্য করার অবস্থায় থাকবেনা"।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

"তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে যেন তারা তাদের সাহায্য করে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার প্রারম্ভে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পিতা ব্যতীত পয়দা হওয়ার এবং হযরত মরয়ম (আঃ)-এর নিঃস্পাপ নিষ্কলঙ্ক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সম্মানিত মাতা সম্পর্কে ভিত্তিহীন আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তাই এ ঘোষণা দ্বারা তাদের অন্যায় অযৌক্তিক কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, কেননা তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

এতদ্ব্যতীত, পূর্বের কয়েকখানি আয়াতে কেয়ামতের অবস্থা এবং নেককারদের নেক আমল ও তার পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে মুশরেক বা পৌত্তলিকদের পথভ্রষ্টতা ও ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র বলার যে ধৃষ্টতা দেখায়, তা একান্ত অমার্জনীয় অপরাধ। যদি আল্লাহ পাক দয়া করে সহ্য না করতেন, তবে এ পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের মূর্খতা এবং আখেরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে তার বিবরণ রয়েছে। এ সূরার শেষ দিকে নেককার মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে মানুষের অন্তরে মোমেনদের জন্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ ওয়ালাগণ মানুষের মধ্যে প্রিয়, পছন্দনীয় ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হন।

সূরার শেষের দিকে এ নসিহত করা হয়েছে যে, এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে, অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হল নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

এতদ্ব্যতীত, এ পর্যায়ে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য, সূরা শুরু করা হয়েছে রহমতের আলোচনা দ্বারা, আর শেষ করা হয়েছে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً

আর তারা (কাফেররা) আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা তাদের ঠাকুর-দেবতাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে, তাদের ধারণাঃ

لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

তাদের মিথ্যা উপাস্যরা আল্লাহ পাকের দরবারে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবে, অর্থাৎ কাফেররা এ আশায় মূর্তি পূজা করে যে, এ মূর্তিদের সুপারিশে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর এ দেব-দেবীরা তাদের সাহায্য করবে।

كَلَّا

অবশ্যই নয়, দেবতার মাধ্যমে তাদের পূজারীদের কোন সম্মান হবেনা।

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

ঐ মিথ্যা উপাস্যরা তাদের পূজারীদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে এবং বলবে, তারা আমাদের উপাসনা করেনি; বরং উপাসনা করেছে শয়তানদের এবং তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির, আমরা তাদের এ কু-কর্ম থেকে পবিত্র। অথবা এর অর্থ হলো, কাফেররা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর বন্দেগী করার কথা অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর শপথ করে বলবে, আমরা মুশরেক ছিলাম না। বাতিল উপাস্যরা শুধু যে পূজারীদের উপাসনার কথা অস্বীকার করবে তাই নয়, বরং তারা পূজারীদের শত্রু হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

"আর বাতিল উপাস্যরা হবে তাদের পূজারীদের বিরোধী"।

অর্থাৎ কাফেররা যে বাতিল উপাস্যদের সাহায্যের আশায় তাদের পূজা করেছিল কেয়ামতের দিন তারা তাদের শত্রু হবে। অথবা এর অর্থ হল, তাদের শাস্তি বিধানে সাহায্যকারী হবে। কেননা, দুনিয়াতে তারা পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতো এবং তার পূজা করতো। কেয়ামতের দিন দোযখে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে অগ্নির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং কাফেরদের শাস্তিও বেড়ে যাবে। অথবা এর অর্থ হল, কেয়ামতের দিন কাফেররা তাদের বাতিল উপাস্যদের বিরোধী হবে। দুনিয়াতে তাদের পূজা করতো কিন্তু আখেরাতে তাদের বিরোধী হবে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ ও নেসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তারা তাদের বাতিল উপাস্যদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১. বাতিল উপাস্যরা তাদের পূজারীদের বিরোধী হবে।

২. পূজারীরা তাদের বাতিল উপাস্যদের শত্রু হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে হবে বিতর্ক। উপাস্য এবং পূজারী উভয়ের স্থান হবে দোযখে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ
إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
أَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

তরজমা

(৮৩) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি? আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, শয়তানরা তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে।

(৮৪) তাই আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র।

(৮৫) (সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন দয়াময়ের নিকট পরহেযগার লোকদেরকে সম্মানিত মেহমান রূপে একত্রিত করবো।

(৮৬) আর পাপীষ্ঠদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

(৮৭) যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত আর কেউই সেদিন সুপারিশের অধিকার রাখবেনা।

(৮৮) আর লোকেরা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।

(৮৯) তোমরা তো এক অত্যন্ত বীভৎস কথার অবতারণা করেছ।

(৯০) (কথাটি এত বীভৎস যে এর কারণে) যদি আকাশ ফেটে যায়, ধরণী বিদীর্ণ হয়ে যায়, পাহাড় ধ্বসে যায়, (তবে তাতে আশ্চর্যন্বিত হওয়ার কিছুই নেই)।

(৯১) যেহেতু তারা বলে, রহমানের সন্তান রয়েছে।

(৯২) অথচ সন্তান ধারণ করা রহমানের পক্ষে শোভন নয়।

(৯৩) আসমান জমীনে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের অনুগত বন্দা হয়ে তাঁর নিকট হাযির হবেনা।

(৯৪) তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে তিনি বিশেষভাবে গণনাও করেছেন।

(৯৫) আর কেয়ামতের দিন তাদের সকলকে তাঁর দরবারে হাযির হতে হবে একা, একা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের পথভ্রষ্টতা এবং আখেরাতে তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে কাফেরদের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে শয়তানের উস্কানী এবং প্ররোচনাতেই তারা কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই শয়তানের ইঙ্গিতেই তারা নাচতে থাকে। এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ

"(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ করেননি? যে আমি শয়তানদেরকে কাফেরদের উপর ছেড়ে রেখেছি"।

আর এ কাফেররা শয়তানদের ইঙ্গিতেই অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, শয়তান তাদেরকে মন্দ কাজে প্রলুব্ধ করে।

تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

"শয়তান তাদেরকে মন্দ কাজে প্ররোচনা দেয়"।

এটি তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। কেননা শয়তান তাদেরকে মন্দ কাজের জন্যে বাধ্য করতে পারেনা, তাদেরকে কুফরী ও নাফরমানীর দিকে আহবান জানাতে পারে। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম কোন ব্যক্তিকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করেন না; বরং তাঁরা ঈমান ও নেক আমলের দিকে আহবান জানান। যারা বুদ্ধিমান, যারা বিবেকবান, যারা পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী, তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের আহবানে সাড়া দেয় এবং ঈমান আনয়নে অগ্রগামী হয়। পক্ষান্তরে, যারা বদনসীব বা ভাগ্যাহত, যারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে নিপতিত, তারা হয় পথভ্রষ্ট, তাই তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণে থাকে বিরত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

"(হে রসূল!) আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না"।

অর্থাৎ তাদের উপর অতি সত্বর আযাব নাযিল হোক তা কামনা করবেন না। তাদের জীবনের নির্দিষ্ট সময়-সীমা সম্পর্কে আমি অবগত। এ নির্দিষ্ট সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করা হবেনা। কেননা, তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

"(সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমি পরহেযগার লোকদেরকে দয়াময়ের নিকট মেহমান রূপে একত্রিত করবো"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের অবস্থা তাদের গোমরাহীর কারণ এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা এরশাদ হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রেরিত নবী ও রসূলগণের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং পাপাচার পরিহার করে জীবন যাপন করে, আল্লাহ পাককে ভয় করে চলে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্মানিত মেহমান হিসেবে একত্রিত হবে। আর সম্মানিত মেহমান হিসেবেই মেহমান খানায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর দুশমন, যারা সর্বাদা পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

মোমেন ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়েই দেখবে একজন অতি সুন্দর ব্যক্তি পবিত্র আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে দন্ডায়মান রয়েছে। মৃত ব্যক্তি পুনরুত্থানের পর ঐ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? সে বলবে, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি? আমি তো আপনার নেক আমলের প্রতিকৃতি, আপনার আমল ছিল নূরানী এজন্যে আমি আপনাকে নিজের কাঁধে আরোহন করিয়ে অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবো। কেননা দুনিয়ার জীবনে আমি আপনার উপর আরোহন করেছিলাম।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে মোমেন বন্দা আল্লাহ পাকের নিকট কোন যানবাহনে আরোহন করে হাযির হবে। তাদের আরোহনের জন্যে নূরানী উষ্ট্র প্রস্তুত থাকবে। আর সকলে আনন্দিত ও সম্মানিত অবস্থায় জান্নাতে যাবে।

এবনে আবি হাতেমের বর্ণনা এই, হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি এ আয়াত তেলাওয়াত করে আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! وفد বা প্রতিনিধি দল তো আরোহন করে আসে। তখন তিনি এরশাদ করেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, পরহেযগার লোকদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে আর তখনই তারা সাদা বর্ণের নূরানী উষ্ট্রকে আরোহনের জন্যে দেখতে পাবে। যার উপর স্বর্ণ-নির্মিত আসন তৈরী থাকবে, যার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দৃষ্টি-সীমার শেষ প্রান্তে রাখবে। জান্নাতীগণ ঐ বাহনের উপর আরোহন করে একটি জান্নাতী বৃক্ষের নিকট পৌঁছবে, যেখান থেকে দু'টি নহর

প্রবাহিত দেখতে পাবে, যার একটির পানি পান করলে তাদের মনের সকল কালিমা দূর হবে, আর দ্বিতীয় নহরে অবগাহন করলে তাদের দেহ নূরানী হয়ে যাবে। তাদের চেহারা চমকদার হবে, তারা জান্নাতের দ্বারে এভাবে পৌছবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আবদুল্লাহ এবনে আহমদ, হাকেম, বায়হাকী, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, তোমরা শোন, আল্লাহ পাক মুত্তাকী লোকদেরকে পদব্রজে যেতে দেবেন না। আর তাদেরকে হাঁকিয়েও নেয়া হবে না; বরং জান্নাতের সে উষ্ট্রীগুলোর উপর তাদেরকে আরোহন করানো হবে যার কোন দৃষ্টান্ত বা নমুনা কোন সৃষ্টি কখনও দেখেনি। আর ঐ উষ্ট্রীগুলোর উপর স্বর্ণ-নির্মিত আসন থাকবে। মুত্তাকী পরহেযগার লোকেরা ঐ উষ্ট্রী-গুলোর উপর আরোহন করে জান্নাতে হাযির হবে এবং জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! জান্নাতবাসীকে কখনও পদব্রজে যেতে দেয়া হবে না, বরং এমন উষ্ট্রের উপর তাদেরকে আরোহন করানো হবে যার আসবাবপত্র স্বর্ণের হবে।

বায়হাকী তালহা এবনে আবি তালহার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রত্যেককে যানবাহনে আরোহন করে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

"আর আমি পাপীষ্ঠদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব"।

مجرمين শব্দ দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। وردا শব্দটির তরজমা করা হয়েছে পদব্রজে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এর তরজমা করেছেন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির তরজমা করেছেন তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। আলোচ্য আয়াতে দু'দল লোকের হাশরের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. যারা পরিপূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীগণ।

২. পাপীষ্ঠদের পরিণতিও এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সাধারণ মুসলমানদের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। নেককারদেরও নয় গুনাহ্গারদেরও নয়। হাদীস শরীফে এসেছে কিছু লোককে পদব্রজে উঠানো হবে, তারা সাধারণ মোমেন হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস হলোঃ মানুষের হাশর তিন প্রকার হবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৫০

আরোহী অবস্থায়, পদব্রজে এবং উপুড় অবস্থায়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের হাশর তিন ভাবে হবে। কিছু লোক আশান্বিত অবস্থায় থাকবে, তথা আল্লাহ রহমতের আশা-আকাংক্ষা নিয়ে থাকবে। আর কিছু লোক ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকবে। এক একটি উষ্ট্রের উপর দু' দু' বা তিন তিন জন করে, এমনকি দশজন পর্যন্ত আরোহন করবে, তাদের সঙ্গে অগ্নিও থাকবে। তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে অবস্থান করবে, অগ্নিও তাদের সাথে থাকবে। আর যেখানে তারা রাত্রি যাপন করবে অগ্নিও তাদের সাথে থাকবে। শেখ এবনে হাজর (রঃ) বলেছেন, আশাবাদী ও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে সাধারণ মোমেনগণ। আর এই হাদীসে এক একটি উষ্ট্রের উপর দু'তিন এবং দশজন করে আরোহন করার যে কথা রয়েছে তা দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আল্লাহর ওলীগণ প্রত্যেকে এক একটি উষ্ট্রে একা আরোহন করবেন।

বায়হাকী (রঃ) বলেছেন, "রাগেব" বা আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত বলে আল্লাহর ওলীগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর রাহেবীন (ভীত-সন্ত্রস্ত) বলে কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তেবরানী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন নবীগণকে যানবাহনে আরোহন করানো হবে, আর ঐ অবস্থায়ই তাঁদেরকে হাশরে পৌঁছানো হবে। হযরত সালেহ (আঃ)-কে তাঁর উষ্টীর উপর আরোহী অবস্থায় উঠানো হবে। আর আমাকে বোরাকের উপর আরোহী অবস্থায় উঠানো হবে। আর আমার দু' পৌত্র হাসান হোসায়েনকে জান্নাতের উপরিভাগ থেকে আগত দু'টি উষ্ট্রীর উপর উঠানো হবে। তারা আজান দেবে এবং সত্যিকার তৌহীদের সাক্ষ্য দেবে। তারা যখন اشهد ان محمد رسول الله বলবে তখন আগের পরের সমস্ত মোমেনগণ এ সাক্ষ্য দেবে। তখন যার শাহাদাত কবুল হওয়ার যোগ্য হবে, তা কবুল করা হবে। আর যার শাহাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ভাষণ দানের উদ্দেশে) দন্ডায়মান হলেন এবং এরশাদ করলেনঃ হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকট এভাবে নিয়ে যাওয়া হবে যে তোমরা থাকবে নগ্ন পায়ে, নগ্ন দেহে, খতনা ব্যতীত, পদব্রজে। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ

"সর্ব প্রথম যে অবস্থায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি সে অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনব"।

আর সর্ব প্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

যে দয়াময়ের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউই সেদিন সুপারিশের অধিকার রাখবেনা। যার মধ্যে এমন গুণাবলী রয়েছে, যা সুপারিশ করার জন্যে একান্ত জরুরী, শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারবে যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে কিন্তু তাঁর অনুমতিক্রমে"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে এর অর্থ হল যে তৌহীদ পন্থী হবে তথা তৌহীদে যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকবে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। কেননা, যে কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে, তার জন্যে মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا

"আর লোকেরা বলে, দয়াময় নিজের জন্যে সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাউজবিল্লাহ মিন জালেক")।

ইহুদীরা বলে, হযরত ওজায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র।

খৃষ্টানরা বলে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পুত্র। আর কোন কোন পৌত্তলিকরা বলতো যে ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। মুশরেকরা যেভাবে দেব-দেবীর উপাসনা করতো, তেমনি খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলার ধৃষ্টতা দেখায়। এর চেয়ে ভয়ংকর অপরাধ আর কি হতে পারে?

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

"তোমরা অত্যন্ত ভয়ংকর কাজ করেছ, অত্যন্ত বীভৎস কথার অবতারণা করেছ"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) اِدًّا শব্দটির তরজমা করেছেন মন্দ। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন অত্যন্ত মন্দ। আর তা এতো মন্দ যে তার পরিণতিতে تَكَادُ السَّمٰوٰتُ। হয়তো আসমান ফেটে পড়বে, জমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং পাহাড় ধ্বংসে পড়বে, এ কারণে যে তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের সাথে সন্তানের সম্পর্কের কথা বলে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত কা'ব বলেছেন, মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি জগৎ একথা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। সম্ভাবনা ছিল যে সবকিছু নিজ নিজ স্থান হতে সরে যায় এবং ফেরেশতাগণ রাগান্বিত হন, দোযখের অগ্নির তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো কথাটি এতো ভয়ংকর, বিপজ্জনক যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সহনশীলতা অনন্ত অসীম না হতো তবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো এবং যে এত বড় অন্যায় কথা বলে তার উপর পড়তো। কিন্তু আল্লাহ

পাক অত্যন্ত সহনশীল ও দয়াবান হওয়ার কারণে এমন বেআদবীর শাস্তি প্রদানেও তাড়াহুড়া করেন না, ফলে পৃথিবী রক্ষা পায়। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের কথা সর্বক্ষণ ঘোষণা করতে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি যদি মানুষ দৃষ্টিপাত করে, যদি সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা ও গবেষণা করে তবে সর্বত্র এক মহা-শক্তির এক অদৃশ্য ক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। ইমাম রাজী (রঃ) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ স্বরূপ এক হাজার দলিল পেশ করতেন। তিনি একজন বেদুঈনকে আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোকটি তখন তাঁর প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে জবাব দিয়েছিল, গোবর যদি উষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, পদ-চিহ্ন যদি পথচারীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে তবে চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ সমন্বিত নভোমন্ডল এবং বিশাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত সমুদ্র এবং বহু বিচিত্র সৃষ্টির ধারক, বিশাল বিস্তৃত ভূ-মন্ডল এসব কি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপন করে না? যদি গ্রন্থ দেখে গ্রন্থকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে অথচ কখনও গ্রন্থকারের সাক্ষাত লাভ হয়নি, যদি প্রাচীরের অভ্যন্তর থেকে উত্থিত ধুম্ররাশি দ্বারা অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তবে কি সমগ্র বিশ্ব-জগত ও এর প্রতিটি অণু পরমাণু তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্বের এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্বের স্বাক্ষর বহন করেনা? কিন্তু দূরাত্মা কাফেররা, জ্ঞানপাপী ইহুদী-খৃষ্টানরা এসব বিষয়ে চিন্তা না করে মহান আল্লাহ পাকের শানে বেআদবী করে এবং তাঁর সন্তান আছে বলে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحۡمٰنِ اَنۡ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

"অথচ সন্তান ধারণ করা রহমানের পক্ষে শোভন নয়"।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা, উচ্চ মহিমা, তাঁর শান এসব দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক উর্দ্ধে। আল্লাহ পাক এসব ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহমান' শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই, আল্লাহ পাক সকলের এবং সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর পবিত্র মহান সত্ত্বা ব্যতীত আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, আর সমগ্র সৃষ্টি জগতই তাঁর নেয়ামত ও দয়া লাভ করে থাকে। অতএব যা কিছু তাঁর দানে ধন্য এবং নেয়ামত প্রাপ্ত তা তাঁর সন্তান কি করে হতে পারে? কেননা সন্তান হতে হলে তাঁর পিতার সম-প্রকৃতির হতে হবে। অথচ আল্লাহ পাকের সমকক্ষ কেউ নেই এবং তাঁর কোন দৃষ্টান্তও নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বময় ক্ষমতর অধিকারী, তিনি সকল জ্ঞানের আধার, তিনি নিরাকার, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মালিকানা একমাত্র তাঁর।

اِنۡ كُلُّ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحۡمٰنِ عَبۡدًا

"আসমান জমীনে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের অনুগত বন্দা হয়ে তাঁর নিকট হাযির হবে না"।

অর্থাৎ ভূ-মন্ডল এবং নভোমন্ডলের সব-কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং সব-কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্তৃত্বাধীন। কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রত্যেককেই দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান–দরবারে অনুগত বন্দা হয়ে হাযির হতে হবে। এমন অবস্থায় তিনি সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করবেন কোন্ যুক্তিতে? কোন্ প্রয়োজনে?

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

"নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনাও করে রেখেছেন"।

এ কারণেই কোন সৃষ্টিই তাঁর দাসত্ব এবং আনুগত্যের আওতার বাইরে যেতে পারে না। প্রত্যেকের জীবন, কর্ম, সকল অবস্থা এবং রিযক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। কোন কিছুই তাঁর এলম বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

"আর কেয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেককে তাঁর মহান দরবারে হাযির হতে হবে একা একা"।

বস্তুতঃ কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রত্যেককে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। অন্য সকলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অর্থ-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অথবা দেব-দেবী এক কথায় কোন কিছুই সেদিন তাদের উপকারে আসবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ
وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ
بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ
مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

তরজমা

(৯৬) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে দয়াময় আল্লাহ পাক তাদের প্রতি (সকলের অন্তরে) সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

(৯৭) (হে রসূল!) আপনি যেন মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং কলহ-প্রিয় লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, এজন্যে আমি পবিত্র কোরআনকে আপনার ভাষায় (আরবী) সহজ করে দিয়েছি।

(৯৮) আমি তাদের পূর্বে কত মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। (হে রসূল!) আপনি কি

তাদের কাউকে দেখতে পান? অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান।

তফসীরুল কোরআন

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

আলোচ্য আয়াত সমূহে মোমেনদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। পবিত্র কোরআন নাজিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মোমেনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং নাফরমানদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি, তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, সত্য-সাধনায় রত হয়, সত্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয় এবং সত্য-প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে তাদের জন্যেই রয়েছে এ সুসংবাদ। পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনের হেদায়েত অমান্য করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। কেননা তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভয়াবহ।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াত সমূহে রয়েছে মোমেনদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে দয়াময় আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন সকলের অন্তরে ভালবাসা"।

শানে নজুল

এবনে জরীর হযরত আবদুর রহমান এবনে আউফের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায়ায় চলে গেলাম তখন মক্কাবাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হলো। তাদের প্রীতি-ভালবাসা এবং আন্তরিকতার কথা আমার মানস পটে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল শায়বা এবনে রবীয়া, উৎবা এবনে রবীয়া, উমাইয়া এবনে খালফ গয়রহ। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

তেবরানী (রঃ) 'আল-আউসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে এ আয়াত খানি হযরত আলী এবনে আবি তালেব (রাঃ) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া এবং দায়লামী হযরত বারা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, হে আলী! তুমি বল-

اللهم اجعل لى عندك عهدا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫৫

'হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো প্রতিশ্রুতি এবং তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো ভালবাসা এবং আমার জন্যে মোমেনদের অন্তরেও রেখে দিও ভালবাসা'। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তেবরানী, এবনে মরদরিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভালবাসেন। অথবা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের ভালবাসা দান করবেন। কিংবা মানুষের মনে তাদের জন্যে প্রীতি ভালবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে তিনি তোমাদের প্রীতি ভালবাসা সকল মোমেনের অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন, শুধু কাফেররা তোমাদের মহব্বত থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি, তারা ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি জগতের অন্তরেই তোমাদের মহব্বত রেখে দেয়া হবে। এ মর্মে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরেকটি ঘোষণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেন, আমি যার 'মওলা' আলীও তার 'মাওলা'। (মওলা অর্থ মুনিব, বন্ধু অথবা ভাই)। এই হাদীস আহমদ, এবনে মাজা, তিরমিজী এবং নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেনঃ আলী (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা (অথবা তাঁর প্রতি মহব্বত রাখা) এবাদত। এই হাদীস উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে মসনদে সংকলিত হয়েছে।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বন্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্রাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমি অমুক বন্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং নির্দেশ মোতাবেক জিব্রাঈলও (আঃ) তাঁকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর আসমানের সকল ফেরেশতাদেরকে আহবান করে ঘোষণা করা হয় যে আল্লাহ্ পাক অমুক বন্দাকে মহব্বত করেন, তোমরাও তাঁকে মহব্বত কর। তখন আসমানের ফেরেশতাগণও তাঁকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর জমীনবাসীদের মধ্যেও সে ব্যক্তিকে প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করা হয় (তখন পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁকে ভালবাসতে থাকে)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সম্ভবত এই হাদীসের অর্থ এই হবে যে আল্লাহ্ পাক বন্দাকে তাঁর নিজের প্রতি ভালবাসা প্রদান করেন, তখন বন্দা আল্লাহকে ভালবাসতে থাকে। যার ফলে আল্লাহ্ পাকও সেই বন্দাকে ভালবাসতে থাকেন। অপর একখানি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমার বন্দা নফল

আমল সমূহ দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে এবং আমি তখন তাকে ভালবাসতে থাকি। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বন্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন জিব্রাঈল (আঃ) তার শত্রু হয়ে যান। এরপর তিনি আসমান সমূহে এ ঘোষণা করেন যে অমুক ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, তোমরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক। এর কারণে সমগ্র আসমানবাসী তার দুশমন হয়ে যায়। এরপর সেই গজব এবং অশান্তি জমীনে অবতরণ করে। (বোখারী, মুসলিম)

মসনদে আহমদে রয়েছে, যে বন্দা তার মওলার সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় কাজে মশগুল হয়, আল্লাহ্ পাক জিব্রাঈল (আঃ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, আমার অমুক বন্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, শোন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তার প্রতি রহমত নাজিল করা শুরু করেছি, তখন জিব্রাঈল (আঃ) ঘোষণা করেন, অমুকের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত হয়েছে।[১]

একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যখন কোন বন্দা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সাধনায় রত হয়, তখন আল্লাহ্ পাক তাকে পছন্দ করেন। সে আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বন্দা হয়, আর এ কারণে মানুষের মনেও তার জন্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন সে জনপ্রিয় হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় রয়েছে তাহলো পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করা। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি হল আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের কারণে, আল্লাহ্ পাকের একনিষ্ঠ বন্দেগীর কারণে আল্লাহ্ পাক তাকে ভালবাসেন এবং তাঁর বন্দাদের অন্তরেও তার জন্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের ঐ মকবুল বন্দা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পক্ষান্তরে, যারা রাজনৈতিক কারণে খ্যাতি অর্জন করে, তাদের এ খ্যাতি আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার দলিল নয়। আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা সর্ব প্রথম বাস্তবায়িত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে। আল্লাহ্ পাক তাঁদের জন্যে মানুষের মনে এমন ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

"(হে রসূল!) আপনি যেন মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং কলহ-প্রিয় লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, এজন্যে আমি পবিত্র কোরআনকে আপনার জন্যে সহজ করে দিয়েছি"।

পবিত্র কোরআনকে অত্যন্ত সহজ এবং সুস্পষ্ট ভাষায় এজন্যে নাজিল করা হয়েছে যেন এর দ্বারা মুত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দেয়া হয় এবং যারা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৫৩

অবাধ্য, কাফের, যারা কলহ-প্রিয়, যারা পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ بلسانك অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার ভাষার তথা আরবীতে কোরআন নাজিল করে তার মর্মবাণীর উপলব্ধি সহজ করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হল, আপনার উম্মতের জন্যে তা সহজ করা হয়েছে।

মূলতঃ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাককে ভয় করে, তাদের মনের কপাট খুলে দেয়া হয় পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্যে। আল্লাহ পাক তাদেরকে পবিত্র কোরআনের মহান বাণী বুঝবার তৌফিক দান করেন। এজন্যে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

"আল্লাহ পাক যার হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, ইসলামকে বুঝবার জন্যে তার মনের কপাট খুলে দেন"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

"ইসলামকে বুঝবার জন্যে আল্লাহ পাক যার মনের কপাট খুলে দেন, সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে থাকে"।

শরহে সদর বা মনের কপাট খোলার তাৎপর্য হলো, পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার কাজকে সহজ করা। যেমন পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর প্রমাণ। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, এরশাদ হয়েছেঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ

"হে পরওয়ারদেগার! আমার মনের কপাট খুলে দিন এবং আমার কাজকে সহজ করে দিন"।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে শরহে সদর বা মনের কপাট খুলে দেয়ার তাৎপর্য হল কাজকে সহজ করা, যাকে আল্লাহ পাক এর তওফিক দান করেন তার সম্মুখে হক্ব ও বাতিল বা সত্য অসত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয় এবং সীরাতুল মোস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে قوما لدا বা কলহ-প্রিয় দল তাদেরকে বলা হয়েছে যারা সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করেনা, শুধু হিংসা বা শত্রুতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করে দোযখের পথ গ্রহণ করে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছে, লুদ সেই জালিমকে বলা হয় যে কখনো সঠিক পথে আসে না।

আবু ওবায়দা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লুদ সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে সত্যকে

অস্বীকার করে আর বাতিলের দিকে মানুষকে আহ্বান করে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট কোরআনে করীম এজন্যে নাজিল করেছি, যেন আপনি এর দ্বারা মোমেনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন আর কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। এজন্যে নয় যে আপনি দুঃখিত বা ব্যথিত হবেন। অতএব যদি লোকেরা আপনাকে অমান্য করে তবে আপনি মর্মাহত হবেন না এবং তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। কেননা, ইতিপূর্বে অনেক নবী রসূলগণকে অস্বীকার করা হয়েছে, তখন ঐ অবাধ্য কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

"আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (হে রসূল!) আপনি তাদের কাউকে দেখতে পান? অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দ কি শুনতে পান"?

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নাফরমানদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত বাকী রয়নি। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে, আল্লাহর নবীগণকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়েছে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। একদিন যাদের দৌরাত্মে মেদিনী কাঁপতো থর থর, আজ তারা কোথায়? (হে রসূল!) আপনি কি তাদের কোন নাম-নিশানা দেখেন? অথবা তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দও কি শোনেন? যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে, তারা নিশ্চয় অমার্জনীয় অপরাধ করে, তাদের শাস্তি অবধারিত। যদি আরবের কাফেররা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্যে তৈরি থাকা উচিত।

এ আয়াতে দুনিয়ার সকল কাফের, মুশরেক, বেদ্বীন, মুনাফেক, পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১০ই জানুয়ারী মোতাবেক ১৬ই রজব রোববার সকাল সাড়ে দশটায় সূরায়ে মরয়মের তফসীর সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা শুধু তোমারই, যা কিছু হয়েছে শুধু তোমার দানেই হয়েছে, হে আল্লাহ! তফসীর নূরুল কোরআনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করার তওফিক দান করো, এই মহান সাধনাকে কবুল করুন, আমীন।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা তোয়াহা

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰهٰ ﴿١﴾ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ
يَّخْشٰى ﴿٣﴾ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾
اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ
فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ﴿٨﴾ وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ
لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ
اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾ اِنِّىْٓ اَنَا
رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

তরজমা

(১) তোয়াহা,

(২) (হে রসূল!) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি পবিত্র কোরআন নাজিল করিনি;

(৩) বরং যারা (আল্লাহ পাককে) ভয় করে তাদের নসিহতের জন্যেই আমি তা নাজিল করেছি।

(৪) যিনি উঁচু আসমান এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট থেকেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

(৫) আরশে অধিষ্ঠিত অতি দয়াময় তিনি।

(৬) যা-কিছু রয়েছে আসমানে জমীনে এবং উভয়ের মাঝখানে ও ভূ-গর্ভে-এর সব তাঁরই।

(৭) আর তুমি যদি উচ্চ-কণ্ঠেও কথা বল তবে তিনি যে গোপন এবং গোপনতম বিষয় সম্পর্কে অবগত।

(৮) আল্লাহ পাক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

(৯) (হে রসূল!) আপনার নিকট মূসার খবর পৌঁছেছে কি?

(১০) যখন তিনি একটি আগুন দেখতে পান তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি তোমাদের জন্যে তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো, অথবা আগুন পর্যন্ত পৌঁছে আমি সঠিক পথের সন্ধান পাব।

(১১) এরপর যখন তিনি আগুনের নিকট আসেন তখন তাঁকে আহবান করে হলো, হে মূসা!

(১২) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কেননা তুমি পবিত্র 'তুয়া'র ময়দানে রয়েছ।

সূরায়ে তোয়াহা প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ১৩৫ আয়াত এবং ৮ রুকু রয়েছে।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরার প্রথম শব্দই হলো 'তোয়াহা', তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তোয়াহা। এ সূরার আরেকটি নাম হলো আল-কালীম।[১]

সূরা মরয়মে আল্লাহ পাক একাধিক আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)। আর কয়েকজন নবীর কথা বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা। আর কোন কোন নবীর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ

আর আলোচ্য সূরায় হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার শেষে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত

এ সূরা সম্পর্কে আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫২৮
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৪৭।

দারমী এবং এবনে খোযাইমা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আসমান, জমীন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সূরা তোয়াহা এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করেছেন। ফেরেশতাগণ এ সূরা শ্রবণ করে বলেছিল, সে উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান যার প্রতি এ কালাম নাজিল হবে। আর সে ভাষা অত্যন্ত মোবারক যার মাধ্যমে এই কালাম প্রকাশিত হবে। দায়লামীও হযরত আনাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তফসীরুল কোরআন

طـه এ দু'টি অক্ষরকে মুকাত্তাআত বলা হয়। এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, طٰهٰ আল্লাহ পাকের অন্যতম নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন হা-মীম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ "হা-মীমের শপথ! এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবেনা এবং তারা সফল হবেনা"।

মোকাতেল এবনে হাব্বান বলেছেন, 'তোয়াহা'র অর্থ হলো উভয় পা জমীনে রাখ, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমীনে স্থাপন কর।

এবনে মরদবিয়া তাঁর তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা মুযাম্মেলের আয়াতঃ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

(হে কম্বলীওয়ালা! রাত্রিকালে নামাযে দন্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।)

নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডয়মান থাকতেন, ফলে তাঁর কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন, তখন জীব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং বললেন, 'তোয়াহা'। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! উভয় পা মাটিতে রাখুন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), আতা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তোয়াহা অর্থ হলো হে ব্যক্তি। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় 'তোয়াহা' অর্থ হল- হে ব্যক্তি। কালবীও (রঃ) আলোচ্য শব্দটির এ তরজমাই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেনঃ

(১) ط অক্ষরটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর দ্বারা জান্নাতের তুবা বৃক্ষটিকে উদ্দেশ্য করা

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৫৯

হয়েছে।

আর ها অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বোঝানো হয়েছে (দোযখের একটি নাম)। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক জান্নাত এবং দোযখের শপথ করেছেন।

(২) বর্ণিত আছে যে ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলতেন, طا দ্বারা আহলে-বাইতের তাহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ها দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়াত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, طا দ্বারা পবিত্রতা আর ها দ্বারা হেদায়াত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি! যিনি গায়বী বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন।১

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

"(হে রসূল!) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি পবিত্র কোরআন নাজিল করিনি, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে তাদের নসিহতের জন্যেই আমি কোরআন নাজিল করেছি"।

যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় করে, যাদর মন বিনম্র, তাদের নসিহতের জন্যে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-অগ্রগতি লাভের লক্ষ্যে আমি কোরআন নাজিল করেছি। (হে রসূল!) এর দ্বারা আপনাকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় মোটেই। কেননা পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক কখনও ব্যর্থ হবে না। এটি যে আল্লাহ পাকের রহমত ও নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে অত্যন্ত বেশী মনোনিবেশ করেন, এমনকি তিনি সারা রাত জাগ্রত থাকতেন এবং দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান অথবা সেজদারত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর অনেক সাহাবায়ে কেরামও এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করতেন। কাফেররা এ অবস্থা দেখে বলতে লাগলো, কোরআনের অবতরণ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে চরম কষ্টে ফেলেছে। কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথার প্রতি-উত্তরেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

(হে রসূল!) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিনি; বরং এটি সম্পূর্ণ রহমত এবং নূর। এ নূরের আলোকে নিজের অন্তরকে আলোকিত করাই হলো কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا (সূরা তাগাবুন)

"অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সে নূরের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (সূরা বণী ইসরাঈল)

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৩

"আর আমি কোরআন থেকে রোগের নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে রহমত অবতরণ করি, কিন্তু তা পাপীষ্ঠদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে"।

বস্তুতঃ যার পক্ষে যতখানি সহজ এবং সম্ভব সে ততখানি পবিত্র কোরআন পাঠ করবে, এর জন্যে সাধ্যাতীত কষ্ট স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। কোরআনে করীম হলো নসিহত। যারা নেককার তারা এর দ্বারা নসিহত হাছিল করেন, এটি হলো আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জ্ঞান। যে এই জ্ঞান লাভ করে সে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হয়। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে যার মর্ম হলোঃ আল্লাহ পাক যার কল্যাণ সাধনে ইচ্ছুক হন তাকে দ্বীন ইসলামের এলম দান করেন। হাফেজ আবুল কাসেম তেবরাণী (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের ফয়সালা করার জন্যে স্বীয় কুরসীতে আসন গ্রহণ করবেন তখন ওলামাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে আমার এলম এবং হেকমত এজন্যে দান করেছি যেন তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেই এবং তোমরা কী করেছ তার উপর গুরুত্ব না দেই।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু কাফেররা একথা বলতো, তোমরা পূর্ব পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ এজন্যে ভাগ্যাহত হয়েছ, কেননা কোরআন নাজিল হওয়ার পর থেকে সীমাহীন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছ। কাফেরদের এ অযৌক্তিক কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে যে (হে রসূল!) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে নয়; বরং মানব জাতির উপদেশের জন্যেই আমি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। অতএব কাফেরদের মিথ্যা কথায় আপনি ব্যথিত ও মর্মাহত হবেন না।

অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) আমি পবিত্র কোরআন এজন্যে নাজিল করিনি যে আপনি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাবেন। আর আপনার সম্প্রদায় ঈমান আনে না দেখে তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন, আদৌ এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আপনার দায়িত্ব হল শুধু আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া, তারা ঈমান আনয়নে সফল হোক, অথবা ব্যর্থ হোক।[২]

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

যার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তার হেদায়েতের জন্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক জানেন যে তাকে ভয় প্রদর্শন করলে সে সরল সঠিক পথে আসবে তার জন্যেই রয়েছে পবিত্র কোরআনের উপদেশ।

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَٰوَٰتِ الْعُلَى

"যিনি উঁচু আসমান এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিকট থেকেই পবিত্র কোরআন

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬০

নাজিল হয়েছে"।

অর্থাৎ যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা, তাঁরই কালাম পবিত্র কোরআন, অতএব, এই পবিত্র কালামের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। এর বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম বা বরখেলাফ করা শুধু যে সমীচিন নয় তাই নয়; বরং বিপজ্জনকও। এ বাক্যটির মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ঘোষণা করা হয়েছে কেননা, যিনি নিখিল বিশ্বের মালিক, যিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের স্রষ্টা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর মহান বাণী হল পবিত্র কোরআন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

"আরশে অধিষ্ঠিত অতি দয়াময় তিনি"।[১]

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

আসমান জমীন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে, সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক। আসমানে রয়েছে অগণিত ফেরেশতা, রয়েছে বেশুমার নক্ষত্রপুঞ্জ। এমনিভাবে জমীনে রয়েছে বৃক্ষ-তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, সমুদ্র, নদী-নালা, মানব-দানব আর আসমান জমীনের মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ পাকের। সব কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং রিযক-দাতাও শুধু তিনিই। এর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই, এক কথায় আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র এক আল্লাহ পাকের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সব কিছুই রয়েছে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। সর্বত্র যথানিয়মে তাঁর বিধি-নিষেধ রয়েছে কার্যকর। আসমান জমীনের মাঝখানে রয়েছে মেঘমালা, বায়ু এবং পাখীরা। এসবের উপরও আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর রয়েছে।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

(আর ভূগর্ভে যা কিছু রয়েছে তা-ও আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন।)

ثرٰى শব্দটির অর্থ হলো কাঁদামাটি অর্থাৎ পাতাল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জমীনগুলো একটি মাছের পৃষ্ঠদেশ রয়েছে, আর মাছটি সমুদ্রের উপর। ঐ মাছটির লেজ এবং মাথা আল্লাহ পাকের আরশের নীচে একত্রিত।

অর্থাৎ সপ্ত আসমানের নীচে যে পাতাল রয়েছে, তার নীচে যা কিছু আছে, সব কিছুর মালিকই এক আল্লাহ পাক।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই জমীনের নীচে পানি রয়েছে। আর ঐ পানির নীচে পুনরায় জমীন। এর নীচে আবার পানি। এভাবে রয়েছে তারও নীচে পাথর এবং তার নীচে একজন ফেরেশতা রয়েছেন এবং তার নীচে রয়েছে একটি মাছ, যার দু'টিই বাহুই

১। আরশে অধিষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফে স্থান পেয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-২৬১-৬২ দ্রষ্টব্য

আরশ পর্যন্ত পৌঁছে। আর তার নীচে রয়েছে বাতাস এবং অন্ধকার। এ পর্যন্তই মানুষের জ্ঞান সীমিত। এরপর কি রয়েছে তা শুধু আল্লাহ্ পাকই জানেন।[১]

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

(আর তুমি যদি উচ্চস্বরেও কথা বল তবে তিনি যে গোপন ও গোপনতম বিষয় সম্পর্কেও খবর রাখেন।)

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং শক্তির কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অসীম এবং অন্তহীন জ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত গোপন বিষয় সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত থাকেন যে বিষয় এখনো কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি, যে কথা এখনো কারো অন্তরে ফুটে ওঠেনি আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকর করেন এবং তাঁকে উচ্চস্বরে ডাকেন তবে আল্লাহ্ পাকের এর প্রয়োজন নেই কেননা, তিনি গোপন ও গোপনতম বিষয় সম্পর্কে অবগত।

আল্লামা স্যানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো (হে রসূল!) যদি আপনি উচ্চস্বরে জিকর করেন অথবা নিম্নস্বরে- দু' অবস্থাই আল্লাহ পাকের জন্যে সমান, কেননা আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের سر বলা হয় সেই গোপন কথা যা মানুষ চুপিসারে অন্যকে বলে দেয়। আর اخفى হলো সেই গোপন কথা যা মানুষ তার মনের মধ্যে গোপন রাখে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেন, سر হল সেই গোপন কথা যা মানুষ তার অন্তরে গোপন রাখে।

আর اخفى হল সে কথা যা আল্লাহ্ পাক ভবিষ্যতে তার অন্তরে সৃষ্টি করবেন। এখন কিছুই জানা নেই যে আগামীকাল আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মনের গহনে কোন কথা আসবে, আজ মনে যে গোপন কথা আছে, সে সম্পর্কে আমরা অবগত থাকি। কিন্তু যে কথা ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক অন্তরে সৃষ্টি করবেন, সে সম্পর্কে আমরা অবগত নই। অতএব, আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই, আমাদের অন্তরে আজ যে গোপন কথা রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আজ যেভাবে অবগত, ঠিক তেমনি যে কথা ভবিষ্যতে গোপন রাখব, সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত।

আলী এবনে তালহার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

سر সেই গোপন কথা যা মানুষ তার অন্তরে গোপন রাখে। আর اخفى হলো সে কথা যা মানুষ নিজেও জানেনা, আগামীতে সে কি করবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৫৫

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, سر সে কথা যা তোমরা মানুষ থেকে গোপন রাখ। আর اخفى হল মানব মনের ওয়াসওয়াসা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে سر শব্দের অর্থ হল সে কাজ মানুষ যা করার সংকল্প গ্রহণ করে। আর اخفى হল সে ধারণা যা মানুষ মনে মনে পোষণ করে কিন্তু তা কার্যকর করার সংকল্প গ্রহণ করেনা।

যায়েদ এবনে আসলাম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাক গোপন কথা সমূহ জানেন এবং নিজের বন্দাদের থেকে সে কথা গোপন রাখেন, কারো নিকট গোপন রহস্য উদঘাটন করেন না।

সুফি-সাধকদের ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের سر এবং اخفى সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরকারের অভিমত এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হল তবে সুফি সাধকগণ এর ব্যাখ্যা করেন ভিন্ন দৃষ্টিতে।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রয়েছে, তার পাঁচটি অবস্থানের মধ্যে দু'টির নাম হল سر এবং اخفى। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানব অন্তর যখন পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়, তখন সে তার কাশ্‌ফ দ্বারা আরশ পর্যন্ত দেখতে পায়। মানব দেহের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই অসাধারণ ক্ষমতা দান করেন। সে পাঁচটি অবস্থানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, ক্বলব, রুহ, ছের, খফী, আখফা। হযরত আদম (আঃ)-এর বেলায়েতের নূর সমূহের অবস্থান ছিল ক্বলব, আর নূহ (আঃ)-এর ছিল রুহ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বেলায়েতের অবস্থানও ছিল রুহ। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি জ্যোতি বিকীরণের স্থান ছিল سر আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বেলায়েতের যে নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে তার অবস্থান ছিল খফী। আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর বিকীরণের স্থান ছিল আখফা।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

তিনি আল্লাহ পাক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর জন্যেই রয়েছে উত্তম নাম সমূহ।

যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সৃষ্টি-জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য থাকতে পারেনা। আর তাঁর জন্যেই রয়েছে সকল উত্তম নাম।

اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।[১]

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى

১। তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৯ পৃষ্ঠা ১৮৭-৯২ দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের বর্ণনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে হযরত মূসা (আঃ) জালেম ফেরাউনের মোকাবেলা করেছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তার বিস্ময়কর ঘটনা এ পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে এ মর্মে যে হযরত মূসা (আঃ)-কে রেসালত ও নবুওয়্যতের দায়িত্ব অর্পণের পর তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং বহু বিপদের মোকাবেলা করতে হয়। তিনি জালেম ফেরাউনের মোকাবেলায় অত্যন্ত ছবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। (হে রসূল!) নবুওয়্যত ও রেসালতের যে মহান দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পিত হয়েছে তা পালনের ক্ষেত্রে আপনাকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব আপনি ছবর অবলম্বন করুন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (সূরা আহকাফ)

"অতএব, (হে রসূল!) আপনি ছবর অবলম্বন করুন যেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ ছবর অবলম্বন করেছিলেন"।

অবশেষে যেভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছিলেন ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকেও মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। ইতিহাস সাক্ষী! বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে মক্কা-বিজয় দান করেছিলেন।

ইমাম রাজী (রঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের কথা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আঃ)-কে জালেম ফেরাউনের মোকাবেলায় অনেক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তাঁর ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে।[১]

এরশাদ হয়েছেঃ وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى

"(হে রসূল!) আপনার কাছে কি মূসার খবর পৌছেছে"? কিভাবে তিনি কঠিন বিপদে ছবর অবলম্বন করেছিলেন? অতএব আপনিও তাঁর ন্যায় ছবর অবলম্বন করুন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত মওলানা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৩৩
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৪

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘটনার অনুরূপ, তাই তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার মধ্যে আরও একটি হেকমত রয়েছে। পবিত্র কোরআনের পাঠক বা শ্রোতারা যাতে বুঝতে পারে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন এবং রেসালতের দায়িত্ব পালন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ঘটনা নয় এবং তাঁর প্রতি ওহী নাজিল হওয়া তথা আল্লাহ পাকের মহান বাণীর অবতরণও নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে যুগে যুগে বহু নবী রসূল আগমন করেছেন এবং তাঁদের প্রতি আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাজিল হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাজিল হয়েছে। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে যেমন তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছে তাতেও তৌহীদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

إِذْ رَأَىٰ نَارًا

"যখন তিনি আগুন দেখলেন"।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ ঘটনার বিবরণ এভাবে লিখেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) মাদায়েনবাসী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। দশ বছর যাবত তিনি মাদায়েনে অবস্থান করেন। এরপর হযরত মূসা (আঃ) সপরিবারে মিসরের দিকে রওয়ানা হন। কেননা মিসরে তাঁর মাতা এবং ভগ্নী ছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী। তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে যায়। অত্যন্ত অন্ধকার এবং ভয়ংকর শীত। ছাগলের যে পাল তাঁর সঙ্গে ছিল তাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময়ে তাঁর স্ত্রীর প্রসব-বেদনা ওঠে। এমন অবস্থায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। তখন ডান দিকে পাহাড়ের উপর একটু অগ্নি দেখতে পেলেন।

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

"তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, "তোমরা এখানে থাক"।

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ

"আমি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি তোমাদের জন্যে তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো, অথবা আগুন পর্যন্ত পৌঁছে পথের সন্ধান পেয়ে যাব"।

আলোচ্য আয়াতে امْكُثُوا (অর্থাৎ তোমরা এখানে থাক) দ্বারা বহু বচন বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ এই যে হযতো স্ত্রী ব্যতীত তাঁর সঙ্গে আরো অন্যান্য সাথী ছিলেন, অথবা যেহেতু তাঁর স্ত্রী আল্লাহর নবী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যা ছিলেন তাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন-কল্পে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি যে অগ্নি দেখেছিলেন তা পার্থিব অগ্নি ছিল

না, বরং তা ছিল আল্লাহ পাকের নূর। হযরত মূসা (আঃ) তাকে জাগতিক অগ্নি মনে করেই স্ত্রীকে বলেছিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষমান থাক আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى

"এরপর যখন মূসা (আঃ) অগ্নির নিকট আসেন তখন তাঁকে (আল্লাহ পাকের তরফ থেকে) ডাক দিয়ে বলা হয়, "হে মূসা! আমি তোমার প্রতিপালক"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) সেখানে পৌঁছে এক বিস্ময়কর বৃক্ষ দেখলেন, যা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সবুজ ছিল আর বৃক্ষটি দাউ-দাউ করে অগ্নি ছড়াচ্ছিল, আর অগ্নি যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই বৃক্ষটি সজীব এবং সতেজ হয়ে উঠছিল।[১]

আলোচ্য ঘটনায় একথা বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) কিছু শুষ্ক ঘাস নিয়ে অগ্নির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু অগ্নি দূর হয়ে গেল। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে হযরত মূসা (আঃ) অগ্নির যত নিকটবর্তী হতেন তা তত দূরে চলে যেত, আর যখন হযরত মূসা (আঃ) পেছনের দিকে ফিরে আসতেন তখন অগ্নি নিকটবর্তী হতো। এমন অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সেখানে ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠের আওয়াজ শ্রবণ করলেন। তখন তাঁর মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা আসল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওহাব এবনে মোনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আঃ) একটি বৃক্ষ থেকে এই ডাক শ্রবণ করলেন যে আমি তোমার প্রতিপালক, মূসা (আঃ) বুঝতে পারেননি এ আহবানকারী কে? এজন্যে তিনি জবাব দিলেন আমি তোমার আওয়াজ শ্রবণ করছি কিন্তু আমি জানিনা তোমার স্থান কোথায়, তুমি কোথায়। তখন প্রতি-উত্তরে আওয়াজ আসলো আমি তোমার উপরে আছি, আমি তোমার সাথে আছি, আমি তোমার সম্মুখে আছি, আমি তোমার পেছনেও আছি, আমি তোমার এত নিকটে যে তুমিও তোমার এত নিকটে নও। তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিশ্বাস হল তিনি আল্লাহ পাকই, তাঁরই এ শান।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে যখন আহবান জানানো হয় তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে কথা বলেছেন? তখন পুনরায় আওয়াজ আসল, আমিই আল্লাহ, ঐ মুহূর্তে শয়তান হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে ওয়াছওয়াছা দিল যে হয়তো আমি শয়তানের কথা শ্রবণ করছি, কিন্তু অনতিবিলম্বে বলে উঠলেন, নিশ্চয় এটি আল্লাহ পাকের মহান বাণী। কেননা ঐ কথাগুলো আমি প্রত্যেক দিক থেকে এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শ্রবণ করছি। আর শয়তানের কাজ তা হতে পারে না। এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে সর্ব প্রথম আধ্যাত্মিকভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানো হয়। এরপর তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে তিনি ঐ মহান বাণী শ্রবণ করেছেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৩৬৪
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৬৬

এ ঘটনাকে কোন কোন তফসীরকার এভাবে লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন পবিত্র প্রান্তরে অগ্নির সন্ধানে বের হলেন তখন এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি বৃক্ষ তাতে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে আর আগুন যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চারিদিকে ছড়াচ্ছে, বৃক্ষটি ততই সজীব হয়ে উঠছে, আর বৃক্ষটি যতই সজীব হচ্ছে অগ্নির তীব্রতা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত মূসা (আঃ) আশা করলেন যে ঐ বৃক্ষের কোন ডালা ভেঙ্গে পড়তে পারে তাই তিনি বৃক্ষটির কাছে যেতে চাইলেন, কিন্তু তিনি বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হলে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না এ কারণে যে তিনি যত বেশী বৃক্ষের নিকট যাচ্ছেন বৃক্ষটি ততই দূরে সরে যাচ্ছে। যখন তিনি থেমে যান তখন বৃক্ষটি তাঁর নিকটবর্তী হয়। ঐ সময়টি তাঁর জন্যে যেমন ছিল বিস্ময়কর তেমনি ভয়ের। ঠিক ঐ মুহূর্তে তিনি শ্রবণ করেনঃ

إِنِّىٓ أَنَا رَبُّكَ

"আমিই তোমার প্রতিপালক"।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন শ্রবণ করলেন যে তাঁকে কেউ হে মূসা! বলে ডাকছেন তখন তিনি সে ডাকে সাড়া দিয়ে বলেছেন 'লাব্বায়েকা' আমি হাযির আছি, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাইনা, অথচ তোমার আহবান শ্রবণ করি। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে ঐ জবাব দান করলেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করলেনঃ

إِنِّىٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

"নিশ্চয় আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা, তুমি তুয়ার ময়দানে উপস্থিত রয়েছ'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, নগ্ন পা হওয়া তা'যীমের নিদর্শন, এজন্যে জুতা খুলে ফেলার হুকুম দেয়া হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ জুতা খুলে ফেলার হুকুম এজন্যে দেয়া হয়েছিল যে জুতাগুলো মৃত গাধার চামড়া দ্বারা তৈরী ছিল। আর তফসীরকার একরামা এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, নগ্ন পা হওয়ার হুকুম এজন্যে দেয়া হয়েছে যে ঐ পবিত্র ভূমির মাটি থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর কদম যেন বঞ্চিত না হয়, আর সেই বরকতময় জমীনের বরকত যেন তিনি লাভ করেন। তাই হযরত মূসা (আঃ) অনতিবিলম্বে জুতা খুলে ঐ পবিত্র-ভূমির বাইরে ফেলে দেন।

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

নিশ্চয় তুমি পবিত্র তুয়ার ময়দানে রয়েছ, আর এ স্থানের পবিত্রতার দাবী হল নগ্ন পা হওয়া। তুয়া ঐ স্থানটির নাম ছিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তুয়া শব্দটির দ্বারা সেই আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার কারণে হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নবুওয়্যাতের

জন্যে মনোনীত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আল্লাহ্ পাকের মহান দান যা তিনি চেষ্টা করে লাভ করতে পারতেন না। আল্লাহ্ পাক দয়া করে সেই বিস্তৃত জমীনকে অতিক্রম করার তৌফিক তাঁকে দান করেছিলেন, যার বিস্তৃতি ছিল সুদীর্ঘ। হযরত মূসা (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সুফি-সাধকগণ আধ্যাত্মিক জগতের একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

আধ্যাত্মিক সাধনায় যদি কেউ উচ্চতম স্থানে উন্নতি করতে চয় তবে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনার পর আল্লাহ্ পাকের আরশ পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনা আছে। কেননা, জমীন থেকে আরশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু শায়খে কামেলের নির্বাচন, মনোনয়ন এবং তাওয়াজ্জুহ প্রদানের মাধ্যমে সেই সুদীর্ঘ পথ সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব হয়। হযরত মওলানা রুমী (রঃ) তাঁর একটি কবিতায় এ সত্যেরই সন্ধান দিয়েছেনঃ

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ - سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾ اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ
اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ﴿١٤﴾ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ
اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ
لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾
قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا
مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ
تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾
وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
طَغٰى ﴿٢٤﴾

তরজমা

(১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি অতএব, যা আদেশ দেয়া হয় তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

(১৪) আমিই যে আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই অতএব, শুধু আমারই

এবাদত কর আর আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম কর।

(১৫) নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে। (কবে আসবে) আমি তা গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।

(১৬) অতএব, যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস করেনা ও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে (যদি তা করে) তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

(১৭) হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে এটি কি?

(১৮) মূসা বললেন এ যে আমার লাঠি; এর উপর আমি ভর করি এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমার বকরীগুলোর জন্যে গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটি আমার অন্যান্য কাজে লাগে।

(১৯) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে মূসা! তুমি তা নিক্ষেপ কর।

(২০) এরপর মূসা লাঠিটিকে নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা সর্পে রূপান্তরিত হয়ে ছুটতে লাগলো।

(২১) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তুমি তাকে ধরে ফেল, ভয় করোনা, আমি এখনই তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।

(২২) তোমার হাত বগলের সাথে মিলিত কর তা অত্যন্ত শুভ্র হয়ে বের হবে। এটি হবে দ্বিতীয় নিদর্শন।

(২৩) তা এজন্যে যে আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শন গুলোর কিছু।

(২৪) (হে মূসা!) ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে।

তফসীরুল কোরআন

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ হে মূসা! আমি তোমাকে নবুওয়্যত ও রেসালতের জন্যে মনোনীত করেছি, আমার বিশিষ্ট বন্দারূপে তোমাকে পছন্দ করেছি অতএব, তোমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশ আসবে তা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন, স্বীয় রসূল হিসেবে তাঁকে পছন্দ করেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়্যত সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না; বরং আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ

অতএব, তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ কর।

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى

নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, কোন উপাস্য নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই বন্দেগী করো।

আলোচ্য আয়াতে তৌহীদের শিক্ষা রয়েছে, সর্বপ্রকার এবাদত তথা শারীরিক, আর্থিক, মৌখিক, আন্তরিক- এক কথায় সবকিছুই হতে হবে এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের জন্যে।

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

"আর আমার স্মরণের জন্যে নামাজ কায়েম কর"।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নামাজ

ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক সাধারণ ভাবে এবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন আর এ আয়াতে নামাজের জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা সকল এবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ নামাজ হলো ইসলামের স্তম্ভ (বায়হাকী, মসনদ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এবং এবনে আসাকের সংকলিত একখানি হাদীস এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, নামাজ হলো ঈমানের নূর।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করেনঃ নামাজ। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ নামাজ পরিত্যাগ করা হল ঈমান এবং কুফরীর মধ্যকার অন্তরায়। মসনদে আহমদ এবং সুনানে এভাবেই হাদীস খানি হযরত বুরায়দাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় সংকলিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আ'স (রাঃ) বর্ণিত হাদীস আহমদ, দারেমী এবং বায়হাকী (রঃ) সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাজের পাবন্দী করবে তার জন্যে এই নামাজ নূর হবে এবং নাজাতের জন্যে দলিল হিসেবে কার্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পাবন্দী করবে না তার জন্যে নামাজ নূরও হবে না এবং নাজাতের মাধ্যম হিসেবেও কার্যকর হবেনা। সে কেয়ামতের দিন কারুণ, ফেরাউন, হামান এবং উবাই এবনে খালফের সঙ্গী হবে।

আবদুল্লাহ এবনে শাকীক বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন কাজকে কুফরী বলে মনে করতেন না। এই সকল হাদীসের ভিত্তিতেই ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করেছে সে কাফের হয়ে গেছে।

সকল এবাদতের মধ্যে নামাজ হল শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হয়তো এই যে নামাজ শুধু একটি এবাদতই নয়; বরং সকল এবাদতের বৈশিষ্ট্য এতে রয়েছে বিদ্যমান। রোযা একটি উত্তম এবাদত, কারণ এর দ্বারা নফছে আম্মারাহ দমন হয়। যাকাতের দ্বারা অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা হয় এবং হজ্জ সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু নামাজ এমন এক এবাদত যার দ্বারা আল্লাহ পাকের হুকুম পালন হয় এবং সওয়াবও অর্জিত হয়। এজন্যে আল্লাহ পাক এ আয়াতে لِذِكْرِىْ (আমার স্মরণের উদ্দেশে) বাক্যাংশ দ্বারা নামাজের উদ্দেশ্যও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

لِذِكْرِىْ (আমার স্মরণের জন্যে) বাক্যাংশের মর্মার্থ হল, তোমরা নামাজ এজন্যে কায়েম কর যেন আমাকে তোমরা নামাজের মধ্যে স্মরণ কর। সম্পূর্ণ নামাজই আল্লাহ পাকের স্মরণের একটি আমল। নামাজের মধ্যে বন্দা তার মন, রসনা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমর্পণ করে দিয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় হয়ে পড়ে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ذكرى বাক্যাংশের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে; যেহেতু আমি নামাজের কথা আমার সকল কিতাবে উল্লেখ করেছি এবং সকল কিতাবেই নামাজ কায়েম করার হুকুম দিয়েছি সুতরাং তোমরাও নামাজ কায়েম কর। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ذكرى এর অর্থ এই বলেছেন যে, তোমরা নামাজ কায়েম কর তাহলে আমি তোমাদের প্রশংসা করে এবং তোমাদের প্রতি রহমত করে তোমাদেরকে স্মরণ করবো।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আমি আমার বন্দার ধারণার কাছেই থাকি এবং সব সময় আমি তার কাছেই থাকি। যখন সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে একা একা স্মরণ করি, আর যখন সে লোকজনের সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে এমন এক জামাআতের মধ্যে স্মরণ করি যা তার তার সমাবেশের চেয়ে ভাল জামাআত হয়ে থাকে (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের জামাআত)। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন যে, নামাজ তখন কায়েম কর যখন নামাজের কথা স্মরণ হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে গেছে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার দরুণ, তার কাফ্ফারা হলো, যখন মনে পড়বে তখনই নামাজ পড়ে নেবে (অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে এছাড়া আর কোন কাফ্ফারা নেই)। (বোখারী এবং মুসলিম)

হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ নিদ্রিত ব্যক্তি দোষী নয়; বরং জাগ্রত ব্যক্তি (নামাজ আদায় না করার কারণে) অপরাধী। যে-ব্যক্তি কোন নামাজ ভুলে যায় অথবা নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, যখন (ছুটে যাওয়া) নামাজের কথা মনে পড়বে তখন তা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নেবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ[1]

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৬৭-৬৮

অর্থাৎ আমাকে স্মরণের জন্যে নামাজ কায়েম কর। (মুসলিম শরীফ)

বস্তুতঃ তৌহীদের প্রতি ঈমানের পর সর্বপ্রথম বিষয় হলো নামাজ। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, আল্লাহ্ পাকের সাথে তাঁর বন্দার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম হলো নামাজ। মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার সমীপে বিনীত ভাবে দন্ডায়মান হয় নামাজের সময়। তাঁর স্মরণে বিভোর ও তন্ময় হয়ে থাকে নামাজে রত হয়ে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শপথ গ্রহণ করে, তাঁর মহান দরবারে চরম ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে নামাজের মাধ্যমে। অন্তরের সকল ভক্তি শ্রদ্ধা, আল্লাহর প্রতি প্রেমের গভীরতা, তন্ময়তা ও মনের সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে মানুষ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হয়, তখন সে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়, তার হৃদয়-মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, সে তাঁর সমীপে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নামাজ

আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে রত হতেন তখন তাঁর অন্তর থেকে এমন শন্ শন্ শব্দ উত্থিত হতো যেন কোন তামার কড়াই যা পানিতে ভরপুর রয়েছে এবং প্রচন্ড অগ্নির উপর থাকার কারণে তা থেকে শব্দ হয়ে থাকে।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নামাজ

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর অবস্থা এই ছিল যে, তাঁরা যখন নামাজে দন্ডায়মান হতেন তখন মনে হতো যেন একটি প্রাণহীন কাষ্ঠখন্ড দন্ডায়মান রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যুবায়ের (রাঃ) যখন কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে নামাজ আদায় করতেন, বিশেষ করে যখন সেজদায় রত হতেন, তখন পবিত্র কা'বার বহু কবুতর তাঁর পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট হতো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর নামাজ

হযরত আলী (রাঃ) যখন ওযু শেষ করে উঠতেন, তখন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথর কম্পমান থাকতো, চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। তাঁকে এমনিভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে দেখে একবার তাঁর খাদেম বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলোঃ হুজুর! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? তিনি খাদেমকে বললেনঃ তুমি জান না? আমি কোন্ দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে যাচ্ছি? সেই সর্বশক্তিমান আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে উপস্থিত হতে চলেছি, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা, যিনি বিশ্ব নিয়ন্তা, যিনি শেষ বিচারের মালিক, এমন অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে উপায় কি?

বস্তুতঃ যারা আল্লাহর ভয়ে এতখানি ভীত-সন্ত্রস্ত হন এবং আল্লাহর ধ্যানে এমনিভাবে তন্ময় হয়ে নামাজে রত হন, তাদের জীবন-সাধনা যে সার্থক ও সুন্দর হবে, একথা

সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে।

আবদুল্লাহ এবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নামাজ

একবার হযরত আবদুল্লাহ এবনে যুবায়ের (রাঃ) নামাজে রত ছিলেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় একটি সর্প এসে হাযির হল। শিশুটি চিৎকার করতে লাগলো। শিশুর চিৎকার শুনে তার মাতা উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকও হাযির হল। সর্পটিকে লাঠির আঘাতে মারা হল। এত সব কিছু হয়ে গেল, কিন্তু তিনি নামাজেই রত ছিলেন। তিনি নামাজে এতটা তন্ময় ছিলেন যে, তাঁর চারপার্শ্বে কি ঘটেছে তার সংবাদও তিনি পেলেন না। নামাজ শেষে সমবেত লোকদেরকে তাদের উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন। তাঁর স্ত্রী এর জন্যে অনুযোগের সুরে কিছু বলতে চাইলে তিনি বললেনঃ দোযখের মধ্যে পাপী তাপী মানুষের শাস্তির জন্যে যে বিষাক্ত সর্প অপেক্ষা করছে সেগুলোর কথা স্মরণ করে এই সর্পের কথা বিস্মৃত হয়েছি। এটি কোন রূপকথা নয়, কল্প কাহিনী নয়, বরং বাস্তব ঘটনা।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের নামাজ

এমনি একটা ঘটনা ঘটে হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ)-এর জীবনেও। তিনি দৈনিক ১ হাজার রাকাআত নফল নামাজ আদায় করতেন। একবার তিনি তাঁর গৃহে নামাজ আদায় রত ছিলেন। ঘটনাক্রমে বাড়ীতে আগুন ধরে গেলো। চারিপার্শ্বের লোক এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু তাঁর তন্ময়তায় এতটুকু লাঘব হলো না। নামাজের পর শুধু জিজ্ঞাসা করলেন কি কারণে এত গোলমাল? পরে তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হল।

বস্তুতঃ যারা প্রেমময় আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা, যারা করুণাময়ের অনন্ত অসীম করুণার জন্যে কৃতজ্ঞতায় বিভোর, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, তাঁরা যখন নামাজে দন্ডায়মান হন, তখন তাঁরা একান্তভাবে আল্লাহর দরবারে হাযির হন। এ জগৎ ও জগতের সব কিছু পরিত্যাগ করে ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হন, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একখানি হাদীসে এরশাদ করেছেনঃ

ان تعبد الله كانك تراه

তুমি এমনিভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ, যদি তোমার মনের অবস্থা এমন না হয় যে, তুমি তাঁকে দেখতে পারছ, তবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। মনে এই ভাব সৃষ্টি হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

মূলত যাঁরা এমনিভাবে নামাজ আদায় করেন, গভীরভাবে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হন, তাঁদের সাফল্য ও কামিয়াবীর ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

আর এমন নামাজের জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বৃক্ষের একটা শুষ্ক ডালা জোরে টেনে আনলেন, ফলে তাতে যা পাতা ছিল সবই ঝরে গেল। তিনি তখন এরশাদ

করলেনঃ যারা নামাজ আদায় করে তাদের গুনাহ এভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। এরপর তাঁর এই বাণীর প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেনঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

"তোমরা নামাজ কায়েম কর দিনের প্রথম ভাগে শেষভাগে এবং রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয় ভাল মন্দকে দূরীভূত করে দেয়, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে এটি উত্তম উপদেশ"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বন্দার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ (অবশ্য করণীয়) ঘোষণা করেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু সুসম্পন্ন করে, যথাসময়ে খুশু ও খুজুর সাথে নামাজ আদায় করে, তার পাপ মোচন করা, তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ পাকের হক্ব হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে, যে নামাজের ব্যাপারে অন্যথা করে, তাকে ক্ষমা করার ও মুক্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কোন যিম্মাদারী থাকেনা। ইচ্ছা করলে তিনি তার শাস্তি বিধান করতে পারেন, আর তাঁর মর্জি হলে, তাকে ক্ষমাও করতে পারেন।

আর একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ তিনটি বস্তু কাফ্ফারা স্বরূপ, আর তিনটি বস্তু দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয় আর তিনটি বস্তু হলো মুক্তিদানকারী। কাফ্ফারার তিনটি বস্তু হলঃ

(এক) তুহিন শীতের মধ্যেও উত্তম রূপে ওযু সুসম্পন্ন করা।

(দুই) একটি নামাজের পর আরেকটি নামাজের জন্যে অপেক্ষা করা।

(তিন) জামাআতের নামাজের জন্যে বের হওয়া।

আর উচ্চ মর্যাদার কারণ তিনটি বস্তু হলঃ

(এক) মানুষকে আহার্য দান করা।

(দুই) একে অন্যকে অধিক পরিমাণে সালাম দেয়া।

(তিন) রাত্রি বেলায় মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে তখন নামাজ আদায় করা।

আর মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু হলঃ

(এক) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সুবিচার করা, (দুই) দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া, (তিন) গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করা। আর একখানি হাদীসে রয়েছে একমাত্র সেজদাই এমন আমল, যা দ্বারা বন্দা আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এটি অত্যন্ত পছন্দনীয়। কেননা, তাঁর সম্মুখে সেজদায় রত হয়ে বন্দা স্বীয় মুখমণ্ডলটি মাটি মাখা করে ফেলে।

নামাজ মোমেনের মে'রাজ

এখানে উল্লেখ্য, নামাজের মাধ্যমেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সেরা, স্রষ্টার প্রতিনিধি মানব জাতির জন্যে নামাজের মাধ্যমে আসে এক সুবর্ণ সুযোগ। সে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে পারে, তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الصلواة معراج المؤمنين

নামাজ হলো মোমেনদের মে'রাজ। ঐতিহাসিক শবে মে'রাজে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়েছিলেন তখন আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান স্বরূপই তিনি নিয়ে এসেছিলেন নামাজের এই বিধান। তাই নামাজ শবে মে'রাজের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারণিক, আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া ও তাঁর নৈকট্য লাভের এক অপূর্ব সুযোগ। এ যেন বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে বিশ্ব মানবের জন্যে শবে মে'রাজের উপঢৌকন, যা বহন করে এনেছেন বিশ্ব নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যারা নামাজের প্রতি অবহেলা করে, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে তারা যেন বিশ্ব নিয়ন্তার উপঢৌকনের প্রতিই অবহেলা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভও হয় নামাজের মাধ্যমে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء

বন্দা যখন সেজদায় নিরত থাকে তখনই তার প্রতিপালকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। অতএব সেজদারত অবস্থায় তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া কর। (মুসলিম শরীফ)

স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মনের সকল কাকুতি-মিনতি, চরম ভক্তি-অনুরক্তি প্রকাশ করার এবং তাঁর স্মরণে তন্ময় ও বিভোর থাকার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে, আর এজন্যেই এর বাস্তব ব্যবস্থা করা হয়েছে নামাজের মাধ্যমে, এরশাদ হয়েছেঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমাকে স্মরণ করার জন্যে নামাজ কায়েম কর"। তাই যারা আল্লাহ্ পাককে যত বেশী স্মরণ করে তারা নামাজে ততবেশী তন্ময় থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের স্মরণের রসাস্বাদন করতে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

قرة عينى فى الصلوة

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নয়ন মনের পরিতৃপ্তি নামাজ

আমার নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হল নামাজ। আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত আল্লাহ্ পাকের দরবারে নামাজে দন্ডায়মান থাকতেন, দীর্ঘ

সময় পর্যন্ত তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন বলেই তাঁর চরণ যুগল ফুলে উঠতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের কথা। এই নামাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সময় সেজদারত থাকতেন যে, আমার ভয় হতো হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণবায়ু উড়ে গেছে, হয়তো তিনি এ নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন, তখন আমি তাঁর পায়ের অঙ্গুলী স্পর্শ করে দেখতাম এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতাম।

বস্তুতঃ এজন্যেই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ নামাজের সাধনা নিতান্ত সহজ নয়, বরং অত্যন্ত কঠিন। এর জন্যে চাই মনের একাগ্রতা, চাই তন্ময়তা। আল্লাহ পাকের প্রতি পরম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁর স্মরণে বিভোর ও মুগ্ধ থাকা, তাঁর আনুগত্যের জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং নিজের দীনতা হীনতা প্রকাশ করা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَٰشِعِينَ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ (সূরা বাকারা)

"এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয় নামাজ অত্যন্ত কঠিন, তবে যারা বিনয়ী, যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, যারা একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে তাদের জন্যে অবশ্য নামাজ কঠিন নয়"।

অতএব, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালীন জিন্দেগীর প্রতি যার বিশ্বাস যত বেশী হবে নামাজেও তার একাগ্রতা ও তন্ময়তা ততবেশীই হবে।

রুগ্ন অবস্থায় নামাজ

এখানে একথাও উল্লেখ্য, নামাজই একমাত্র এবাদত যা কোন অবস্থাতেই মাফ হয় না; এর কোন বিকল্পও হয় না। কোন মুসলমান যদি অসুস্থ হয়, দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে অক্ষম হয় তবে উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামাজ আদায় করতে হবে। আর যদি তাতেও অক্ষম হয়, তবে শায়িত অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও নামাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি অজু করতে অক্ষম হয় তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে।

যুদ্ধ-রত অবস্থায় নামাজ

যদি যুদ্ধরত থাকে, তবে সে অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। শত্রুর মোকাবেলা করার সময় মুসলমানদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে, একদল নামাজের জন্যে ইমামের পশ্চাতে দন্ডায়মান হবে আর অন্যদল দুশমনের মোকাবেলা করতে থাকবে। দু' রাকাআত শেষ হলে, এই দল দুশমনের মোকাবেলায় চলে যাবে এবং অপর দল ইমামের পশ্চাতে হাযির হয়ে নামাজ আদায় করবে। যে কোন অবস্থায় নামাজ আদায় করতেই হবে। এ দায়িত্ব পালনে এতটুকু গাফলত বা অবহেলা করা চলবে না। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ নামাজে অলসতা মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য।

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى (সূরা নেসা)

"যখন মুনাফেকেরা নামাজে দন্ডায়মান হয় তখন তারা আলস্য করে"।

এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেনঃ নামাজ পরিত্যাগ করার পর সেই বেনামাজী ব্যক্তির মধ্যে এবং কুফরের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকেনা; বরং সে কুফরের সীমানায় পৌঁছে যায়। যে নামাজ আদায় করে সে যেন ঈমানের সুশীতল ছায়াতলে থাকে, পক্ষান্তরে যে নামাজের ব্যাপারে গাফলত করে সে যেন কুফরের উত্তপ্ত রৌদ্রে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

নামাজ ধর্মের খুঁটি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেছেনঃ

الصلوة عماد الدين

নামাজ হলো ধর্মের খুঁটি। এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ

فمن هدمها فقد هدم الدين

যে ব্যক্তি এ খুঁটিকে বিনষ্ট করে, সে যেন ধর্মকেই বিনষ্ট করে ফেললো (কানজুল উম্মাল)। অর্থাৎ ইসলামের ইমারত যে পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হলো নামাজ। অতএব, যে নামাজের ব্যাপারে গাফলত করে নামাজ আদায়ে অবহেলা করে, সে যেন ইসলামের এ ইমারতকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করে।

আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা ও জবাব

আধুনিক মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, নামাজের জন্যে এত তাগিদ কেন? পবিত্র কোরআনের শতাধিক আয়াতে এর প্রতি এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেখতে পাই আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে। কোন ব্যক্তি যদি কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করতে চায়, তবে তার সর্বপ্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। সে দেশ বা সে রাষ্ট্রের সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়, তার আইন-কানুন মেনে চলতে আপত্তি জানায়, তথা বিদ্রোহী হয় তবে সে ব্যক্তিকে নাগরিক অধিকার দেয়া হয় না। এমনকি তার অস্তিত্বও সহ্য করা হয় না, তাকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করা হয়না। এটি সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হয় না কোথাও।

নামাজের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের, তাঁর আইন-কানুন মেনে চলার সংকল্প প্রকাশ করে স্বীয় দীনতা হীনতা প্রকাশ করে। মনের কাকুতি-মিনতি জানিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করে।

নামাজে দন্ডায়মান হয়েই সূরায়ে ফাতেহায় মানুষ সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এ আনুগত্যের শপথ করে এভাবে- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই বন্দেগী করি, তোমার-ই সমীপে আত্মসমর্পণ করি আর তোমার-ই আইন-কানুন মেনে চলার শপথ করি, আর এ গুরু দায়িত্ব পালনে তোমার-ই সাহায্য কামনা করি"।

কিন্তু যারা নামাজ আদায় করেনা তারা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা। যিনি এই বিশাল আসমান এই সুবিস্তৃত জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে, সমগ্র বিশ্ব মানবকে, যিনি মানুষকে লালন পালন করছেন, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত মানুষ অহরত ভোগ করছে, তাঁর প্রতি আনুগত্যের অভাব হলে, তাঁর আইন-কানুন মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানালে, তার শাস্তি বিধান কি অযৌক্তিক? তার ব্যাপারে কোন বিধি-বিধান প্রবর্তন করা কি অনুচিত? অবশ্যই নয়, এ জন্যেই ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে, কোন মুসলমান নামধারী ব্যক্তি নামাজ আদায় না করলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী রাখতে হবে। অবশ্য এ অবস্থা শুধু তখনই সম্ভব যখন কোন দেশে ইসলামী অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তিত হয়। ঠিক যেভাবে কোন লোক সম্পর্কে যখন এই সন্দেহ হয় যে, লোকটি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করা হয়, তাকে মুক্ত রাখা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রে সমীচীন মনে করা হয় না। তবে যিনি ত্রিভুবনের মালিক, যিনি সর্বশক্তির মূল উৎস, তাঁর অবাধ্য হলে, তাকে কোন্ যুক্তিতে ক্ষমার যোগ্য মনে করা হবে?

এই বিধান তাদের জন্যে যারা কালেমায়ে তাইয়েবা পাঠ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না, নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করেনা, আল্লাহ পাক তাদের দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতে অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরকালীন জিন্দেগীতেই হবে তাদের বিচার। নামাজের এমনি গুরুত্ব রয়েছে বলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة

সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি নামাজের হিসাব শুদ্ধ হয় তবে অন্য আমলও শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে নামাজ অশুদ্ধ হলে অন্য সকল আমলই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হবে।

সর্বোত্তম আমল নামাজ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সর্বোত্তম আমল কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জবাবে এরশাদ করলেনঃ নামাজ। ঐ ব্যক্তি পুনরায়

জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ নামাজ। লোকটি পুনরায় অনুরূপ প্রশ্ন করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বারও উত্তর দেন নামাজ। যখন লোকটি চতুর্থ বার সেই একই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহর পথে জেহাদ। (এবনে হাব্বান)

তেবরানীতে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

واعلموا ان افضل اعمالكم الصلوة

"জেনে রেখো নামাজই তোমাদের সর্বোত্তম আমল"।

নামাজের দৃষ্টান্ত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কারও বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে যদি কোন নহর প্রবাহিত হয়, আর সে তাতে দৈনিক ৫ বার গোসল করে, তবে কি তার দেহে কোন প্রকার ময়লা বা অপবিত্রতা থাকতে পারে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বললেনঃ না। তখন প্রিয়নবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ পাঁচবার নামাজের দৃষ্টান্তও তেমনি। পাঁচবার নামাজ আদায়কারীরও কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। নামাজ গুনাহকে মুছে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

নামাজ গুনাহ দূর করে

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

নামাজ তার পূর্বের গুনাহ সমূহকে (সগীরা গুনাহ) দূরীভূত করে দেয় (কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ এবং জুমআর নামাজ পরবর্তী নামাজ ও জুমআ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালের কবীরা গুনাহ ব্যতীত সগীরা গুনাহ সমূহের জন্যে কাফ্ফারা (মুসলিম)। অর্থাৎ এই নামাজ সমূহ সগীরা গুনাহকে দূরীভূত করে।

নামাজ পাপ প্রতিরোধক

নামাজের মাধ্যমে শুধু যে সগীরা গুনাহ মাফ হয় তাই নয়, বরং নামাজ অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট। এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(সূরা আনকাবুত)

"এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, নামাজ ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ সমূহ থেকে মানুষকে বিরত রাখে"।

কেননা, নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের, তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের শপথ গ্রহণ করা হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের প্রতিজ্ঞা করা হয়। বিশেষ করে, নামাজের প্রারম্ভেই সূরা ফাতেহায় "সীরাতাল মুস্তাকীম" বা সরল সঠিক পথ লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করা হয়। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি নিয়ম-কানুন মোতাবেক, আরকান-আহকাম ঠিক করে যথা নিয়মে নামাজ আদায় করবে সে নামাজ তাকে অবশ্যই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ থেকে পাপ-পংকিলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করবে। মানুষ যখন নিজেকে একান্ত ভাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করে, মন যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ-দুঃখের চিন্তায় যখন মানব মন চিন্তিত হয়, মনের এ অবস্থা নিয়ে যখন মানুষ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত বেঁধে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হয়, আরও অধিক বিনয় প্রকাশ করার নিমিত্তে আল্লাহর দরবারে রুকু করে। এমনকি অবশেষে আত্মসমর্পণের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সেজদারত হয়, তখন এই নামাজ মানুষকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে, পাপ-পংকিলতা থেকে বিরত রাখে। এটি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি বাস্তব সত্য।

আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপরাধ দমনের সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় শান্তিকামী মানুষ প্রায় নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই চলছে হানা-হানি, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, অরাজকতা, অবিচার, ব্যাভিচার, দুর্নীতি এক কথায় মানবতার চরম অবমাননা হচ্ছে অহরহ। মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে। বর্বরতার যুগ তথা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও এই তথাকথিত সভ্যতার যুগের আধুনিক মানুষ হার মানিয়েছে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের সকল জাগতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করছে পৃথিবীর অগণিত মানুষ। জেল হাজত এমনকি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত আধুনিক যুগের চরম অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করতে পারেনি।

কিন্তু এ পর্যায়ে আসমানী ব্যবস্থা তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি আজও মানুষ গাফেল। নিরাশ হবার কোন ন্যায্য কারণ নেই। আল্লাহ পাক মানুষের চরিত্রকে সু-সংহত করার তথা নৈতিক মান উন্নত করার যে ব্যবস্থা প্রদান করছেন, তার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করা সুকঠিন। তাই পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হলো নামাজ পাপ প্রতিরোধক। অন্যায় অবিচারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে গ্রহণ করতে হবে নামাজের কর্মসূচী।

আধুনিক বিশ্বে সুখ-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনে শান্তি নেই। জীবন দুর্বিষহ, প্রাণ ওষ্ঠাগত কেননা, মানুষই মানুষের জন্যে আতঙ্কের কারণ। এ যুগে জঙ্গলের সর্প, বিচ্ছু ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুকে মানুষ ভয় করেনা, ভয় করে আধুনিক পোশাক পরিহিত, কেতাদুরস্ত, স্বার্থান্ধ, হামলায় উদ্দত তথাকথিত মানুষকে।

মানবতার অবমাননায় লিপ্ত, সভ্যতার কলংক, দুরন্ত দুরাচার মানুষকে সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে তোলার, পথভ্রষ্ট মানুষকে পথে আনার শক্তি যে কোন জাগতিক ব্যবস্থায় নেই, একথার সত্যতার প্রমাণ আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস।

এমনি অবস্থায় পবিত্র কোরআন প্রদত্ত ইসলামে নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য। আর সে পন্থা হলো যথা নিয়মে নামাজ কায়েম করা। এটি মানুষকে কুকর্ম, কুকথা, কুচিন্তা থেকে বিরত রাখে। প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, বহু নামাজী ব্যক্তিকেই তো অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে দেখি, নামাজ তো তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে না।

কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ যদি যথা নিয়মে যথা সময়ে যাবতীয় শর্ত পালন করে সেবন না করা হয়, তবে রোগ নিরাময় হয় না। আর এজন্যে কোন বুদ্ধিমানই ঔষধের উপকারীতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং ঔষধ সেবনের নিয়ম পালন না করারই সমালোচনা করা হয়। ঠিক এমনিভাবে নামাজ যে পাপ প্রতিরোধক-এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা সীমাহীন। এর নিয়ম-কানুনের প্রতি আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, অথচ তার উপকারীতার জন্যে উদগ্রীব। এ নীতি অচল, অকেজো।

হযরত হাতেম আসাম (রঃ)-এর নামাজ

যে নামাজ মানুষকে অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত রাখে, যে নামাজে মানুষকে পাপ পংকিলতা থেকে দূরে রাখে, তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই হযরত হাতেম আসাম (রঃ)-এর নামাজ। একবার এসাম এবনে ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর নামাজ আদায়ের কায়দা-কানুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ যখন নামাজের সময় হয় তখন আমি দু' প্রকার অযু করি। অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী বা প্রকাশ্য ও গোপনীয়। প্রকাশ্য অযুঃ ওযুর যা নিয়ম-কানুন রয়েছে তা পালন করি। অপ্রকাশ্য অযুঃ অর্থাৎ আমার পাপ-পংকিলতার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই, তওবা করি। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লোভ-লালসা পরিত্যাগ করি। মনের নিভৃত কোণ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দূর করি। এরপর মসজিদে উপস্থিত হয়ে বিনীত ভাবে কেবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান হই। অবস্থা এই, যেন আমি পবিত্র কা'বা শরীফকে দেখছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে দেখছেন। বেহেশত থাকে যেন আমার ডান পার্শ্বে, আর দোযখ থাকে আমার বাম পার্শ্বে। মৃত্যু দূত আজরাইল (আঃ) থাকেন আমার পশ্চাতে। আমি যেন পুলসিরাতের উপর পা রাখি। তখন আমি একথা মনে করি যে, এ নামাজই আমার জীবনের শেষ নামাজ। পরে নামাজের নিয়্যত করি। অত্যন্ত চিন্তা সহকারে সূরা সমূহ পাঠ করি। অতি বিনয়ের সাথে রুকু সেজদা আদায় করি। বহু আশা-আকাংক্ষা করে তাশাহহুদ পড়ি। এভাবে বিগত ৩০ বছর যাবত আমি নামাজ আদায় করছি।

আধুনিক বিশ্বের সমস্যা সমাধানে নামাজ

বস্তুতঃ এমনিভাবে নামাজ আদায় করলে তা অবশ্যই মানুষকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ

থেকে বিরত রাখবে। আধুনিক বিশ্বের বহু জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান করবে। এ পর্যায়ে আরও দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর পায়ে একটি বর্শা এমনভাবে বিদ্ধ হল যা বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমার আলী (রাঃ) যখন নামাজে দন্ডায়মান হবে তখন তোমরা তা খুলে ফেলবে। বাস্তবেও তাই ঘটলো। হযরত আলী (রাঃ) যখন নামাজে দন্ডায়মান হলেন, তখন বর্শাটি টেনে খুলে ফেলা হল। কিন্তু তিনি তার খোঁজও পাননি যে কখন কি হয়েছে। এভাবে আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ নামাজ আদায় করতেন। আর এমনি নামাজ অবশ্যই পাপ প্রতিরোধক।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'জন সাহাবীকে সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাঁরা উভয়ে রাত্রিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক একজন প্রহরায় রত থাকবেন, শেষার্ধে আরেক জন এ দায়িত্ব পালন করবেন, ফলে উভয়েই বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

এ ব্যবস্থা মোতাবেক একজন নিদ্রামগ্ন হলেন আর অন্যজন নামাজে দন্ডায়মান হলেন। এমন সময় দুশমনের দিক থেকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হল, একটু পর আরেকটি তীর, এভাবে একে একে দু'টি তীর তাঁর পায়ে বিদ্ধ হলো। মুজাহিদের তাজা লহু প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু তবুও তিনি নামাজ পরিত্যাগ করলেন না। পরে দেখলেন এভাবে থাকলে হয়তো দুশমনের স্পর্ধা আরো বৃদ্ধি পাবে। তারা মুসলমানদের দুর্বল মনে করে আক্রমণের দুঃসাহস দেখাবে, আর এভাবে থাকলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ লংঘনের ও তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার আশংকাও ছিল। তাই তিনি তাঁর নিদ্রিত সাথীকে জাগ্রত করলেন। এদিকে হানাদার কাফের বাহিনী লক্ষ্য করলো ইতিপূর্বে একজন মুসলমান ছিলেন, এখন আরও একজন এসেছেন, হয়তো আরও মুসলিম সৈন্য অবিলম্বে এসে পড়বে তাই তারা পলায়ন করলো। উক্ত সাহাবী বলেনঃ যদি কাফেরদের আক্রমণের ভয় না থাকত, তবে তীর যতই আসুক না কেন, আমি নামাজ পরিত্যাগ করতাম না। নামাজে সূরা কাহফ পাঠ করা শুরু করেছিলাম, তা তেলাওয়াত শেষ করেই সালাম ফেরাতাম। (আবু দাউদ শরীফ)

জাতীয় জীবনে উন্নতির কারণ হয় নামাজ

ইতিহাস সাক্ষী! আমাদের জাতীয় জীবনের স্বর্ণযুগে নামাজের প্রতি এমনি গুরুত্বই আরোপ করা হতো, আর এটিই ছিল তাঁদের উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির মূল কারণ। কেননা, নামাজের মাধ্যমে যেভাবে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়, মনের পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ পায়, অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তেমনি নামাজের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা-সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়। বলাবাহুল্য, জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি পূর্ব শর্ত। প্রথমে মহল্লার প্রত্যেক মুসলমান দৈনিক ৫ বার নামাজের জামাআতে একত্রিত হবার কারণে তাদের মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ভাবের

আদান প্রদান হয়, পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এরপর আরও বড় এলাকার মুসলমানগণ শুক্রবারে জুমআর জামাআতে একত্রিত হন। এরপর দু' ঈদের দিনে সমস্ত শহরের বা গ্রামের সকল মুসলমান ঈদের ময়দানে একত্রিত হবার কারণে একে অন্যকে আলিঙ্গন করার সুযোগ পায়, এরপর সমগ্র মুসলিম জাহানের একত্রিত হবার সুযোগ আসে ঐতিহাসিক আরাফাতের ময়দানে হজ্জের মওসুমে। এভাবে নামাজের মাধ্যমেই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার তথা জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি লাভের সুবর্ণ সুযোগ আসে। পবিত্র কোরআনে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ .... فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ

(সূরা মায়েদা)

-যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত আদায় কর নিয়মিতভাবে, এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও আল্লাহ পাককে করজ দান কর (তথা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর মানবতার কল্যাণে, আর্তের সেবায় অর্থ-সম্পদ দান কর) তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের গুনাহ দূরীভূত করব, এবং তোমাদেরকে এমন একটি বেহেশতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। তবে এরপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী ও নাফরমানী করে তবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে (বলে ধরে নেয়া হবে)।

মুসলিম জাতির গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নামাজের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন, এটিই ছিল তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, এ যুগে আমরা এ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি। এ যুগে নামাজ আদায় না করেও মুসলমান থাকা যায়, কিন্তু পূর্ব যমানায় তা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। এজন্যে বর্তমান যুগকে মুসলিম জাতির দুর্দিন বা দুর্যোগ বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশে মুসলমানগণ ক্ষমতাচ্যুত এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শকে বিস্মৃত করেছি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি, জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছি, জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা করছি, জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির সকল পথ নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছি। পরানুকরণই এখন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, আত্ম-বিস্মৃত, বিভ্রান্ত, মুসলিম জাতি তাই আজ দিশেহারা।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা নামাজ রোযা একবারে ছেড়ে দিয়েছে, বরং আমাদের কিছু লোক আজও নামাজ রোযায় অভ্যস্ত। নামাজ আজও আছে তবে প্রাণহীন অবস্থায়। যে মুয়াজ্জেনের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান একত্রিত হতো এবং আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা বর্ণনা করে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুকে পদ দলিত করতো, সে মুসলমান আজ আর নেই, সেই মুয়াজ্জেনের বেলালী কণ্ঠও আজ আর নেই এবং সেই নামাজও আর নেই।

অর্থাৎ নামাজ, রোযা, হজ্ব, কোরবানী সবই ঠিক আছে কিন্তু এই সমস্ত পর্বে ইতিপূর্বে যে প্রাণ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হতো তা আজ আর নেই। কাতার বাঁকা, অশান্ত অন্তর, আর আনন্দ বিহীন সেজদার কারণ এই যে, পূর্বের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে সেই সদ্ভাব, সহযোগিতা, আকর্ষণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিদৃষ্ট হয় না।

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے

মসজিদ সমূহ আজ শোকে মুহ্যমান, এজন্যে যে, তারা আজ নামাজীর সাক্ষাত পায় না অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসারী নামাজী আজ আর পরিলক্ষিত হয় না।

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন নামাজকে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং সাফল্য মনে করতেন। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজই তাঁদের নিকট ছিল না। ইহকালেও না, পরকালেও না। তাই হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেছিলেনঃ যদি কেয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ পাক কোন আকাংক্ষা পেশ করার অনুমতি দান করেন, তবে আমি আরজ করবঃ 'হে আল্লাহ! তোমার আরশের সুশীতল ছায়াতলে দন্ডায়মান হয়ে তোমার দীদার লাভে ধন্য হয়ে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করার অনুমতি দাও'। কেননা, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের দীদার লাভ না করেই সেজদায় রত থাকতেন, আর তাতেই পরম আনন্দ ও তৃপ্তি এবং শান্তি লাভ করতেন আর নামাজকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করতেন, তাঁদের মনের গহনে অতি স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হয়ে, তাঁর আরশের ছায়াতলে দন্ডায়মান হয়ে, তাঁর দীদার লাভে ধন্য হয়ে সেজদায় রত হবার আকাংক্ষা জাগবে। এই অবস্থা শুধু সুফী বুজুর্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, মুসলিম বীর মুজাহেদগণ সারাদিন রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতেন, দিনান্তে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং সারারাত নামাজে রত থাকতেন এবং আল্লাহর দরবারে স্বীয় কাকুতি মিনতি প্রকাশ করতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে একজন শত্রু সেনাধক্ষ বলেছিলো, মুসলিম জাতিকে পরাজিত করা আমাদের শক্তির উর্দ্ধে, কেননা তারা দিনে বাঘ আর রাতে ফেরেশতা।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নামাজ

অনেক মুসলিম মনীষী এশার নামাজের অযু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করতেন। কেননা, তাঁরা এশার নামাজের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না, বরং সারা রত নামাজে রত থাকতেন। আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত এশার নামাজের অযু দ্বরা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। এজন্যে ইমাম শা'বী (রঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ এমন কোন দিন দেখিনি যেদিন ইমাম সাহেব রোযাদার ছিলেন না আর এমন কোন রাতও দেখিনি, যে রাত তিনি আল্লাহর দরবারে দন্ডায়মান হয়ে নামাজে রত অবস্থায় অতিবাহিত করেননি।

অতএব, মুসলমান মাত্রকে এ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত নামাজের কর্মসূচীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করতে হবে। নামাজের ব্যাপারে গাফলত বা অবহেলা আত্মহত্যারই নামান্তর। কেননা, আল্লাহ্ অবাধ্য অকৃত্জ্ঞ হয়ে মুসলিম জাতির বাঁচার কথা, উন্নতি-অগ্রগতির কথা চিন্তাও করা যায় না। নামাজই এ ব্যাপারে কষ্টি পাথর বা মানদন্ড। যে নামাজ কায়েম করলো যথা সময়ে, যথা নিয়মে, এর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করলো, সে আল্লাহ্ পাকের সাথে স্বীয় সম্পর্ককে ঘনিষ্টতর করে তুললো। তাঁর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভে সফল হলো এবং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সফল হলো এবং জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে, ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো (আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এর তওফিক দান করুন)।

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا

"নিশ্চয় কেয়ামত আসবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার কাজ অনুযায়ী ফল লাভ করে, এজন্যে আমি তা গোপন রাখতে চাই"।

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের প্রতি ঈমানের আহবান ছিল, আর এ আয়াতে আখেরাত বা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা রয়েছে। প্রতিটি মানুষ যেন তার নেক ও বদ আমলের ফল লাভ করে, নেককার ও বদকারদের পরিণতির পার্থক্য যেন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, এজন্যে কেয়ামতের তথা শেষ বিচার দিনের আগমন নিতান্ত অনিবার্য। মানুষ যেন সত্য-সাধনায় গাফলত না করে; বরং সদা সতর্ক ও সচেতন থাকে, সেজন্যে কেয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্তটি আল্লাহ্ পাক গোপন রেখেছেন। একখানি হাদীসে রয়েছে, "যার মৃত্যু হয়েছে তার কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে"। অর্থাৎ মৃত্যু হল ক্ষুদ্র কেয়ামত। কেয়ামতের দিন গোপন রাখার হেকমত হল এই, প্রত্যেকে যেন তার পরকালীন জীবনের সাফল্যের জন্যে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকে। যদি মানুষের মৃত্যুর সময় বা কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় তার জানা থাকে, তবে সে সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকবে এবং সময় ঘনিয়ে আসলে তওবা করে নেবে। অথচ অবস্থা এই যে, পাপাচারের কারণে মানুষের অন্তর কালো হয়ে যায়, সত্য-অসত্য উপলব্ধি করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে, ফলে এ ব্যক্তি তওবা করার সুযোগও পায়না। অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো কেয়ামতের দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং শয়তানের প্রতারনায় অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত না হওয়া।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যদিও এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত মূসা (আঃ)-কে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্ব মানবকে সতর্ক করা। কেননা, কেয়ামতের ব্যাপারে গাফলত সমূহ বিপদের কারণ হয়।

তফসীরকারগণ আরো লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে সর্ব প্রথম তৌহীদের আদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো তৌহীদ বা আল্লাহ

পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করা, আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা। এরপর আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন তাঁর এবাদত করার। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল হওয়া। আর যেহেতু সমস্ত এবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম এবাদত হলো নামাজ তাই নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

(আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম কর।)

এরপর আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে এবং আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ও সম্বল সংগ্রহ করার তাগিদ করা হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে কেয়ামত অবশ্যই আসবে। এর পূর্বে আল্লাহ পাকের এবাদত করার আদেশ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে যদি আল্লাহ পাকের এবাদত না করা হয়, তবে শেষ বিচারের দিনে পরিণতি হবে ভয়াবহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যদিও সাধারণতঃ পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের জন্যে তথা জান্নাত লাভের জন্যে এবাদত করা হয় এবং দোযখের শাস্তির ভয়ে গুনাহ থেকে পরহেয করা হয়, আর কেয়ামতের দিন এ বিষয়েরই বিচার হবে, এজন্যে কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু যদি আল্লাহ পাক কেয়ামতের খবর না-ও দিতেন, তবুও মোমেন বন্দার ঈমান এবং নেক আমল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হতো।

এ কারণেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত সোহায়েব (রাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ সোহায়েব অত্যন্ত ভাল বন্দা। যদি তার অন্তরে আল্লাহর আযাবের তথা দোযখের ভয় না-ও হতো, তবুও সে আল্লাহর নাফরমানী করতো না। আর এজন্যেই বিখ্যাত মহিলা-সুফি সাধক হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, জান্নাতকে জ্বালিয়ে দেই এবং দোযখের অগ্নি নিভিয়ে দেই যেন লোকেরা জান্নাতের লোভে এবং দোযখের ভয়ে নয়; বরং এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই এবাদত করে।[২]

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যেতে পারে, হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলতেন,

نخواهم خویئے دنیا نخواهم راحت عقبی

اگر خواهم ترا خواهم نه خواهم باغ رضوان را

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৩৬
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬৯

"আমি দুনিয়ার সম্পদ চাইনা, আখেরাতের নেয়ামতও চাইনা, আমি যদি কিছু চাই শুধু তোমাকে চাই, আমি জান্নাতের সৌন্দর্যও চাইনা"।

تو جنت را بنیکاں دہ من وبد را بدوزخ بر
مر آنجا بس کہ تمنائے وصال توست

"হে আল্লাহ! তোমার নেককার বন্দাদেরকে তুমি জান্নাত দিও, আমাকে এবং বদকার লোকদেরকে দোযখেই ফেলে দিও। আমার জন্যে সে স্থানটিই যথেষ্ট যেখানে থেকে তোমার মিলনের আকাংক্ষা করা যাবে"।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى

"অতএব, তোমাকে যেন তা থেকে (কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস থেকে) এমন ব্যক্তি বিরত না রাখে যে তাতে বিশ্বাস রাখেনা, এবং তার প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে, নতুবা তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কেও কুসংসর্গ থেকে তথা মন্দ লোকের সংস্রব থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, যারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, নিজের প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলে তারা আত্ম বিস্মৃত থাকে, পরকালের জন্যে কোন চিন্তা করেনা এবং কোন প্রকার প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা।

এ অবস্থা কাফেরদেরই হয়। তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, এখানকার লাভ-ক্ষতির চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকে এবং এখানকার আনন্দ-উল্লাসেই মুগ্ধ মত্ত থাকে। প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে কুসংস্রব থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন অন্যদের বেলায় এ নির্দেশের গুরুত্ব কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়।[১]

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

"আর হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে এটি কি"?

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত ও রেসালত প্রদানের উল্লেখ ছিল। এ কারণে হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। এ ভয় দূর করতে এবং তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্যে আল্লাহ পাক এ প্রশ্ন করেছেন, কেননা আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানতেন মূসা (আঃ)-এর হাতে কি ছিল? কিন্তু তাঁর অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক করার লক্ষ্যেই এ প্রশ্নের অবতারণা।

এতদ্ব্যতীত, যেহেতু লাঠিটির মাধ্যমেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা

১। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩৮

প্রকাশ করবেন, তাই পূর্বেই স্বীকার করিয়ে নিলেন যে এটি লাঠিই, আর কিছু নয়। আর যখন এই লাঠিকে আল্লাহ পাক অজগর সর্পে পরিণত করবেন তখন যেন নির্ভীক চিত্তে তা স্পর্শ করেন।

قَالَ هِىَ عَصَاىَ

"মূসা (আঃ) বললেন, "এটি আমার লাঠি"।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, লাঠিটির নাম ছিল তাবায়াহ।

اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ

"আমি এতে ভর করি, এর দ্বারা আমার বকরীদের উপর পাতা ঝেড়ে দেই। এতদ্ব্যতীত, এর দ্বারা আমার আরো কাজ আছে"।

অর্থাৎ আমি যখন ক্লান্ত হয়ে যাই তখন লাঠিটির উপর ভর করি। যখন উপরে উঠতে চাই, তখনও তার উপর ভর করে অগ্রসর হই। আর আমার বকরীদের আহার্য সরবরাহ করি এই লাঠির সাহায্যে গাছ থেকে পাতা ফেলে। এছাড়াও এর দ্বারা আমার অনেক কাজ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জবাবকে দীর্ঘায়িত করেছেন। কেননা, মানুষ যাকে ভালবাসে, তার সাথে কথা দীর্ঘায়িত করা পছন্দ করে। কিন্তু তখন হযরত মূসা (আঃ) উপলব্ধি করলেন, আমার দীর্ঘ কথায় বেআদবী না হয়ে যায়, তাই সংক্ষেপ করে বললেন,

وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى

অর্থাৎ "এ লাঠি দ্বারা আমার আরো অনেক জরুরী কাজ হয়"।

হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম মোজেযা

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى

"আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, লাঠিটিকে হাত থেকে ফেলে দাও"।

فَاَلْقٰهَا

"হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনার্থে লাঠিটি ফেলে দিলেন"।

এরপর লাঠিটির দিকে তাকিয়ে যা দেখলেন, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর।

فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

কেননা, লাঠিটি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় সর্পে পরিণত হয় যা তখন ছুটোছুটি করছিল।

অন্য আয়াতে كَاَنَّهَا جَانٌّ বলা হয়েছে। আর جَان বলা হয় ক্ষুদ্র সর্পকে যা দ্রুত ছুটোছুটি করে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে সে এক বিরাটকায়

অজগরে পরিণত হয়। এটি ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রথম মোজেযা।

حية শব্দটির অর্থ হল সর্প ছোট হোক কি বড়। আর ثعبان শব্দটির অর্থ হল বিরাটকায় অজগর সর্প। এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে তফসীরকারগণ এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, সর্ব প্রথম তা ছোট সর্পই ছিল, লাটিটি যতখানি সর্পও ততখানি। কিন্তু পরে তা বড় হতে লাগল এবং ফুলে গেল। এমনকি, শেষ পর্যন্ত বিরাট অজগরে পরিণত হল। কোরআনে করীমে সর্পটির প্রথম অবস্থাকে جان শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আর তার শেষ অবস্থাকে ثعبان শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রকৃত অবস্থায় সর্পটি প্রথম থেকেই অজগর ছিল, কিন্তু যেহেতু ছোট সর্পগুলোর মত দ্রুত ছোটাছুটি করছিল, তাই كانها جان বলা হয়েছে অর্থাৎ যেন ছোট সর্প।

اذا هى جان

"সে ক্ষুদ্র সর্পে পরিণত হয়েছে"-বলা হয়নি।

মোহাম্মদ এবনে এসহাকের বর্ণনা হলো, হযরত মূসা (আঃ) লাঠির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লাঠির বদলে একটি বিরাটকায় অজগর সর্প রয়েছে, তার মাথায় রয়েছে চুল, জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় তার দু'টি চক্ষু জ্বলজ্বল করছিল। তার দাঁত ব্যবহারের শব্দ শ্রুত হচ্ছিল, সে এদিক-সেদিক দ্রুত ছোটাছুটি করছিল, যা কিছু সম্মুখে আসত তাকেই সে মুখের গ্রাস করে নিচ্ছিল এবং বড় বড় বৃক্ষগুলোকে ক্ষণিকের মধ্যে খন্ড-বিখন্ড করছিল। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হযরত হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত হলেন এবং পেছনের দিকে পলায়নপর হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের কথা মনে পড়লে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আল্লাহ পাক তখন তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে মুসা! ভয় করোনা, তাকে হাত দিয়ে ধর, আমি পুনরায় তাকে তার আসল রূপ লাঠিতে পরিণত করব, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ

"আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তুমি তাকে ধর ফেল, ভয় করোনা, আমি এখনই তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব"।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) অজগরটিকে সরাসরি হাত দিয়ে না ধরে কাপড় জড়ানো হাতে ধরতে ইচ্ছা করলেন। তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতা বললেনঃ আল্লাহ পাক যদি আপনাকে অজগর থেকে রক্ষা করার মর্জি না করেন, তবে কি এ বস্ত্রখন্ডটি আপনাকে রক্ষা করতে পারবে?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তা কখনও নয়, তবে আমি যে অত্যন্ত দুর্বল, তাই কাপড় জড়িয়ে তাকে ধরতে চেয়েছিলাম। এরপর হযরত মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি অজগরের মুখে পুরে দিলেন এবং তাকে ধরে ফেললেন। তখন অজগরটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হলো।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৭২-৭৪

হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠিকে সর্পে পরিণত করার তাৎপর্য হলো, হযরত মূসা (আঃ) যেন তাঁর নবুওয়্যত সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন কেননা, এ পর্যন্ত শুধু গায়বী আওয়াজ এবং তাঁকে নবী মনোনীত করার সু-সংবাদই শ্রবণ করেছিলেন, তাই আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠিটিকে অজগর সর্পে পরিণত করে তাঁকে এ বিস্ময়কর মোজেযা দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ লাঠিকে অজগর সর্পে পরিণত করার মোজেযা দেখানো হয়েছে এজন্যে যে, এ মোজেযা যখন ফেরাউনের সম্মুখে দেখানো হবে, অর্থাৎ যখন মূসা (আঃ)-এর লাঠি অজগরে পরিণত হবে, তখন যেন তিনি ভীত না হন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত প্রাপ্তি ছিল আকস্মিক ব্যাপার, তিনি ছিলেন সফরে, বের হয়েছিলেন অগ্নির সন্ধানে, ঠিক এমন সময় আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হল তাঁর প্রতি, এটি ছিল তাঁর জন্যেও বিস্ময়কর। তাঁর একীন বৃদ্ধির জন্যেই আল্লাহ পাক তাঁকে লাঠির মোজেযা দান করেছেন যেন মূসা (আঃ) এ সত্য উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ পাকের যা মর্জি হয়, তাই হয়ে থাকে, তাঁর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[১]

দ্বিতীয় মোজেযা

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ

"আর তোমার হাত বগলের সাথে মিলিত কর, তা অত্যন্ত শুভ্র হয়ে বের হবে, এটি হবে দ্বিতীয় নিদর্শন"।

ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম মোজেযার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মোজেযার উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاضْمُمْ

অর্থাৎ হে মূসা! নিজের ডান হাতটি বগলে চাপা দিয়ে বের কর দেখবে তা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছে। আর এ শুভ্রতা কোন রোগের কারণে হবেনা বা কোন ত্রুটি হিসেবেও থাকবেনা; বরং এটি হবে নবুওয়্যত ও রেসালতের এক জীবন্ত নিদর্শন।

সাধারণতঃ শ্বেত রোগ হলে মানুষের দেহ সাদা হয়ে যায়। এটি আদৌ এমন কিছু নয়; বরং আল্লাহ পাকের কুদরতের একটি নিদর্শন মাত্র। তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর হাত থেকে চমকদার নূর বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো, যা দিনে বা রাতে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় আলোকময় হতো। এটি হল দ্বিতীয় মোজেযা যা তোমার নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে পরিণত হবে।

لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ

"যাতে করে আমি আমার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ তোমাকে প্রদর্শন করি"।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-২৮

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হাত শুভ্র হওয়া হযরত মূসা (আঃ)-এর সবচেয়ে বড় মোজেযা।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

হে মূসা! ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমা লংঘন করেছে। আর সে এতবড় অবাধ্য এবং অহংকারী হয়েছে যে, খোদায়ী দাবী করে বসেছে। অতএব ফেরাউনের নিকট এ দু'টি নিদর্শন নিয়ে যাও এবং তাকে তৌহীদের প্রতি আহবান জানাও। আর তোমার নবুওয়্যতের এ দু'টি নিদর্শন তাকে দেখাও; ফেরাউনকে আমার আযাবের ভয় প্রদর্শন কর এবং তাকে আমার এবাদতের জন্যে আহবান কর। যদি সে তোমার নবুওয়্যত ও রেসালতে সন্দেহ পোষণ করে, তবে নিজের নবুওয়্যতের এ দু'টি দলিল উপস্থাপন কর।[১]

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ
اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ
اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا
عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾

তরজমা

(২৫) মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন,

(২৬) এবং আমার কাজকে সহজ করে দিন,

(২৭) আমার রসনার জড়তা দূর করে দিন,

(২৮) যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

(২৯) আর আমার পরিবার থেকে একজন সহকারী দান করুন,

(৩০) আমার ভাই হারুণকে,

(৩১) তাঁর দ্বারা আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দিন,

(৩২) আর তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন,

(৩৩) যাতে করে আমরা অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৫৪০-৪১

(৩৪) এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক পরিমাণে,

(৩৫) আপনি তো আমাদেরকে উত্তম রূপে দেখতে পান।

(৩৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।

(৩৭) আর আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

(৩৮) যখন আমি তোমার মাতার প্রতি আদেশ দেই যার বর্ণনা আসছে–

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, "জালেম ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমা লংঘন করেছে এবং ফেরাউনকে হেদায়েত কর"।

হযরত মূসা (আঃ) এ কঠিন দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আটটি বিষয়ের জন্যে আরজী পেশ করেনঃ

(১) হে পরওয়ারদেগার! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন, যেন কোন অপ্রিয় পরিস্থিতিতে আমি ধৈর্য্যহারা না হই। আমাকে এমন সহনশীলতা দান করুন যেন কোন অন্যায় আচরণের সম্মুখেও আমি উত্তেজিত না হই। ফেরাউন সহ অন্যান্য কাফেরদের নিকট যখন আমি তৌহীদের মহান দাওয়াত পেশ করবো এবং তারা আমার বিরোধিতা করবে, আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে এমন সময় আমি যেন অধৈর্য হয়ে না পড়ি এবং রেসালতের মহান দায়িত্ব যেন আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি। আলোচ্য আয়াতের صدر শব্দটির অর্থ বক্ষ। তবে আল্লামা বগভী (রঃ) এ শব্দের ব্যাখ্যায় একথাও লিখেছেন যে কোরআন করীমে যেখানে 'কলব' বা ছদর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে তা দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এলম বা জ্ঞান, ধী-শক্তি এবং মানুষের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ শক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবেঃ "হে প্রতিপালক! আমার বাতেনী শক্তি বৃদ্ধি করে দাও"।

এবনে যায়েদ তাবেয়ী বলেছেনঃ এ শব্দটির অর্থ হল সৎ-সাহস, অর্থাৎ কঠিন সমস্যার মোকাবেলায় সৎ-সাহস লাভ করা।

وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

(২) "আর আমার কাজকে সহজ করে দিন"।

কেননা আল্লাহ পাক যদি রেসালতের মহান দায়িত্ব পালনকে সহজ করে না দেন, আল্লাহর দুশমনদের মোকাবেলা করার তৌফিক না দেন, তবে এ মহান কাজ কি করে সম্ভব হবে? তাই আল্লাহ পাকের দরবারে হযরত মূসা (আঃ) এ আরজী পেশ করেছেন যেন রেসালতের এ মহান দায়িত্ব পালনকে সহজ করা হয় এবং এ পর্যায়ের যাবতীয় সমস্যা যেন আল্লাহ পাক সমাধান করে দেন।

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

(৩) "(হে প্রতিপালক!) আমার রসনার জড়তা দূর করে দিন, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে"।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর শৈশব কালে তাঁর সম্মুখে খেজুর এবং জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা ছিল। তিনি একটি অঙ্গার মুখে পুরে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বা পুড়ে যায়। এজন্যে তিনি পরিস্কার ভাবে কথা বলতে পারতেন না, তাই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেছেনঃ "হে আল্লাহ! আমার রসনার জড়তা দূর করে দিন"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো হযরত মূসা (আঃ)-এর আদব। তিনি নিতান্ত প্রয়োজন মোতাবেক আরজী পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন"।

তিনি এ বিষয়ে আরজী পেশ করেননি যে, তাঁর কথা সম্পূর্ণ পরিস্কার যেন হয়ে যায় বরং দোয়া করেছেন, শুধু রসনার জড়তাটা যেন কেটে যায়। তাই তাঁর কথা-বার্তায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা অবশিষ্ট ছিল। আর এজন্যেই ফেরাউন বলেছিল, আমি উত্তম না এই ব্যক্তি? যে পরিস্কার কথাও বলতে পারে না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ) রসনার জড়তা দূরীভূত করার স্থলে যদি দোয়া করতেন যে তাঁর কথা বার্তা যেন সম্পূর্ণ পরিস্কার ভাবে হয় তবে তা-ও কবুল হতো।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগভী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) অতি শৈশবে ফেরাউনের মুখে চপেটাঘাত করেছিলেন এবং তার দাড়ি টেনে ছিড়েছিলেন। তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তার স্ত্রী আছিয়াকে বললো, এই ছেলেটি আমার শত্রু, আমি তাকে হত্যা করবো। আছিয়া বললেন, অবুঝ শিশু, ভাল-মন্দ বুঝবার তার কোন ক্ষমতাই হয়নি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা যখন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর দুধ পান বন্ধ করে দিলেন এবং বিবি আছিয়ার নিকট তাঁকে ফেরত দিলেন তখন ফেরাউন ও তার স্ত্রী তাঁকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলো। একদিনের ঘটনাঃ ফেরাউনের সামনে শিশু মূসা (আঃ) খেলা করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। হঠাৎ হাতের লাঠি দিয়ে তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করলেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো। তার স্ত্রী বললো, হে বাদশাহ! এ হল অত্যন্ত অবুঝ শিশু। যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে পরীক্ষা করে নিন। তখন আছিয়া দু'টি তশতরী আনালেন। একটিতে ছিল জ্বলন্ত অঙ্গার, আর দ্বিতীয়টিতে ছিল হীরা-জহরত। উভয় তশতরী মূসা (আঃ) এর সম্মুখে রেখে দেয়া হলো। হযরত মূসা (আঃ) হীরা-জহরতের দিতে হাত বাড়ালেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁর হাত ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্রে রেখে দিলেন। যে-কারণে তাঁর জিহ্বা জ্বলে গেল এবং রসনায় জড়তা সৃষ্টি হলো। আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনুল

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৬২

মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেনঃ এক দিন ফেরাউন শিশু মূসা (আঃ)-কে কোলে তুলে নিয়েছিল। তিনি তার দাড়ি ধরে টান দিয়েছিলেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার আদেশ দেয়। আল্লাহ পাক যাঁকে ভবিষ্যতে নবী মনোনীত করবেন তাঁকে হত্যা করতে পারে কে? আছিয়া ফেরাউনের আদেশ শুনে বললেন, এ হল অবুঝ শিশু। অঙ্গার এবং ইয়াকুতের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে না। ফেরাউন উভয় বস্তু সামনে এনে রাখলো। তিনি মূল্যবান পাথর ইয়াকুত ধরতে চাইলেন। কিন্তু জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর হাত নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রেখে দিলেন। আর তিনি জ্বলন্ত অঙ্গার মুখের ভেতর তুলে দিলেন, যে কারণে তাঁর রসনা জ্বলে গেল এবং কথা-বার্তায় অসুবিধা হল।[১]

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ

(৪) "আর আমার পরিবার থেকে একজন সহকারী দান করুন, আমার ভাই হারুনকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন"।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, وزير শব্দটি وزر থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো বোঝা। অর্থাৎ বাদশাহ বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার যে বোঝা থাকে তার কিছু অংশ وزير এর উপরে অর্পিত হয় তাই তাকে وزير বলা হয়। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এই আরজী পেশ করেছেন যেন তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে তাঁর সহকারী বা সাহায্যকারী বানিয়ে দেয়া হয়।

বর্ণিত আছে যে হযরত হারুন (আঃ) বয়সে হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বড় ছিলেন। তবে মনের ভাব প্রকাশে তিনি ছিলেন পারদর্শী। এজন্যে হযরত মূসা (আঃ) এ দোয়া করেছিলেন যেন হারুন (আঃ)-কে সহকারী মনোনীত করা হয়।

اُشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ

(৫) "তাঁর দ্বারা আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দিন"।

অর্থাৎ আমার শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দিন যাতে দুশমনের মোকাবেলায় আমি সুদৃঢ় থাকতে পারি।

وَاَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْ

(৬) "আর হারুনকে আমার কাজে অংশীদার করুন"।

অর্থাৎ নবুওয়্যত ও রেসালতের মহান দায়িত্ব পালনে হারুনকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا

(৭) "যেন আমরা অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি"।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে তসবীহ অর্থ নামাজ। হযরত মূসা (আঃ)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৭৬

হযরত হারুন (আঃ)-কে সাহায্যকারী মনোনীত করার যে আরজী পেশ করেছেন তার কারণ হলো, তাঁরা যেন পরস্পরের সহযোগিতায় কল্যাণকর কাজ করতে পারেন, যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ পাঠ করতে পারেন।

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا

(৮) "(হে পরওয়ারদেগার!) যেন অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি"। বস্তুতঃ দুশমনের মোকাবেলায় সাফল্য লাভের পন্থা হলো আল্লাহ্ পাকের জিকর। তাই অধিক পরিমাণে জিকর করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন হযরত মূসা (আঃ)। পরিশেষে হযরত মূসা (আঃ) বিনয় পেশ করে বলেছেন,

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا

(হে আল্লাহ!) আমাদের অবস্থা তোমার অজানা নয়, আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অবগত। আর আমি যে-সব বিষয়ে আরজী পেশ করেছি সেগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তোমার নিকট সুস্পষ্ট। আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় একে অন্যকে সাহায্য করবো। তোমার হুকুম পালনে, নবুওয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে হারুন আমার সাহায্যকারী হবে।[১]

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ হে মুসা! তোমার সকল দরখাস্ত মঞ্জুর হল, ইতিপূর্বেও একবার কোন প্রকার দরখাস্ত ব্যতীত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছি।

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى

"যখন তোমার মাতাকে আমি আদেশ দেই যার বিবরণ পরে আসছে"।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতাকে স্বপ্নযোগে অথবা এলহামের মাধ্যমে অথবা সে-যুগের কোন অজ্ঞাতনামা পয়গম্বরের মাধ্যমে কিংবা কোন ফেরেশতা দ্বারা আমি আদেশ প্রদান করি।

وَلَقَدْ مَنَنَّا

এ আয়াত থেকে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর সে সব নেয়ামত এবং অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা নবুওয়্যত প্রদানের পূর্বেই তাঁকে দান করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁর অন্তরে এই আত্মবিশ্বাস আসে যে নবুওয়্যত প্রদানের পূর্বেই যখন আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি এত এহসান করেছেন এবং এত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন তখন নবুওয়্যতের পর আল্লাহ্ পাক অবশ্যই আমার হেফাজত করবেন। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, হে মূসা! সে-সময়কে স্মরণ কর যখন আমি তোমার জননীর নিকট এই নির্দেশ প্রেরণ করেছিলাম যে জন্মের পরেই মূসাকে ফেরাউনের

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৭৭

জল্লাদদের থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে কাষ্ঠ-নির্মিত বাক্সে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। নীল দরিয়াতে ভাসমান অবস্থা থেকে তাকে জনৈক দুশমন উঠিয়ে নেবে এবং তার লালন-পালনের ব্যবস্থাও করবে। অবশেষে তাই হয়েছে। ফেরাউন তার স্ত্রী আছিয়া সহ নীল দরিয়ার তীরে তাদের রাজমহলের সম্মুখে বসেছিল। নবজাত শিশুকে দেখতে পেয়ে তারা তখন খুশী হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ্ পাক তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর হেফাজত করেছিলেন। কেননা সে স্বপ্নে দেখেছিল যে বণী ইসরাঈলে এমন একটি শিশুর জন্ম হবে যে তার রাজত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।[১]

اِذْ اَوْحَيْنَا

"আমি যখন তোমার জননীর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম"।

আলোচ্য আয়াতে যদিও 'ওহী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা নবুওয়্যাতের ওহী উদ্দেশ্য নয়; বরং 'এলহাম' উদ্দেশ্য। আর এলহাম প্রেরণের জন্যে নবী হওয়া জরুরী নয়। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরয়ম (আঃ)-এর নিকটও আল্লাহ্ পাক প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতার নিকটও আল্লাহ্ পাক এলহাম দ্বারা নির্দেশ প্রেরণ করেছেন।[২]

নবী শুধু পুরুষই হন

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, নবী হওয়া পুরুষের বৈশিষ্ট্য। সকল নবী রসূলই পুরুষ ছিলেন। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্ব শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবুওয়্যাতের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে চির কালের জন্যে। তাঁর নবুওয়্যাতই অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত, এমনকি যদি পূর্বকালের কোন নবী পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনিও নবী হিসাবে আসবেন না, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যমানায় পৃথিবীতে আগমন করবেন তবে নবী হিসাবে নয়; বরং সর্বশেষ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে। অতএব আলোচ্য আয়াতের 'ওহী' নবুওয়্যাতের ওহী নয়; বরং এলহামের ওহী। আর এলহাম হয় আল্লাহ পাকের সাথে তাঁর বন্দার সম্পর্কের ভিত্তিতে। যে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য ও বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্ককে ঘনিষ্টতর করে তার অন্তরে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এলহাম আসার ঘটনা সর্বজন বিদিত। আউলিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ্ পাক এ তৌফিক দান করেন।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা ২৯৬-৯৭
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৪৪

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ
فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا
فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا
لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৩৯) এ মর্মে যে তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, আর সিন্দুকটি নদীতে ফেলে দাও, যাতে নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয়, আমার এবং তার জনৈক শত্রু তাকে উঠিয়ে নেবে, আর আমি তোমার উপর আমার নিকট থেকে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও।

(৪০) যখন তোমার ভগ্নি এসে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, কে এই শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তখন আমি তোমাকে তোমার জননীর নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে করে তার নয়ন জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, এরপর আমি তোমাকে সে দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করি। আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। এরপর তুমি কয়েক বছর মাদায়েনবাসীর নিকট অবস্থান করেছ। হে মূসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।

(৪১) আর আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে প্রস্তুত করে নিয়েছি।

(৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন সহ এগিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে গাফলত করোনা।

(৪৩) তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট যাও; নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।

(৪৪) এরপর তার সঙ্গে তোমরা বিনম্রভাবে কথা বল, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, তদানীন্তন মিসরের রাজা

ফেরাউন জ্যোতিষীদের কথায় অথবা স্বপ্ন দেখার কারণে বণী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি পুত্র সন্তানকে হত্যা করার আদেশ দেয়। এ আদেশ অনুযায়ী প্রায় নব্বই হাজার শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থায় মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। যদি ফেরাউনের চরেরা জানতে পারে তবে নবজাত শিশু মূসা (আঃ)-কে তৎক্ষণাৎ হত্যা করবে, শুধু তাই নয়; বরং তার জন্মের ঘটনাটি গোপন করার অপরাধে পিতা-মাতার প্রতিও অকথ্য নির্যাতন করা হবে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে মূসা (আঃ)-এর মাতা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন। ঠিক ঐ মুহূর্তেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে এলহাম বা প্রত্যাদেশ হয় তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ

"মুসাকে একটি সিন্দুকে রেখে সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দাও"।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর মাতা তাই করলেন। নীল নদীর একটি শাখা ফেরাউনের মহলের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত ছিল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের বাড়ীর সম্মুখে এসে পড়ে। কৌতূহলবশত ভাসমান সিন্দুকটি পানি থেকে তুলে আনা হয়। সিন্দুকটি খুলে সুন্দর, ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে সকলেই অবাক হল।

এখানে উল্লেখ্য, ফেরাউনের স্ত্রী মহিয়সী নারী হযরত আসিয়া অত্যন্ত নেককার, সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন। তিনি শিশুটিকে পেয়ে ফেরাউনের নিকট নিয়ে আসেন এবং নিজেদের পুত্র হিসেবে পালন করার আবদার করেন। শিশু মূসাকে দেখার পর ফেরাউনের মনেও স্নেহের উদ্রেক হয়েছিল। তাই পুত্ররূপে গ্রহণ না করলেও সে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করে। পবিত্র কোরআনে কথাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ

"নদী যেন তাকে তীরে ফেলে দেয়, আমার এবং তার শত্রু তাকে উঠিয়ে নেবে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নীল নদীকে আদেশ দিয়েছেন সিন্দুকটিকে যেন নিদৃষ্ট স্থানে ফেলে দেয়।

ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, নীল নদের উপর এই হুকুম হয়েছে যেন শিশু মূসাকে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

প্রাণহীন সৃষ্টি কি কথা শোনে?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, পৃথিবীতে যে সব সৃষ্টিকে আমরা প্রাণহীন মনে করি, যেমন আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত-এসব বিশাল সৃষ্টি আমাদের নিকট প্রাণহীন মনে হলেও তারা সর্বক্ষণ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের আদেশ মেনে চলে। যেমন আল্লাহ পাক জমীন ও আসমানকে আদেশ দিয়েছেন তারা উভয়ে নিজেদের আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে বলেছেঃ

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

"তারা উভয়ে বলেছে, আমরা হাযির হয়েছি অনুগত হয়ে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একটি পাহাড় আরেকটি পাহাড়কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আজ তোমার উপর দিয়ে এমন কোন ব্যক্তি কি অতিক্রম করেছে, যে আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল ছিল? মওলানা রুমী (রঃ) এ প্রশ্নের অতি সুন্দর জবাব দিয়েছেনঃ

خاك وباد آب وآتش بنده اند
بامن وتو مرده باحق زنده اند

"আগুন, পানি, মাটি, বাতাস সবই আল্লাহ পাকের বন্দা। তোমার আমার নিকট তারা মৃত, কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা জীবিত"।

তাই তারা আমাদের কথা শোনেনা, কিন্তু আল্লাহ পাকের কথা সর্বক্ষণই শুনে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরাউনকে নিজের দুশমন এবং মূসা (আঃ)-এর দুশমন বলে ঘোষণা করেছেন। যেহেতু ফেরাউন মুশরেক ছিল তাই আল্লাহ পাকের দুশমন ছিল। তবে সে মূহূর্তে মূসা (আঃ)-এর দুশমন ছিল না, পরবর্তী কালে দুশমন হবে এজন্যে এ আয়াতে عَدُوٌّ (দুশমন) এ শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ফেরাউন একই সময়ে আল্লাহ পাকের দুশমন ছিল এবং মূসা (আঃ)-এরও দুশমন ছিল। আল্লাহর দুশমন হওয়া তো প্রকাশ্য, কেননা সে ছিল মুশরেক। আর মূসা (আঃ)-এর দুশমন এভাবে ছিল যে জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে বলেছিল, বণী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক শিশু পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে যার হাতে তোমার রাজত্ব ধ্বংস হবে। এজন্যে ফেরাউন বণী ইসরাঈলের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) তার কঠোর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দুশমন হিসাবে চিনতে পারেনি, নতুবা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। মোটকথা সে মূসা (আঃ)-এর দুশমন অবশ্যই ছিল। কিন্তু চিনতে না পারায় তাঁকে হত্যা করেনি।

আল্লাম বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন যে মূসা (আঃ)-এর মাতা একটি সিন্দুক নিয়ে তার মধ্যে তুলা বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং শিশু মূসাকে (আঃ) তার মধ্যে রেখে দিয়ে মুখ বন্ধ করে সিন্দুকটি নীল নদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

"এবং তোমার উপর আমার তরফ থেকে মহব্বত ঢেলে দেই"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে মানুষের মনে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রীতি-ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে যে-ই তাঁকে দেখতো সে-ই ভালবাসতো আর আল্লাহ পাক নিজেও তাঁকে ভালবাসেন। তাই মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয়। আর যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে মহব্বত করেছেন তাই মানুষের অন্তরেও তাঁর জন্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আমি তাঁকে মহব্বত করেছি তাই মানুষের অন্তরেও তাঁকে আমি প্রিয় এবং পছন্দনীয় করে দিয়েছি"।

একরামা (রঃ) বলেছেন, যে কেউ শিশু মূসাকে দেখতো সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভালবাসতে বাধ্য হতো। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ)-এর নয়ন যুগলে এক বিস্ময়কর লাবন্য ছিল। যে কেউ তাঁকে দেখতো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের আরও একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজের তরফ থেকে আমার মহব্বত তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছি যেন আমার মহব্বত তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তাই তুমি অন্তর দিয়ে আমাকে ভালবাস এবং তোমার অন্তরে আমার মহব্বত এত প্রগাঢ় হয়েছে যে আমার কোন কিছুর প্রতি তোমার মনের আকর্ষণ রয়নি। তাই তুমি আমার প্রকৃত প্রেমিক হয়েছ এবং প্রেমিকদের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছ।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেনঃ হযরত মূসা কলিমুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত মহব্বত রাখতেন, তাই আল্লাহর প্রেমিকদের দলপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয়জনদের দলপতি বিবেচিত হয়েছেন।

সুফী-সাধকগণ তাঁদের কাশ্ফ দ্বারা দেখতে পান যে মহব্বতের একটি কেন্দ্র রয়েছে আর এ কেন্দ্রের সীমান্ত রয়েছে। মহব্বত কেন্দ্রের ঐ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে, তাকে 'মকামে খিল্লত' বলা হয়। আর এ অবস্থানেই রয়েছেন হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) আর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মুসা কলিমুল্লাহ (আঃ)। আর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলা হয় হাবিবুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ পাকের প্রিয়জনদের তিনি হলেন দলপতি, তাই তিনি হাবিবুল্লাহ।[১]

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ

"যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও"।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মুসা! আমারই সম্মুখে এবং আমারই তত্ত্বাবধানে যেন তোমার প্রতিপালন হয় এবং কেউ যেন তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম না হয় এবং চরম শত্রুর গৃহে প্রতিপালিত হয়েও তুমি যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাক, এজন্যে মানুষের মনে তোমার জন্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছি।

প্রণিধানযোগ্য বিষয়

আল্লাহ পাক যখন কাউকে রক্ষা করতে চান তখন কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারেনা। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক যখন কারো ধ্বংসের ইচ্ছা করেন তখন কেউ তাকে রক্ষা করতে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮২

পারেনা। আজকে বিজ্ঞান যেমন উন্নতি করছে, এমনকি উন্নতির উৎসে পরিণত হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। তখন তাই ছিল সর্বাধুনিক বিজ্ঞান। জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে সতর্ক করেছিল যে, বণী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এমন এক শিশুর জন্ম হবে যে তোমার ধ্বংসের কারণ হবে। এ কারণেই ফেরাউন বণী ইসরাঈলের নবজাত শিশুদের হত্যা করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিল। আর এ নির্দেশের বাস্তবায়ন-কল্পে বণী ইসরাঈলের হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মলগ্নে তাঁর মাতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ব্যাকুল ছিলেন। আল্লাহ পাক এলহামের মাধ্যমে তাঁকে পথ-নির্দেশ করেছেন এবং শিশু মূসা (আঃ)-কে তাঁর ঘাতক ফেরাউনের বাড়ীতে পৌছে দিয়েছেন এবং তার দ্বারাই তাঁর প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন, শুধু তাই নয়; বরং হযরত মূসা (আঃ)-এর জননীর শান্তি এবং সান্ত্বনার জন্যে শিশু মূসাকে তাঁর মায়ের কোলে পৌছে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ যা আল্লাহ পাকের মর্জি তাই হয়, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরম করুণাময়, অশেষ দয়াময়।

এরপর যা ঘটেছে তার বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ

"যখন তোমার ভগ্নি এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলব যে কে এই শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তখন আমি তোমাকে তোমার জননীর নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে করে তার নয়ন জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না হয়"।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রইলেন। মায়ের মন, কি হয় কে জানে, তাই মূসা (আঃ)-এর ভগ্নিকে গোপনে খবর নেয়ার দায়িত্ব দিলেন। মূসা (আঃ)-এর ভগ্নি নীল নদের তীরে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে এবং লক্ষ্য করতে থাকে।

এদিকে ফেরাউনের ঘরে এই ফুটফুটে সুন্দর শিশুটির দুগ্ধপানের অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ঐ শিশু কারো দুগ্ধই পান করল না। ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া তাই অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন, ঠিক এমন সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর বোন যেন ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাদের অস্থিরতা ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে বললেনঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ

"আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, কে এ শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করবে"?

যখন তারা এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করল তখন সে তার মাতাকে ফেরাউনের প্রাসাদে নিয়ে আসল এবং শিশু মূসা (আঃ) তাঁর মাতার কোলে গিয়ে, দুধ পান করতে লাগলেন অতীব প্রশান্তিতে। এভাবে আল্লাহ পাকের কৃত ওয়াদা পূর্ণ হল যে, আমি তাকে তোমার

কোলে ফিরিয়ে আনব।[১]

তৌরাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নির নাম লেখা হয়েছে মরয়ম। হযরত মূসা (আঃ) থেকে তিনি পনের বছর বড় ছিলেন।[২]

উল্লেখ্য, হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা যখন তাঁকে কোলে নিলেন, তখন তিনি দুধ পান করতে আরম্ভ করেন অথচ ইতিপূর্বে অনেকেই তাঁকে কোলে নিয়ে এই চেষ্টা করেছে কিন্তু তিনি কারো দুধ পান করেননি। এ অবস্থায় ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা বললেন, আমি তো সর্বদা এখানে থাকতে পারব না, আপনারা রাজি থাকলে আমি তাকে আমার গৃহে নিয়ে যেতে পারি, তার আদর-যত্নে কোন ত্রুটি হবে না, তখন তারা এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনি পুত্র মূসা (আঃ)-কে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং রাজকীয় ধাত্রীরূপে শিশু মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন।

وَقَتَلْتَ نَفْسًا

"আর তুমি একটি লোককে হত্যা করেছিলে, এরপর আমি তোমাকে সে দুঃখ থেকে নিস্কৃতি প্রদান করি"।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে কাসাসে স্থান পয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে ঘটনা এইঃ একজন কাফের জালেম বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির উপর জুলুম করছিলো। ঐ মজলুম হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করলো, হযরত মূসা (আঃ) ঐ জালেমকে একটি ঘুশি মেরেছিলেন। পরিণামে লোকটির মৃত্যু হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বিবরণ দিয়েছেন। তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর ফেরাউনের লোকদের হাতে ধৃত হওয়ার আশংকা ছিল, এতদ্ব্যতীত আখেরাতের শাস্তির ভয়ও ছিল, আল্লাহ পাক তাঁকে উভয় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ

"(হে মুসা!) আমি তোমাকে সে বিপদ থেকে নিস্কৃতি দিয়েছি"।

যেহেতু অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ ঘটনাটি ঘটেছে, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ফেরাউনের লোকদের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের যে ভয় ছিল আল্লাহ পাক তা-ও দূর করেছেন। ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁকে মিসর থেকে সুদূর মাদায়েনে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। এভাবে ফেরাউনের জুলুম থেকে আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করেন, আর আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে তওবা করার তওফিক দান করেন এবং তাঁর তওবা কবুল করেন।

وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا

"আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করি"।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৮৩
২। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪০

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির তরজমা করেছেন এভাবেঃ "আর আমি তোমাকে অত্যন্ত বেশী পরীক্ষা করি"।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এ বাক্যটি তরজমা করেছেন এভাবেঃ আমি তোমাকে অধিক পরিমাণে যাচাই বাছাই করি, অথবা এর অর্থ হলো আমি বিভিন্ন ভাবে তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করি।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের তরজমা করেছেনঃ আমি তোমাকে খাঁটি করে নিয়েছি, অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম এবং বিপদাপদে ফেলে তোমাকে নিখাদ এবং নিখুঁত করে নিয়েছি।

হযরত মুসা (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষা

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বিভিন্ন বিপদাপদের সম্মুখীন করে তাঁকে কঠিন পরীক্ষা করেছেন এবং ঐ বিপদাপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন।

(১) প্রথম বিপদ হল, তাঁর জন্ম এমন সময় হয়েছে যখন ফেরাউনের লোকেরা নবজাতকদের হত্যা করতো। আল্লাহ পাক কিভাবে এ বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন তার বিবরণ ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় বিপদ ছিল এই, তাঁকে কাষ্ঠ-নির্মিত সিন্দুকে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ পাক সেখান থেকেও তাঁকে রক্ষা করেছেন।

(৩) তিনি তাঁর মাতা ব্যতীত আর কারো দুধ পান করতে রাজী হননি, আল্লাহ পাক তাঁকে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

(৪) শৈশবে তিনি একবার ফেরাউনের দাঁড়ি ধরে টেনেছিলেন, ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো কিন্তু তাঁর স্ত্রী আসিয়ার সুপারিশক্রমে আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করেছেন।

(৫) কাফের কিবতীকে তিনি এক ঘুষি দিয়ে হত্যা করেছিলেন, এরপর তিনি মাদায়েনে গমন করেছিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে তাঁকে রক্ষা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত দেশ থেকে চলে যাওয়া, পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা, পাথেয় না থাকা, ফেরাউনের লোকদের দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার আশংকা থাকা, একের পর এক এমনি বিপদ তাঁর উপর এসেছিলো। এসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ হযরত মূসা (আঃ)-কে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়। যেভাবে স্বর্ণকে আগুনে ফেলে তার ময়লা দূর করে তাকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করা হয় ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে কঠিন বিপদ দ্বারা পরিচ্ছন্ন, পবিত্র এবং নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তুলেছেন।[১]

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ أَهْلِ مَدْيَنَ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৮৩-৮৪

"এরপর তুমি মাদায়েনে কয়েক বছর অবস্থান কর"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে হযরত মূসা (আঃ) মাদায়েনে দশ বছর ছিলেন। মিসর থেকে মাদায়েনের দূরত্ব আট মঞ্জিলের। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যার সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবাহ হয়।

ওহাব এবনে মোনাব্বাহ বলেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট ২৮ বছর ছিলেন। সেখানে তার সন্তান-সন্তুতি হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সাহরা।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বিবাহের সময় এ শর্ত দিয়েছিলেন যে, আট বা দশ বছর যাবত হযরত মূসা (আঃ) তাঁর নিকট অবস্থান করবেন। প্রথম দশ বছর এ শর্ত মোতাবেক অবস্থান করেন, এরপরও আঠার বছর অতিবাহিত করেন।[১]

ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى

"হে মূসা! এরপর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে যে সময় নিদিষ্ট করেছিলেন, সে সময়ই তিনি এসেছিলেন। মোহাম্মদ এবনে কা'ব এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল-আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট ওহী প্রেরণের যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সময়ই তিনি পবিত্র ময়দানে তুয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত সমস্ত নবী রসূলগণের নিকট তাদের চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার পর আল্লাহ পাকের ওহী এসেছে, তাঁরা নবুওয়্যত লাভ করেছেন। عَلٰى قدر শব্দ দ্বারা সে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ বাক্যটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো, হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণের জন্যে আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি পবিত্র ময়দানে তুয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। এতে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের যে.এহসান রয়েছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার عَلٰى قدر শব্দটির এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে হে মূসা! তুমি সঠিক সময়ে উচ্চ মরতবায় উন্নীত হয়েছ অর্থাৎ রেসালত ও নবুওয়্যত লাভে ধন্য হয়েছ। আমি তোমাকে আমার বিশিষ্ট পয়গম্বর হিসাবে মনোনীত করেছি।

অর্থাৎ এতসব ঘটনা প্রবাহের পর আজ তুমি ময়দানে তুয়ায় উপস্থিত হয়েছ, জন্মের পর কি করা হয়েছে, কিভাবে তোমাকে মিসর থেকে মাদায়েন চলে যেতে হয়েছে, আর কিভাবে আজ তুমি ময়দানে তুয়ার এ পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়েছ তা অবশ্যই চিরস্মরণীয়। রাতের অন্ধকার, তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ, তোমার স্ত্রীর একান্ত প্রয়োজনের সময় একটু অগ্নির সন্ধানে তুমি বের হয়েছ, আর এমন মুহূর্তে আল্লাহ পাক তোমাকে নবুওয়্যত দান করলেন, আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমত বুঝবার ক্ষমতা আছে কার? আল্লাহ পাকের যা

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬

মর্জি হয় তাই হয়। এখানেই রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।

আলোচ্য ঘটনার বর্ণনায় বারে বারে يٰمُوسٰى বলে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ডাক দিয়েছেন। তফসীরকারগণ লিখেছেন, এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি দয়া-মায়া এবং বিশেষ রহমত নাজিল করেছেন, তাঁকে বিশেষ ভাবে এর দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং এভাবে সম্বোধন করে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের যে মহব্বত রয়েছে, তা প্রকাশ করেছেন।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার জন্যে যার মহব্বত থাকে, সে বারে বারে তাকে স্মরণ করে।[১]

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ

"আর আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে প্রস্তুত করে নিয়েছি"।

অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার নবুওয়্যত এবং রেসালতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করে নিয়েছি, আমি তোমাকে নিজের জন্যে মনের মতো করে গড়ে তুলেছি, আমি তোমাকে পছন্দ করেছি আমার নবুওয়্যতের দায়িত্ব অর্পণের জন্যে। অতএব তোমার দায়িত্ব হলো আমার মর্জি মোতাবেক তোমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। অথবা এর অর্থ হলো, তোমাকে চরিত্র-মাধুর্য দিয়ে তৈরী করেছি আর এভাবে তোমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলার, আমার নৈকট্য-ধন্য হওয়ার এবং আমার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর যোগ্যতা অর্জন কর।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ

"তুমি ও তোমার ভাই আমার প্রদত্ত নির্দশন সমূহ সহ এগিয়ে যাও"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'আয়াত' শব্দ দ্বারা সে সব মোজেযা বা অলৌকিক শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিলো, আল্লাহ পাক এ আদেশ দিয়েছেন, হে মূসা! তুমি এবং তোমার ভাই ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাও, তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহবান জানাও।

وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ

"আর আমার স্মরণে গাফলত করোনা"।

হযরত হারুন (আঃ) তখন মিসরে ছিলেন। আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, হারুনের নিকট যাও। আর এদিকে হারুন (আঃ)-কেও ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তুমি মূসার সঙ্গে একত্রিত হও। আদেশ মোতাবেক হযরত হারুন (আঃ) মিসর থেকে বের হয়ে আসেন আর মূসা (আঃ) মিসরের দিকে রওয়ানা হন। পথেই উভয়ের মোলাকাত হয়।

১। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪১
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮৫

একথাও বর্ণিত আছে, হযরত হারুন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর আগমনের খবর পেয়ে তাঁর সম্বর্ধনার জন্য বের হয়ে আসেন।

তখন তাঁরা একত্রিত হন। এই সময় আল্লাহ্ পাক আদেশ দেনঃ

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমা লংঘন করেছে"।

কারণ সে খোদায়ী দাবী করেছে। আল্লাহ্ পাক প্রথমে মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কাছে যেতে হুকুম করেছেন, এরপর দু' ভাইকে একত্রে হুকুম করেছেন।

তবলীগ হবে বিনম্র ভাষায়

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

"তোমরা তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলো"।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কথা বলার সময় যেন কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করা হয়। একরামা এবং সুদ্দী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, ফেরাউনের নাম নিও না, বরং উপাধি দ্বারা তাকে সম্বোধন করে কথা বলো। আর ফেরাউনের উপাধি ছিল আবুল আব্বাস অথবা আবুল ওয়ালীদ।

মোকাতেল (রঃ) বলেন যে, বিনম্র ভাষায় কথা বলার অর্থ হল এভাবে কথা বলাঃ

هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى

"তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি পবিত্র হও? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর"।

বিনম্র ভাষায় কথা বলার হুকুম করা হয়েছে পরামর্শ স্বরূপ। কারণ যদি সরাসরি তার নাম ধরে কথা বলা হয় তবে এ আশংকা থেকে যায় যে ফেরাউন তার মূর্খতার কারণে হয়তো তাঁদের উপরে আক্রমণ করে বসবে, তার দৌরাত্ম, ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাবে, ঈমান আনয়নের সম্ভাবনা লোপ পাবে তাই তাকে বিনম্র ভাষায়, ভদ্রভাবে দ্বীন ইসলাম গ্রহণের জন্যে মধুর আহবান জানাবার হুকুম হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বিনম্র ভাষায় কথা বলার হুকুম হওয়ার একটি কারণ হল, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালন হয়েছে ফেরাউনের ব্যবস্থাপনায়। তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তার প্রতিপালনের হক্ব ছিল।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, বিনম্র ভাষায় কথা বলার হুকুমের কারণ হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের সঙ্গে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, যদি তুমি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর তবে তোমাকে পুনরায় এমন স্থায়ী যৌবন দেয়া হবে যা কখনও বিদায় হবে না। তুমি চির যৌবন লাভ করবে এবং আমৃত্যু তোমার ক্ষমতা বহাল থাকবে। পানাহারের স্বাদ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি ভোগ করবে এবং মৃত্যুর পর তুমি লাভ করবে জান্নাত।

ফেরাউন একথা পছন্দ করেছিল। কিন্তু তার উজির হামানের পরামর্শ ব্যতীত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করছিল না। তখন হামান উপস্থিত ছিল না। হামান আসলে ফেরাউন তার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কথাও তাকে শুনিয়ে দিল। হামান বললো, আমি আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। আপনি হলেন উপাস্য, আপনার উপাসনা করা হয়, অথচ মূসা (আঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করা হলে আপনাকে অন্যের এবাদত করতে হবে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এ আয়াতে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা প্রত্যেক মোবাল্লেগের মনে রাখা উচিত। যাকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয় সে যত কঠোরই হোক না কেন মোবাল্লেগকে অবশ্যই নম্র ভাষী হতে হবে। সূরায়ে নহলের একখানি আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"(হে রসূল!) আপনার পরওয়ারদেগারের পথের দিকে আহবান করুন, কৌশলে এবং উত্তম উপদেশ দিয়ে। আর তাদেরকে উত্তম ভাবে বুঝিয়ে দিন"।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ওয়াহাব এবনে মুনাব্বাহ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ বিনম্র ভাষায় কথা বলার তাৎপর্য হল আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছেন যে ফেরাউনকে বলঃ "আমার গজবের উপর আমার রহমত প্রাধান্য লাভ করেছে"।

একরামা (রঃ) বলেছেন, বিনম্র ভাষায় কথা বলার অর্থ হল আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি তাকে আহ্বান করা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরাউনকে জানিয়ে দাও যে তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক, মৃত্যুর পর তোমাকে তাঁর মহান দরবারে হাযির হতে হবে, যেখানে জান্নাত এবং দোযখ রয়েছে। হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এর তাৎপর্য হল ফেরাউনকে আমার দুয়ারে এনে হাযির কর এবং বিনম্র ভাষায় তার সঙ্গে কথা বল। হযরত হাসান বসরী (রঃ) একথাও বলেছেন যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছেনঃ যে-পর্যন্ত তার সকল ওজর শেষ না হয়ে যায় সে-পর্যন্ত তার ধ্বংসের জন্যে বদ দোয়া করোনা।

لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে"।

অর্থাৎ ফেরাউনকে সত্যের আহবান জানানোর জন্যে আল্লাহ পাক যে পথ নির্দেশ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮৬
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৫৮

করেছেন তা মেনে চললে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অথবা আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করতে পারে অর্থাৎ যদি সে তোমাদের উপদেশ গ্রহণ না করে তবে অন্ততঃ আল্লাহর আযাবকে ভয় করেও পথে আসতে পারে। হয়তো সে তোমাদের কথা মানতেও পারে, তাই তাকে সত্যের আহবান জানাতে গাফলত করোনা বা এ পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে বসে যেয়ো না।[১]

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ
أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ
وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ
اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىٓ أَعْطَىٰ
كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪৫) তাঁরা উভয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করছি সে আমাদের উপরে আক্রমণ করতে পারে, অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করতে পারে।

(৪৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তোমরা ভয় করোনা। নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমি শুনি, আমি দেখি।

(৪৭) অতএব তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের দূত। অতএব বণী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে নিয়ে এসেছি তোমার নিকট নিদর্শন। আর যারা সত্য পথের অনুসারী হয় তাদের জন্যে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা।

(৪৮) নিশ্চয় আমাদের নিকট ওহী এসেছে যে শাস্তি তার জন্যে, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৪৯) ফেরাউন বললো, "হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে?"

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৩৭

(৫০) মূসা বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি বস্তু মাত্রকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, এরপর পথ-নির্দেশ করেছেন।

(৫১) ফেরাউন বললো, তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট সত্যের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার এবং তাকে হেদায়েত করার আদেশ দিয়েছেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর আরজীর কথা। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ফেরাউনের পথে আসা না আসা তো পরের কথা, আমাদের আশংকা হল প্রথম মোলাকাতেই সে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। অথবা আপনার সম্পর্কে কোন অসহনীয় উক্তি করে বসতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে এবং তাকে আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত কোন মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের পূর্বেই সে আমাদেরকে হত্যা করার বা নির্যাতন করার আদেশ দিয়ে বসতে পারে, অথবা সে তোমার শানে বেআবদী করে বসতে পারে, অথবা তোমার বন্দাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।[১]

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ তোমরা কোন প্রকার ভয় করোনা, কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সব কথাবার্তা হবে তা আমি শুনতে পাবো। আর তোমাদের সাথে সে যে আচরণ করে তা আমি দেখতে থাকবো আর আমি সঙ্গে থাকলে তোমাদের কিসের ভয়? অর্থাৎ তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে যেন সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। আর আমি তোমাদের সাহায্য করতে থাকবো, যাতে করে তোমাদের উপর কোন বিপদ না আসে।

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

"অতএব, তোমরা তার নিকট যাও এবং বল আমরা তোমার প্রতিপালকের দূত, তাই বণী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা"।

অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তোমার নিকট এবং বণী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেছেন। এখানে কয়েকটি কথা রয়েছে।

১. সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকই, তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে তাঁর রসূল প্রেরণ করে থাকেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৮৭
তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬২

২. আমরা উভয়েই আল্লাহ পাকের প্রেরিত পয়গম্বর হিসাবেই এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং শুধু এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করতে থাক। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (সূরা নাযিআত)

"এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি পবিত্র হও। আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে করে তুমি তাঁকে ভয় কর"।

এতদ্ব্যতীত, এ আয়াতে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে তা হল বণী ইসরাঈল সম্পর্কীয়। হে ফেরাউন! তুমি বণী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে সিরিয়ায় যেতে দাও, মিসর ত্যাগে তাদেরকে বাধা দিওনা। তারা যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে সেখানে বসবাস করতে আপত্তি করোনা, আর তাদেরকে তোমার গোলামী করার জন্যে বাধ্য করোনা। কেননা, ফেরাউন বণী ইসরাইল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো, তাদের দ্বারা কঠিন ও কষ্টকর কাজ আদায় করতো।

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ

"আর আমরা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে এনেছি নিদর্শন"।

অর্থাৎ আমরা যে তোমার কাছে এসেছি দলিল প্রমাণ বিহীন আসিনি; বরং নবুওয়্যত, রেসালতের যথেষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছি। পূর্ববর্তী আয়াতে নবুওয়্যতের দাবীর উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে নবুওয়্যতের প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। এরপর একটি নীতি নির্ধারণের কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

"যারা সত্য পথের অনুসারী হয় তাদের জন্যে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা"।

অর্থাৎ যে আমাদের হেদায়েত গ্রহণ করে, সে সরল সঠিক পথে চলে, তার জন্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ............الاية (সূরা বাকারা)

"যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন উপদেশ আসে, তখন যারা সেই উপদেশের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবেনা"।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত আহবানকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

"নিশ্চয় আমাদের নিকট এ প্রত্যাদেশ এসেছে যে, আল্লাহ্ পাকের আযাব সে ব্যক্তির জন্যে যে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়"।

অর্থাৎ যে আল্লাহর নবীকে অমান্য করে, নবীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে তার জন্যে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের কঠোর, কঠিন শাস্তি। হযরত মূসা (আঃ) সরাসরি ফেরাউনকে তার শাস্তির কথা বলেননি; বরং একটি নীতি-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হবে তাদের শাস্তি অবধারিত। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

"তোমরা তার সাথে বিনম্রভাবে কথা বল"।

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى

"ফেরাউন তখন দম্ভ-ভরে বলে, হে মূসা! তোমরা যাঁর প্রেরিত বলে দাবী করছো তোমাদের সেই প্রতিপালক কে?"

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

"মূসা বললেন, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর পথ বলে দিয়েছেন"।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি জিনিসকে তার কল্যাণের সরঞ্জাম দিয়েছেন এবং তা অর্জনের পথও নির্দেশ করেছেন।

মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি বস্তুকে তার জন্যে সঠিক আকৃতি দান করেছেন। জীব-জন্তুকে মানুষের আকৃতি দেননি, মানুষকে জীব-জন্তুর আকৃতি দেননি। এরপর পানাহার এবং কামাচারের পথ বাতলিয়েছেন।

সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি মাত্রকে তার জুটি দিয়ে দিয়েছেন নরকে নারী, উষ্ট্রকে উষ্ট্রী প্রভৃতি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেছেন যার দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে, এরপর তাকে উপকৃত হওয়ার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন এবং আমৃত্যু জীবন যাপনের পথ নির্দেশ করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা এর দ্বারা সৃষ্টি মাত্রেরই অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। আর একথাও বর্ণনা করা হয়েছে, মহিমময় আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সকল নেয়ামত তিনিই দান করেন। সৃষ্টি মাত্রেরই স্রষ্টা তিনি, আর প্রতিটি সৃষ্টি তার অস্তিত্ব লাভে এবং গুণাবলী অর্জনে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাবের তাৎপর্য হল, হে ফেরাউন! তুমি আমার প্রতিপালকের কথা জিজ্ঞাসা করছো? জেনে রাখ নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব তাঁরই দান। প্রত্যেকটি বস্তুকে তিনিই দান করেছেন আকার-আকৃতি। সৃষ্টি মাত্রের যাবতীয় প্রয়োজনের

আয়োজন তিনিই করেছেন। সৃষ্টি মাত্রকে তার সকল শক্তি তিনিই দান করেছেন। প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার পানাহারের তথা জীবন যাপনের পথ ও পন্থা তিনিই বাতলিয়েছেন। একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, লা-শরীক আল্লাহ পাকই আমাদের প্রতিপালক। ফেরাউন এসব যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে শুধু অবাকই হয়নি; বরং লা-জবাব হয়েছে। তাই সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছে,

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى

"ফেরাউন বলে, তবে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর খবর কি"?

যদি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের এত অকাট্য দলিল প্রমাণ এবং এত সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকে তবে জিজ্ঞাসা করি পূর্বকালের জাতিগুলোর কি অবস্থা হয়েছে? অর্থাৎ নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আ'দ জাতি, সামূদ জাতি প্রভৃতির কি অবস্থা হয়েছে? তারা মূর্তি পূজক ছিল, এক স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতো এবং কেয়ামতকেও অস্বীকার করতো, এসব যুক্তি সঙ্গত সত্যকে তারা মানে নাই, তুমি যদি সত্য নবী হও তবে এসব কথা তোমার অজানা থাকার নয়। তাদের কি অবস্থা আমাদেরকে জানাও। যেহেতু তুমি একথা বলেছ যে,

اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

"নিশ্চয় সে ব্যক্তির জন্যে আযাব যে সত্যকে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়"।

তাহলে ইতিপূর্বে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে এবং তাদের যুগের রসূলগণের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কী অবস্থা?

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন, ফেরাউন তার জবাব প্রদানে অপারগ হয়েছে তাই সে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে।

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ
اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫২) মূসা বললেন, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার প্রতিপালক কখনও ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

(৫৩) যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা, আর তাতে তোমাদের জন্যে পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করেছেন, আর আসমান থেকে তিনি বারি বর্ষণ করেন। এরপর আমি তা দ্বারা রকমারি উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

(৫৪) তোমরা আহার কর, তোমাদের গবাদি পশু চরাও, নিশ্চয় এতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন।

(৫৫) মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং পুনরায় তোমাদেরকে মাটি থেকে বের করবো।

(৫৬) এবং আমি ফেরাউনকে যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করে এবং অমান্য করে।

(৫৭) সে বললো, হে মূসা! তুমি কি তবে আমাদের নিকট এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করার জন্যে?

(৫৮) তাই আমরাও তোমার বিরুদ্ধে এমনই এক যাদু পেশ করবো। অতএব, আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর একটি নিদৃষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবোনা এবং তুমিও করবে না।

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউনের কথার জবাবে হযরত মূসা (আঃ) বললেন, অতীতের জাতিগুলো সম্পর্কে এলম শুধু বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। লওহে মাহফুজে অথবা তাদের আমলনামায় সব কিছু সংরক্ষিত রয়েছে। পুরস্কার এবং শাস্তির দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। আমার প্রতিপালক কখনও ভুল করেন না, আর তিনি ভোলেনও না। কোন পাপীষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর ধরা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনা। তাঁর পবিত্র সত্ত্বা ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। ভুল-ভ্রান্তি তাঁর মহান দরবারে অকল্পনীয়। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। আর কোন কিছু তাঁর ভুলে যাওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, لَا يَضِلُّ শব্দটির অর্থ হলো, কোন কিছুই আল্লাহ পাকের দরবার থেকে অদৃশ্য নয়। আর আমার প্রতিপালক কোন স্থান থেকে অনুপস্থিতও নন। আর لَا يَنْسَى এর অর্থ হলো, আমার প্রতিপালক তাঁর বন্দাগণের অবস্থা ভুলে যান না। সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তিনি প্রত্যেককে তার কৃত-কর্মের বিনিময় দান করবেন। ভাল কাজের ফল ভাল হবে, আর মন্দ কাজের পরিণতি হবে মন্দ।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৭৫
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯০

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

"যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা, তাতে তোমাদের জন্যে পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করেছেন"।

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে তিনি আমাদের প্রতিপালক, যিনি বিশাল বিস্তৃত জমিনকে ধূসর শয্যা রূপে তৈরী করেছেন, শুধু তাই নয়; বরং তোমাদের যাতায়াতের জন্যে তিনি পথ-ঘাটের ব্যবস্থাও করেছেন। তোমরা জমিনের উপর বিশ্রাম করে থাক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত কর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বাক্যটির তরজমা করেছেন এভাবেঃ আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজ করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং সহজে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পার, অর্থাৎ তোমাদের জন্যে জীবন ধারণের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى

"তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর আমি তা দ্বারা রকমারি উদ্ভিদ উৎপন্ন করি"।

আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকই, যিনি তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। আর সে পানির দ্বারা তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ, তরু-লতা, বাগ-বাগিচা এবং নানাবিধ ফল-ফলারি পয়দা করেন। এরপর এসব ভোগ করার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ

"তোমরা আহার কর এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকে তাতে চরাতে থাক"।

অর্থাৎ যেভাবে জমিনে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বসবাস করার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি তিনি আসমান থেকে বারিপাত করিয়ে জমীনে তোমাদের জন্যে খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন করেছেন এবং তা ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً

এ পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা শেষ হয়েছে। এরপর فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ থেকে আল্লাহ পাক সরাসরি মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে আমি তোমাদের জন্যে জমীনে নানা প্রকার খাদ্য-দ্রব্য পয়দা করেছি। তবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন যে একথাগুলো হযরত মূসা (আঃ)-এরই, যা তিনি ফেরাউনকে বলেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর কথারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হলোঃ আল্লাহ

পাক আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন এবং পানি দ্বারা জমীনে অনেক রকম খাদ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ভোগ কর, নিজেরা পানাহার কর এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারদেরকেও খাদ্য সরবরাহ কর এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর।

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى

"নিশ্চয় এসব কিছুর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে"।

অর্থাৎ এসব বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং মহান দাতার অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে যারা বুদ্ধিমান, যারা বিবেকবান, যারা পরিণামদর্শী তারাই শুধু এসব নিদর্শন দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে যারা নির্বোধ তারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা।

বস্তুতঃ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অন্যায় ও অসুন্দর কাজ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় তোমাদেরকে মাটি থেকে বের করবো"।

অর্থাৎ মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মাটি দ্বারাই তৈরী করেছেন। মানুষ যে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে এবং যা দ্বারা তার দৈহিক প্রতিপালন হয় তার মূলেও রয়েছে মাটি। মাটি থেকে উৎপাদিত বস্তুই মানুষের দৈহিক উন্নতি, পরিবৃদ্ধির উপকরণ হয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

অর্থাৎ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

আর এ মাটিতেই ফিরিয়ে আনব। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটির তৈরী দেহ মাটিতেই ফিরে আসবে। কিন্তু মাটির সাথে মিশে হারিয়ে যাবে না; বরং কেয়ামতের দিন মাটিতে পরিণত ঐ দেহের প্রতিটি অংশকে একত্রিত করে জীবিত করে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন মৃত ব্যক্তির দাফনের পর তাঁকে কবরে রাখার সময় প্রথম বার বললেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

দ্বিতীয়বার মাটি দিতে গিয়ে বললেনঃ

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

আর তৃতীয়বার মাটি দিতে গিয়ে বললেনঃ[১]

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তার নাভিতে সেই মাটি অবশ্যই থাকে যা দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যখন সে তার জীবনের সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় (বৃদ্ধকালে) পৌঁছে যায়, তখন যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মাটির দিকে তাকে প্রত্যাবর্তন করা হয়, আর তাতেই তাকে দাফন করা হয়।

এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে জা'ফর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমার জন্যে মোবারকবাদ যে তোমাকে আমার খামির দ্বারা তৈরী করা হয়েছে, আর তোমার পিতা ফেরেশতাদের সাথে আসমানে উড়ে বেড়ায়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরও লিখেছেন, আল্লাহ পাক যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই জমিনের কিছু অংশ কোন কোন মানুষকে তৈরী করার জন্যে নিদৃষ্ট করেছেন (অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের লোক সৃষ্টির যোগ্যতা আল্লাহ পাক মাটির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। যে মাটির মধ্যে কোন পয়গম্বর সৃষ্টির যোগ্যতা রাখা হয়েছে জমিনের সে অংশে নূর ও বরকত একাধারে নাজিল হতে থাকে, যাতে করে ঐ নূরানী মাটি দ্বারা নবীর দেহের খামির তৈরী হয়। আর কোন নবীর দেহ তৈরী হয়ে গেলে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব নয়। তাই নবীর দেহ তৈরীর পর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা হয়তো অন্যকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবে নবীর খামির বরকত অন্যের মধ্যে এসেছে, যে নবী নয়)।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের ফুফুর সম্মান কর অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের সম্মান কর কেননা, আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর তাঁর জন্যে তৈরী অবশিষ্ট মাটি দ্বারা খেজুর বৃক্ষ তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নিকট খেজুর বৃক্ষের চেয়ে সম্মানিত কোন বৃক্ষ নেই। আর এ খেজুর বৃক্ষের নিচেই (আল্লাহ পাকের কুদরতের নমুনা স্বরূপ) মরয়ম বিনতে এমরানের ছেলে পয়দা হয়েছিল (ঈসা (আঃ)। তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খেজুর খেতে দাও। অন্যান্য সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এবনে আসাকের হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ খেজুর, আনার এবং আঙ্গুর বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে আদম (আঃ)-এর তৈরীর পর তাঁর অবশিষ্ট মাটি থেকে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৭৬
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯৩

تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মানুষকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হবে।

এর তাৎপর্য হল– মানব দেহের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তা পুনরায় একত্রিত করা হবে এবং সাবেক আকৃতি দিয়ে তার মধ্যে পুনরায় রূহ ফুকে দেয়া হবে।

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

"এবং আমি ফেরাউনকে যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করে এবং অমান্য করে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে যে সব মোজেযা দিয়েছিলেন যেমন লাঠি, যা আল্লাহ পাকের কুদরতে ক্ষণিকের মধ্যে অজগর সর্পে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর হস্ত উজ্জল শুভ্র হওয়া, যা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর, এসব মোজেযা ফেরাউনকে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্বেও সে সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর নবীর কথাকে অমান্য করেছে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বক্তব্যের তাৎপর্য

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানালে সে প্রশ্ন করলো কে তোমাদের প্রতিপালক? তখন তিনি এমনভাবে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের উপর অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণনা করলেন যার প্রতি উত্তর দেয়া ফেরাউনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন ফেরাউন এ কারণে ভীত হয় যে হয়তো তার জাতি হযরত মূসা (আঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ, তথ্যবহুল, সুস্পষ্ট বক্তব্য শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ফেরাউনকে অমান্য করবে, তাই সে এ বিষয়ে আর কথা না বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো এবং নতুন করে এ প্রশ্ন করলো, তোমার মতে যারা তোমার নবুওয়্যতকে অস্বীকার করবে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাককে অস্বীকার করবে তারা শাস্তি পাবে, তাহলে পূর্বকালের লোকদের অবস্থা কি হবে, যারা নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। ধূর্ত ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল যখন হযরত মূসা (আঃ) বলবেন, তারা দোযখী হয়েছে তখন লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু মূসা (আঃ) সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে পূর্বকালের লোকদের অবস্থা আল্লাহ পাকই জানেন। নবীর জন্যে অতীতের জ্ঞান অর্জিত হওয়া জরুরী নয়। এ জবাবের কারণে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল।

এলমে গায়বের মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণকে যা জানিয়ে দেন তাই তাঁরা জানেন। মূসা (আঃ) বলেন, আমার প্রতিপালক সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানে কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাও নেই। পূর্বকালের লোকদের অবস্থা যেমন আমি জানিনা, তেমনি তুমিও জাননা, এমন অবস্থায় কোন্ যুক্তিতে

তুমি খোদায়ী দাবী কর, যে খোদা হবে সে সব কিছু জানবে। অতএব, তোমার খোদায়ী দাবী হল ভিত্তিহীন মূর্খতা এবং বাতুলতা মাত্র। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের রসূল, তোমাকে সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্যে এসেছি। এরপর হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় আল্লাহ পাকের তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহবান জানিয়ে বলেছেন, হে ফেরাউন! একটু বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ কর, সত্য অনুধাবনে সচেষ্ট হও, তুমি যে জমিনে বাস করছো তা আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তুমি যে পৃথিবীতে যাতায়াত কর তার ব্যবস্থা আমার প্রতিপালকই করেছেন, তুমি যে পানাহার কর তা নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালকেরই অবদান, তিনিই তো আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, তিনিই তো জমিনে সব কিছু উৎপন্ন করেন, তুমি কি লক্ষ্য কর না? একই পানি একই মাটি অথচ বিভিন্ন ফল, তার বর্ণ ও স্বাদ সবই ভিন্ন, এসব কিছুই আমার প্রতিপালকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব নমুনা। অতএব, তুমি জমিন আসমানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার আহার্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এর কোন কিছু কি তুমি সৃষ্টি করেছ? তবে কোন্ যুক্তিতে খোদায়ী দাবী কর?

হযরত মূসা (আঃ) একথাও বলেছেন, স্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে বুদ্ধিমান মাত্রই বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, এটি তোমারও কর্তব্য। মনে রেখ, আমার প্রতিপালক তোমাকে আমাকে তথা সমগ্র বিশ্ব মানবকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অহংকার করোনা। আর একথাও জেনে রেখ, প্রতিটি মানুষকে পুনরায় মাটিতেই ফিরে যেতে হবে, কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাকে পুনঃজীবন দান করবেন এবং প্রত্যেককে তার জীবনের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, যিনি তোমাকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার মৃত্যুর পর জমিনের কাছে আমানত রাখবেন তাঁর পক্ষে তোমার পুনঃরুত্থান আদৌ কঠিন নয়। একথার পরই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে অভিশপ্ত ফেরাউনের যে কথাবার্তা হয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আমি ফেরাউনকে সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মোজেযা সমূহকে যাদু বলেছে।[১]

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ

"সে বললো, হে মূসা! তবে কি তুমি আমাদের নিকট এজন্যে এসেছ, যেন তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিস্কার কর"।

অর্থাৎ ফেরাউন তার দলবলকে উত্তেজিত করতে বললো, তোমার উদ্দেশ্য ভাল মনে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৪

হচ্ছেনা, তুমি এবং তোমার সহযোগী উভয়ে মিলে তোমাদের যাদু বলে আমাদেরকে আমাদের দেশ (মিসর) থেকে বহিস্কার করতে চাও এবং আমাদেরকে দেশান্তরের মাধ্যমে আমাদের দেশের উপর তোমার ক্ষমতা বিস্তার করতে চাও?

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ

"তাই আমরাও তোমার বিরুদ্ধে এমনই এক যাদু পেশ করবো। অতএব, আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর একটি সময় ও মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না, তুমিও করবে না"।

অর্থাৎ হে মূসা! তুমি যাদু দ্বারা আমাদেরকে মিসর থেকে বহিঃস্কার করতে চাও, আর মিসর দখল করতে চাও, আমরা সহজে তা ছাড়বোনা, তোমার যাদুর মোকাবেলা যাদু দিয়েই করবো। তবে এ মোকাবেলা করার জন্যে একটি সময় নিদৃষ্ট করা উচিত, কখন কোথায় মোকাবেলা হবে। দিন-ক্ষণ এবং স্থান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হবে আমরা তার বরখেলাফ করবো না, তোমরাও করবে না। তবে স্থানটি এমন হওয়া উচিত যেখানে সর্ব সাধারণ সহজে দেখতে পায়, কারো পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়। এভাবে ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে দ্বীন ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্যে চ্যালেঞ্জ করলো।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ
يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ
يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴿٦٣﴾
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٥﴾

তরজমা

(৫৯) মূসা বললেন, উৎসবের দিনই তোমাদের নির্ধারিত সময়, বেলা বাড়লেই যেন লোকজন সেখানে সমবেত হয়।

(৬০) এরপর ফেরাউন উঠে গেল এবং তার সকল ফন্দি-কৌশল জড়ো করলো ও ফিরে আসলো।

(৬১) মূসা তাদেরকে বললেন, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা, যদি তা কর তবে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। (মনে রেখ) যে মিথ্যা আরোপ করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।

(৬২) এরপর তারা নিজেদের মধ্যে তাদের কর্মসূচী সম্পর্কে বিতর্ক করলো ও গোপন পরামর্শ করলো।

(৬৩) তারা বলে, এরা দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিনাশ করতে।

(৬৪) অতএব, তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত কর, এরপর কাতারবন্দী হয়ে হাযির হও। নিশ্চয় আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফল হবে।

(৬৫) তারা বললো, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে যে চ্যালেঞ্জ করেছিল পূর্ববর্তী আয়াতে তার বর্ণনা ছিল, হযরত মূসা (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। ফেরাউন তখন বলেছিল, মোকাবেলা করার জন্যে দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট কর। তখন হযরত মূসা (আঃ) যা বলেছিলেন আলোচ্য আয়াতে তা এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ مَوْعِدُكُمْ

হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, যেদিন তোমাদের বাৎসরিক উৎসব বা মেলা হয় সেদিন হবে এ মোকাবেলা। আর এ মোকাবেলা হবে চাশ্তের সময়। অধিক সংখ্যক লোক যেন এ মোকাবেলা দেখতে পারে এবং ভালভাবে দেখতে পারে। আর সকলের নিকট সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও প্রতিভাত হয়, এ কারণেই এ দিন এবং সময় নিদৃষ্ট হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), মোকাতেল (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, মিসরবাসীর বাৎসরিক উৎসবের দিন নির্দিষ্ট ছিল, যেখানে লোকেরা সুসজ্জিত হয়ে বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হতো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এ দিনটি ছিল মহররমের দশ তারিখ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) ঐদিন এবং সময় এজন্যে নির্দিষ্ট করেছেন যেন সকলের সম্মুখে সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সকলে বাতিলের বাতুলতা উপলব্ধি করে আর সারা দেশে এই খবর প্রচারিত হয়।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى

"এরপর ফেরাউন চলে গেল, তার যাবতীয় ফন্দি-কৌশল একত্রিত করলো ও ফিরে আসলো"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যখন ফেরাউনের সঙ্গে দিন এবং স্থান ঠিক হয়ে গেল তখন ফেরাউন সারা দেশ থেকে যাদুকরদেরকে একত্রিত করতে শুরু করলো। সে-যুগে যাদু-বিদ্যা বিরাট প্রসার লাভ করেছিল এবং অনেক বড় বড় যাদুকর বর্তমান ছিল। ফেরাউন প্রত্যেক এলাকার কর্মকর্তাদের নামে আদেশ জারি করেছিল যে, সকল বড় বড় বিশেষজ্ঞ যাদুকরকে আমার নিকট প্রেরণ কর। নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকররা সমবেত হল। ফেরাউন সে ময়দানেই তার সিংহাসন স্থাপন করলো। সমস্ত উজির-নাজির ও পদস্থ কর্মকর্তারা স্ব-স্ব স্থানে বসে গেল। জনতার ঢল নেমে এল। যাদুকররা ফেরাউনের সিংহাসনের সম্মুখে কাতার-বন্দী হয়ে দন্ডায়মান হলে ফেরাউন তাদেরকে বললোঃ আজ এমন বিস্ময়কর কিছু দেখাও যা পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। যাদুকররা বললোঃ আমরা যদি বিজয় লাভ করি তবে আমাদের পুরস্কার কি হবে? ফেরাউন বললোঃ শুধু কি পুরস্কার? আমি তোমাদেরকে আমার দরবারের বিশিষ্ট লোকদের মর্যাদা প্রদান করবো।

আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এসব কথা এরশাদ করেছেনঃ

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ

ফেরাউন উঠে গেল। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলার পর সে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি-কল্পে বের হয়ে পড়লো।

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ

তার যাবতীয় ফন্দি-কৌশল একত্রিত করলো অর্থাৎ যাদুকরদের একত্রিত করলো এবং যাদুর যাবতীয় আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করলো।

ثُمَّ اَتٰى

এরপর নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

"মূসা বললেন, দুর্ভোগ তোমাদের, আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা, যদি তা কর তবে তিনি আযাব দ্বারা তোমাদেরকে নিপাত করবেন"।

যাহোক, ফেরাউন একদিকে যাদুকরদেরকে বড় বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্য দিকে সে নির্দিষ্ট সময়ে সদলবলে মহা সমারোহে হাযির হয়। ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) বিশেষভাবে যাদুকরদেরকে এবং সাধারণভাবে উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করে নসিহত করলেনঃ তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে না। মনে রেখ, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নিদর্শন সমূহকে যাদু মনে করা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তোমাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়। আসমানী বালা-মুছিবত ও

বিপদাপদ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর। তাদের প্রত্যেকের নিকট একটি লাঠি এবং একটি রশি ছিল। কা'ব (রঃ) বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল চার শত। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। আর কেউ কেউ বলেছেন তার চেয়েও বেশী।[১]

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

"ফলে তাদের কর্মসূচী সম্বন্ধে তারা নিজেদের মধ্যেই কলহ-দ্বন্দে লিপ্ত হলো"।

হযরত মূসা (আঃ) যাদুকর সহ সমবেত জনতার উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা তাদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর মোজেযা সম্পর্কে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করা উচিত নাকি অনুচিত, এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। মোহাম্মদ এবনে এছহাক এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, কোন কোন যাদুকর বলে, হযরত মুসা (আঃ)-এর যে-কথা আমরা শুনলাম তাতো যাদুকরের কথার মত মনে হয় না। এমন অবস্থায় তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। কিন্তু অবশেষে ফেরাউনের প্রভাবে তারা এ সিদ্ধান্তে আসে যে এরা উভয়ে যাদুকর, কাজেই যাদু দ্বারাই তাদের মোকাবেলা করা উচিত।

وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى

"এবং তারা গোপনে পরামর্শ করতে থাকে"।

অর্থাৎ তাদের পরস্পরের এই কলহ-দ্বন্দ্বকে গোপন রাখে।

কালবী (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা এই পরামর্শকে গোপন রাখে-যদি মূসা (আঃ) বিজয়ী হন তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করবো।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

"তারা বললো, এরা দু'জনেই যাদুকর, নিজেদের যাদু বলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উত্তম রীতি-নীতি বন্ধ করতে চায়"।

অর্থাৎ প্রথমে মতবিরোধের পর অবশেষে ফেরাউনের কথায় একমত হয়ে তারা বললো, এ দু'জন তথা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) উভয়ে যাদুকর এবং তারা তাদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে উদ্যত। এখন তো তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, তোমরা রাজার নৈকট্য-ধন্য রয়েছ, অর্থ-সম্পদ রয়েছে তোমাদের হাতে, যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে তোমরা হবে সর্বহারা

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯৫

আর তারা হবে সব কিছুর অধিকারী। তারা তোমাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবে। এখানকার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই চলে আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা, আরাম-আয়েশ, আনন্দ সবই চলে যাবে তাদের দখলে। আমীর ফকীর হয়ে যাবে। তোমাদের সব-কিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে। তাই সমবেত ভাবে তাদের মোকাবেলা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।[১]

فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا

"অতএব তোমরা নিজেদের কৌশল স্থির করে লও এবং কাতার বন্দী হয়ে মোকাবেলা কর"।

অর্থাৎ তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, নিজেদের কর্মসূচীর ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ কর, সংকল্পের দৃঢ়তা অর্জন কর, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রেখোনা, নতুবা তোমাদের কার্যক্রম বিনষ্ট হবে, এমনভাবে কাতার বন্দী হও যেন দর্শক মাত্রেরই অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়, আর মনে রেখো وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ (আর নিশ্চয় আজ যে বিজয়ী হবে সে-ই সফল হবে)। কেননা তোমরা পূর্বেই শুনেছো ফেরাউন বলেছে......যদি আমরা বিজয়ী হই তবে সে আমাদেরকে তার দরবারে বিশেষ মর্যাদা দেবে।

قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

"তারা বলে, "হে মূসা! হয় আপনি নিক্ষেপ করুন অথবা আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি"।

অর্থাৎ যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বললো, আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরাই প্রথমে আমাদের যাদু পেশ করবো? একথায় হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি যাদুকরদের আদব প্রকাশিত হল। এজন্যে তিনি ভদ্রতা এবং উদারতার প্রমাণ দিয়ে তাদেরকেই আগে তাদের যাদু বিদ্যা প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ بَلْ أَلْقُوا

"মূসা (আঃ) বললেন, বরং তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) চেয়েছেন তাদের যাদু বিদ্যার দৌড় যতখানি আছে তা একবারেই প্রকাশ পেয়ে যাক। তাদেরকে এ সুযোগ এজন্যে দিলেন যেন সকলের সম্মুখে তাদের যাদু-বিদ্যার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হোক। অবশেষে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত মোজেযা এসে বাতিলের বাতুলতা ঘোষণা করুক এবং চিরদিনের জন্যে সত্য প্রকাশিত হোক।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৭৭
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯৯

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا
صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ
سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ
اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ
وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾

তরজমা

(৬৬) মূসা বললেন, না; বরং তোমরাই ফেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো তাদের যাদুবলে ছুটোছুটি করছিল বলে মূসার মনে হতে থাকে।

(৬৭) এ কারণে মূসা তাঁর মনে ভয় পেতে থাকেন।

(৬৮) আমি বললাম, তুমি ভয় করোনা, নিশ্চয় তুমিই হবে বিজয়ী।

(৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তা ফেল, তারা যা কিছু করেছে তা যেন গিলে ফেলে, তাদের কীর্তি যাদুকরীর প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যাদুকর যেখানেই থাকুক না কেন কখনও সফল হবে না।

(৭০) এর ফলে যাদুকররা সেজদায় পতিত হয়, তারা বলে আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

(৭১) ফেরাউন বলে, আমার অনুমতি লাভের পূর্বেই কি তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে? নিশ্চয় সে হল তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। অতএব, আমি তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কেটে ফেলবো। আর খেজুর বৃক্ষের কান্ডের উপর তোমাদেরকে ফাঁসি দেব, আর (তখন) তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী।

তফসীরুল কোরআন

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ

হযরত মূসা (আঃ) যখন যাদুকরদেরকে অনুমতি দিলেন যে তোমরা প্রথমে তোমাদের কাছে যে যাদুবিদ্যা রয়েছে তা দেখাও, তখন তারা তাদের দড়ি এবং লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের লাঠি ও দড়িগুলো সর্পে পরিণত হল এবং এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো। তফসীরকারগণ লিখেছেন, এক মাইল পর্যন্ত এলাকা সাপে পূর্ণ হয়ে গেল এবং সাপগুলো এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

"এ কারণে মূসা তাঁর মনে ভয় পেতে থাকেন"।

অর্থাৎ যাদুকরদের এই ভেল্কিবাজী দেখে, হযরত মুসা (আঃ) এ কারণে মনে মনে ভয় পেতে থাকেন যে, হয়তো জনসাধারণ যাদু ও মোজেযার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে না এবং যাদুকরীর এ ফেতনায় পড়ে পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়। হয়তো হযরত মূসা (আঃ) এ ধারণাও করেছেন যে আমার একটি লাঠি দ্বারা একটি সর্পই হবে, আর তাদের তো অগণিত সাপ, এ কারণেও হয়তো লোকেরা সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে।

যাদুকরদের সংখ্যা

যাদুকরদের সংখ্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবে ইমাম রাজী (রঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাসেম এবনে সালাম বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তুর হাজার এবং প্রত্যেকের হাতে লাঠি ও একটি দড়ি ছিল। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, আর প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি লাঠি ও একটি রশি। আর ওয়াহাব এবনে মোনাব্বাহ বলেছেন, যাদুকরের সংখ্যা ছিল পনের হাজার। আর এবনে জুরায়েজ ও একরামা বলেছেন, তারা ছিল নয়শ'। তিনশ' যাদুকর আনা হয়েছিল পারস্য থেকে, আর তিনশত রোম থেকে আর তিনশত ইস্কান্দরিয়া (মিসর) থেকে।

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى

"আমি বললাম, তুমি ভয় করোনা, নিশ্চয় তুমিই হবে বিজয়ী"।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছেঃ হে মূসা! এ মোকাবেলায় তুমিই হবে বিজয়ী, তোমার কোন প্রকার ভয় নেই। তোমার বিজয় সুনিশ্চিত। তোমার ভয়ের কোন কারণই নেই।

وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا

"আর যা-কিছু তোমার দক্ষিণ হাতে রয়েছে তা নিক্ষেপ কর, যাদুকরদের সকল কীর্তি সে গিলে ফেলবে"।

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর হাতের লাঠিটি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে এ সুসংবাদ দিলেন যে তোমার লাঠি যখন নিক্ষেপ করবে, তখন তারা যাদুর মাধ্যমে যা

দেখিয়েছে- সব কিছুকে গিলে ফেলবে এবং অবশেষে তাই হয়েছিল।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন তাঁর হাতের লাঠিটি ফেলে দিলেন তখন তা দেখতে দেখতে এক বিরাট অজগরে পরিণত হল, যার মাথাও ছিল, দাঁতও ছিল, পা-ও ছিল। ঐ অজগরটি যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া অগণিত সাপকে অল্পক্ষণের মধ্যে একটি একটি করে গিলে ফেললো। যাদুকরদের কোন কিছুই আর ময়দানে রইল না। তখন ঐ অজগরের ভয়ে সমবেত লোকজন প্রাণ রক্ষার তাগিদে পলায়ন করতে লাগলো। অবশেষে অজগরটি ফেরাউনকে গিলে ফেলতে উদ্যত হলো। ফেরাউন চিৎকার করে মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রাণ রক্ষার জন্যে ফরিয়াদ করলো। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে ধরে ফেললেন, ফলে সে পুনরায় লাঠিতে পরিণত হল।

বর্ণিত আছে যে ফেরাউনকে গিলে ফেলতে অজগরটি যখন তার মুখ খুলেছিল তখন তা ৮০ হাতেরও বেশী চওড়া ছিল।[১]

এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয়, যাদু যত বিস্ময়করই হোক না কেন, যাদুকর যত পারদর্শীই হোক না কেন এবং যাদু যত উচ্চ স্তরেরই হোক না কেন ক্ষণিকের মধ্যে তা বিনষ্ট হতে বাধ্য। কেননা সত্যের মোকাবেলায় বাতিল কখনো টিকতে পারেনা। পরবর্তী বাক্যে পবিত্র কোরআন এ সত্য ঘোষণা করেছেঃ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

"যাদুকর যেখানেই যাক কখনও সফল হতে পারেনা"।

তিরমিযী শরীফে হযরত জন্দব এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে, যাদুকরকে যেখানেই পাও পাকড়াও কর এবং হত্যা কর। এবনে আবি হাতেমও এই হাদীস সংকলন করেছেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

বর্ণিত আছে যে এ ঘটনার পর ফেরাউন অনেক দিন পর্যন্ত তার মহল থেকে বের হয়নি। তদানীন্তন পৃথিবী দেখে নিয়েছে সত্যের মোকাবেলায় বাতিল টিকতে পারেনা। আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযার মোকাবেলায় যাদু সম্পূর্ণ অচল। এমনকি যাদুকররাও এ সত্য উপলব্ধি করলো যে হযরত মূসা (আঃ) যা কিছু দেখিয়েছেন তা আদৌ যাদু নয়; বরং এটি হল আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি, যার মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যাদুকররা এ সত্য উপলব্ধি করেই সেজদায় পতিত হলো। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

"(এ অবস্থা দেখা মাত্র) যাদুকররা সেজদায় পতিত হয়, তারা বলেঃ আমরা ঈমান আনলাম হারুন (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালকের প্রতি"।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত মওলানা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬১

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যাদুকরদের এ সেজদা ছিল সেজদায়ে শোকরানা। এজন্যে যে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমানের তৌফিক দান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে মূসা (আঃ)-এর আগে হারুন (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে এর একটি কারণ হল, হযরত হারুন (আঃ) বয়সে হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বড় ছিলেন। অথবা এ কারণেও হতে পারে যে অতি শৈশবে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালন হয়েছিল ফেরাউনের তত্ত্বাবধানে। এ কারণে بِرَبِّ مُوسٰى বললে কারো এ ভুল ধারণা হতে পারে যে এর দ্বারা ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাই برب هرون وموسى বলা হয়েছে।

তফসীকারকার একরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তদানীন্তন মিসরে ফেরাউনের যুগে নয়শত বিখ্যাত যাদুকর ছিল। তারা ফেরাউনকে পূর্বেই বলেছিল, যদি মূসা (আঃ) যাদুকর হন তবে আমরা অবশ্যই তাঁর উপর জয়ী হবো। কেননা যাদু বিদ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী দক্ষ এবং পারদর্শী আর কেউ নেই। কিন্তু যদি তিনি আল্লাহর নবী হন তবে আমরা কখনো বিজয় লাভ করতে পারবো না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন যাদুকরদের সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয় তখন অল্পক্ষণের মধ্যে সত্য সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠি যাদুকরদের যাদু-বিদ্যা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান এনেছে। ঐ মুহূর্তে ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে যা বলেছে পরবর্তী আয়াতে তা এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

"ফেরাউন বলে, আমার থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই কি তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? নিশ্চয় সে হল তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে"।

অর্থাৎ যাদুকররা যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানের কথা প্রকাশ করলো তখন ফেরাউন তাদেরকে ধমক দিয়ে বললোঃ আমার তরফ থেকে অনুমতি গ্রহণ করার পূর্বেই কি তোমরা মূসার (আঃ) প্রতি ঈমান নিয়ে আসলে? এতটুকু অপেক্ষা করলে না? মনে হয় তোমরা সকলে একই দলের লোক এবং মূসা (আঃ) হল তোমাদের প্রধান বা দলনেতা। এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা সবই তোমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মূসাই (আঃ) তোমাদের গুরু, সে তোমাদেরকে এ যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। যাহোক, এখনই টের পাবে।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ

"আমি এখনই তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কেটে ফেলবো এবং খেজুর বৃক্ষের কান্ডের উপর তোমাদেরকে ফাঁসি দেব"।

এভাবে ফেরাউন যাদুকরদের শাস্তি দেয়ার হুমকি দিল আর একথাও বললো, "তোমরা অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে কার শাস্তি কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ ফেরাউন যাদুকরদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা যে হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদের উস্তাদ ছিলেন। কারণ সে ভাল ভাবেই জানতো যে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ঐ যাদুকরদের ইতিপূর্বে কখনো দেখা হয়নি এবং তাদের সঙ্গে মূসা (আঃ)-এর কোন পরিচয়ও ছিল না। যদি মূসা (আঃ) যাদুকরদের উস্তাদ হতেন তবে তাঁর সঙ্গে তাদের পূর্ব থেকেই পরিচয় থাকতো। কারণ উস্তাদ ও শাগরেদদের মধ্যে সম্পর্ক কারোরই অজানা থাকার কথা নয়।

وَلَتَعۡلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبۡقٰى

"আমাদের মধ্যে কার শাস্তি অধিকতর কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী তা তোমরা জানতে পারবে"।

অর্থাৎ তোমরা এখনই জানতে পারবে যে মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার কারণে আমি তোমাদেরকে যে শাস্তি দেব তা অধিকতর কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী, নাকি মূসার প্রতিপালক তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে যে শাস্তি দিতেন তা কঠিনতর।[১]

قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡثِرَكَ عَلٰى مَا
جَآءَنَا مِنَ الۡبَيِّنٰتِ وَالَّذِىۡ فَطَرَنَا فَاقۡضِ مَاۤ اَنۡتَ قَاضٍ ؕ
اِنَّمَا تَقۡضِىۡ هٰذِهِ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا ؕ ﴿٧٢﴾ اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَـغۡفِرَ لَنَا
خَطٰيٰنَا وَمَاۤ اَكۡرَهۡتَنَا عَلَيۡهِ مِنَ السِّحۡرِؕ وَاللّٰهُ خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى ﴿٧٣﴾
اِنَّهٗ مَنۡ يَّاۡتِ رَبَّهٗ مُجۡرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوۡتُ فِيۡهَا وَ
لَا يَحۡيٰى ﴿٧٤﴾ وَمَنۡ يَّاۡتِهٖ مُؤۡمِنًا قَدۡ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓـئِكَ
لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الۡعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا
الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَذٰ لِكَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

তরজমা

(৭২) যাদুকররা বললো, আমাদের নিকট যে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমাকে আমরা কোন ভাবেই প্রাধান্য দেবনা। অতএব, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, তুমি তো শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপরই কর্তৃত্ব করতে পারে।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০২

(৭৩) নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের গুনাহ সমূহ আর তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ সে গুনাহও যেন তিনি ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ পাক উত্তম ও চিরস্থায়ী।

(৭৪) মূলতঃ যে পাপীষ্ঠ হয়ে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে, তার জন্যে রয়েছে দোযখ। নিশ্চয় সে তাতে মরবেনা, আর বাঁচবেওনা।

(৭৫) আর যে মোমেন অবস্থায় তাঁর নিকট হাযির হবে নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা।

(৭৬) (সে উচ্চ মর্যাদা হল) স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে আর এ পুরস্কার তাদেরই জন্যে, যারা পবিত্র হয়।

তফসীরুল কোরআনে

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে যাদুকরদের প্রতি ফেরাউনের ধমকের উল্লেখ ছিল। যাদুকররা যখন ইসলাম কবুল করলেন তখন ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তোমরা আমার তরফ থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই মূসার (আঃ) প্রতি ঈমান আনলে? আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব। তার প্রতি-উত্তরে মোমেনগণ যা বলেছেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[১]

মোমেনদের পক্ষ থেকে ফেরাউনকে সুস্পষ্ট জবাব

যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাই ফেরাউন কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করার পরও তাকে তাঁরা সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়ে বলেছেনঃ হে ফেরাউন! আমরা সত্যের পরিচয় পেয়েছি। হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত এবং আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের যে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি তার উপর আমরা কোন অবস্থাতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবনা। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি, তিনিই আমাদের প্রতিপালক। আমাদের অস্তিত্ব তাঁরই দান, তুমি আমাদের স্রষ্টা নও। যখন তুমি আমাদের স্রষ্টা নও তখন তুমি উপাস্যও নও।

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ

অতএব, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পার, আমরা তোমার শাস্তির হুমকি ধমকিকে ভয় করিনা।

اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৮৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬৩

কেননা, তুমি তো শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্যাপারেই হুকুম দিতে পার যা অদূর ভবিষ্যতে এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। আর তোমার শাস্তিও স্থায়ী হবেনা, এ জীবনের অবসানের সাথে সাথে তোমার শাস্তিরও অবসান হবে। তাই তোমার শাস্তির ভয়ে আমরা ঈমানহারা হবোনা।

إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ

"নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের গুনাহ্ সমূহ, আর তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ সে গুনাহ্ও যেন তিনি মাফ করেন"।

অর্থাৎ আমরা আমাদের সেই প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যিনি দান করেছেন আমাদেরকে আমাদের এ জীবন; যিনি বিশাল বিস্তৃত জমিনকে বানিয়েছেন আমাদের জন্যে বিছানা, আর আসমানকে করেছেন চাঁদোয়া এবং দান করেছেন আমাদেরকে উপজীবিকা। আমরা সারা জীবন তাঁর নাফরমানী করেছি, পাপাচারে লিপ্ত রয়েছি, এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমরা হেদায়েত পেয়েছি এবং ঈমান এনেছি যেন আল্লাহ্ পাক আমাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেন, আর মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যে যাদুকর্মের জন্যে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছ, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদের এ গুনাহ্ও মাফ করে দেন।

বর্ণিত আছে যে ফেরাউন যখন যাদুকরদেরকে মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলার আহ্বান করলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি অজগরে পরিণত হল তখন যাদুকররা এ কথাও বলেছিল, আমাদেরকে মূসা (আঃ)-কে নিদ্রিত দেখার ব্যবস্থা করে দিন। ফেরাউন যাদুকরদেরকে মূসা (আঃ)-এর আবাস স্থলে প্রেরণ করলো। তারা দেখলো যে হযরত মূসা (আঃ) নিদ্রিত রয়েছেন, তবে তাঁর লাঠিটি তাঁকে প্রহরা দিয়ে চলেছে। তখন যাদুকররা বললো, এ ব্যক্তি অবশ্যই যাদুকর নয়। কেননা, যাদুকর যখন নিদ্রিত হয় তখন তার যাদুবিদ্যা নিষ্ক্রিয় থাকে, অথচ হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠিটি অজগরের আকৃতি ধরে তাঁর প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। যাদুকররা এসব কথা ফেরাউনের নিকট বর্ণনা করলো, কিন্তু সে তাদের কথা মানতে রাজি হলোনা। ফেরাউন বললো, মূসার নিকট তো মাত্র একটিই অজগর দেখে এসেছ, কিন্তু তোমরা তো অগণিত সাপ আনতে পার। এভাবে ফেরাউন যাদুকরদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় বাধ্য করেছিল, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ (আর তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ) বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

ফেরাউন কি যাদুকরদেরকে শাস্তি দিয়েছিল?

ফেরাউন যাদুকরদের সম্পর্ক যে শাস্তির হুমকি দিয়েছিল তা কি কার্যকর করেছিল? এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় কোন ঘোষণা নেই, তবে আল্লামা এবনে কাসীর

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৩৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬৩

(রঃ) এবং অন্যান্য তফসীরকারগণ হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ জালেম ফেরাউন নও-মুসলিম যাদুকরদেরকে শাস্তি দিয়েছিল। সে তাদের হাত পা কেটে তাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। তারা সকালে যাদুকর ছিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলার পর মোমেন হয়েছিলেন, বিকেলে শহীদ হয়েছিলেন। এবনে জরীর, এবনে মুনজের, এবনে আবি হাতেম এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

"আর আল্লাহ্ পাক উত্তম ও চিরস্থায়ী"।

অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কল্যাণ এবং কোন গুণ নেই, আর তোমার শাস্তি বা পুরস্কারও স্থায়ী নয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর দিক থেকে আল্লাহ্ পাকই উত্তম এবং তিনিই চিরস্থায়ী।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ্ পাক তাকে এমন সওয়াব দান করবেন যা পৃথিবীর কেউ দিতে পারবে না।

পক্ষান্তরে, যে অবাধ্য কাফের হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবে, তাকে এমন শাস্তি দেবেন যা হবে চিরস্থায়ী এবং পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই এমন শাস্তি দিতে পারবে না।[২]

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا

"যে পাপীষ্ঠ হয়ে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে তার জন্যে রয়েছে দোযখ, নিশ্চয় সে তাতে মরবেওনা বাঁচবেওনা"।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলেছেন, ফেরাউন বলেছিলঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

"আর তোমরা এখনই জানতে পারবে কার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও চিরস্থায়ী"।

আলোচ্য আয়াত একথার জবাবেই এরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ যে বিদ্রোহী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, তাকে যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির করা হবে তখন তার জন্যে দোযখের শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। দোযখের কঠিন শাস্তির মধ্যে সে চিরদিন থাকবে, সেখানে তার মৃত্যু হবে না, আর শাস্তি থেকে নিস্কৃতিও লাভ করবে না। কোন কোন তফসীরকার একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোযখের শাস্তি এত কঠিন হবে যে দোযখের জীবনকে জীবন বলে আখ্যায়িত করা যায় না, আর তার মৃত্যুও হবে না।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮০
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬৩
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৪

"আর যে মোমেন নেক আমল করে তাঁর নিকট হাযির হবে তাদের জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। সে উচ্চ মর্যাদা হল স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, যেখানে তারা চিরদিন বাস করবে"।

ইমাম রাজী (রঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা। পক্ষান্তরে, যারা মোমেন কিন্তু গুনাহগার তাদের এ অবস্থা হবে না। তবে তারা চিরদিন দোযখেও থাকবে না। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির অন্তরে কণা মাত্র ঈমানও থাকবে তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। অতএব গুনাহগার মোমেনের জন্যে এ ঘোষণা নয় যে "দোযখে তার মৃত্যু হবেনা আর সে জীবিতও থাকবেনা"। এ ঘোষণা শুধু কাফেরদের জন্যে।[১]

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَكّٰى

"আর এ পুরস্কার তাদেরই জন্যে যারা পবিত্রতা অর্জন করে"।

অর্থাৎ যারা কুফর ও শেরক এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখে তাদের জন্যেই হল এ পুরস্কার। কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হল, এ পুরস্কার তাদের জন্যে যারা নিজেরা প্রাণের যাকাত দিয়েছে অর্থাৎ যারা কলেমায়ে তৈয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" পাঠ করেছে।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, এবনে মাজা এবং এবনে হাব্বান হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (বেহেশতের) উচ্চ স্তরের লোকদেরকে নিম্ন স্তরের লোকেরা এভাবে দেখবে যেভাবে তোমরা আসমানের নক্ষত্রপুঞ্জ দেখ। আর আবুবকর তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ওমরও। এর দ্বারা বেহেশতে পরস্পরের পার্থক্য বোঝা যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহলে তো আম্বিয়ায়ে কেরামের স্তরে তাঁরা ব্যতীত কেউ পৌঁছবে না। তিনি এরশাদ করেনঃ কেন নয়? শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে আর নবীগণকে সত্য জ্ঞান করবে তারা তাঁদেরই সাথে থাকবে।[২]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৯০
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৫

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ٧٩ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ
أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ٨٠ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن
يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٨١

তরজমা

(৭৭) আর আমি মূসাকে আদেশ দেই যে আমার বন্দাগণকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হয়ে যাও, এরপর সাগরের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ তৈরী কর, ধরা পড়ার এবং ডুবে যাওয়ার ভয় করোনা।

(৭৮) এরপর ফেরাউন তার সৈন্য-বাহিনী সহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পরে সমুদ্র তাকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে।

(৭৯) আর ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ দেখায়নি।

(৮০) হে বণী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ করেছিলাম।

(৮১) তোমাদেরকে প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন উত্তম রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর, আর এতে সীমা লংঘন করোনা, (যদি তা কর) তবে তোমাদের প্রতি আমার গজব আপতিত হবে এবং যার উপর আমার গজব পতিত হয় সে-ই ধ্বংস হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাউনের দ্বারা আহুত যাদুকরদের মোকাবেলা হয় এবং এ মোকাবেলায় ফেরাউন ও তার দলবল পরাজিত হয়। যাদুকররা পরাজিত হয়ে সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং ইসলাম কবুল করে। ফলে বণী ইসরাঈলের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত মূসা (আঃ) দাওয়াত ও

তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি তৌহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করতে থাকেন। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফেরাউন তার ক্ষমতার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ে। তাই তার লোকেরা তাকে পুনরায় খোদায়ী দাবী করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সে নতুন করে বণী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-অত্যাচার শুরু করে। বণী ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা করার কাজ পুনরায় আরম্ভ করে, যাতে করে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে যে জ্যোতিষীরা যে শিশুর জন্ম গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সে শিশু এখনও জন্ম গ্রহণ করেনি। এ কারণে পূর্ণ উদ্যমে বণী ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফেরাউনের জুলুমের অভিযোগ করে। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে সবর অবলম্বনের আদেশ দেন, আর ফেরাউনের নিকট এ দাবী করেন যে বণী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও, যাতে করে আমি বণী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করি, সিরিয়া চলে যাই এবং বণী ইসরাঈলের দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।[১]

ফেরাউন যখন মূসা (আঃ)-এর কোন মোজেযা দেখতো তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হতো এবং বিপদমুক্তির জন্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করতো। কিন্তু যখনই বিপদ মুক্ত হতো তখন অন্যায় আচরণ করতো। এভাবে বিশটি বছর অতিবাহিত হল। সে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং বণী ইসরাঈলকেও মুক্তি দেয়নি। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাকে অনেক উজ্জল নিদর্শন দেখানো হল। কিন্তু এতদসত্বেও সে সঠিক পথ অবলম্বন করলো না, সে সীমা লংঘন করতেই থাকলো। তখন বণী ইসরাঈলকে ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্তি দেয়ার সময় ঘনিয়ে এল যাতে করে ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটে এবং তাকে ও তার দলবলকে নিপাত করা হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

"আর আমি মূসাকে আদেশ প্রদান করি যে আমার বন্দাগণকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হয়ে যাও"।

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে এই আদেশ দিলেন যে বণী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিবেলা মিসর থেকে বের হয়ে যাও। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক বণী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে পড়লেন সিরিয়া গমনের উদ্দেশে। আল্লাহ পাক এ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি আদেশ দিলেনঃ[২]

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا

"(তোমার হাতের লাঠির আঘাতে) সাগরের মধ্য দিয়ে শুষ্ক পথ তৈরী কর"।

হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ দান করলেন, বণী ইসরাঈলকে নিয়ে

১। সূরা আ'রাফ দ্রষ্টব্য
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৫৬৬-৬৭

রাত্রিবেলা বের হয়ে পড় এবং যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছবে তখন হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের উপর আঘাত করবে। এর ফলে সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ রচিত হবে। দু'দিকের পানি সরে গিয়ে পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবে। বণী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্যে বারোটি পথ তৈরী হয়ে যাবে। অবশেষে তাই হয়েছিল। যখন হযরত মূসা (আঃ) সমুদ্র পার হয়ে গেলেন, তখন ফেরাউন তার সৈন্য বাহিনী সহ সমুদ্রের তীরে হাযির হয়ে দেখলো যে হযরত মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে নিয়ে পার হয়ে গেছেন। লোহিত সাগরের বক্ষে বারোটি পথ তৈরী হয়ে আছে। তাই ফেরাউন তার সৈন্য বাহিনী সহ ঐ পথে অগ্রসর হল। যখন তারা সমুদ্রের ঠিক মাঝমাঝি স্থানে হাযির হয়, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে দু'দিকের পানির ঢেউ চলে আসে এবং হতভাগা ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি ঘটে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের বিবরণ এভাবেও পেশ করা যায়, বিগত রুকুতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করেছেন। আর এ আয়াতে বণী ইসরাঈল জাতির প্রতি তাঁর নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে তাদের সম্মুখে তাদের চির দুশমন ফেরাউনকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন এবং তার জুলুম থেকে বণী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। অথবা কথাটিকে এভাবেও পেশ করা যেতে পারে। বিগত রুকুতে ফেরাউনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত সমূহে তার শোচনীয় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে দুনিয়ার মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে আল্লাহ পাক জালেমকে অবকাশ প্রদান করেন, কিন্তু ছেড়ে দেননা।

فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

"এরপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী সহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পরে সমুদ্র তাকে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ভোরে যখন ফেরাউনের নিকট এই খবর পৌঁছল যে রাত্রিবেলা বণী ইসরাঈল দেশ ছেড়ে চলে গেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সৈন্যবাহিনী সহ বণী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং এমনভাবে পানির স্রোত আসলো যে ফেরাউন ও তার দলবল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল।

واضل فرعون قومه وما هدى

"আর ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ দেখায়নি"।

সে সত্য দ্বীনের প্রতি বিদ্রুপ করেছিল, আল্লাহর প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমনকি, খোদায়ী দাবী করেছে, তাই তার পরিণতি হয়েছে এত ভয়াবহ।

يبني اسرائيل قد انجينكم من عدوكم ووعدنكم جانب الطور الايمن

"হে বণী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে রক্ষা

করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম"।

পূর্ববর্তী আয়াতে বণী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের জাগতিক নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। এ আয়াতে পার্থিব জীবনের পাশাপাশি আখেরাতের নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে, হে বণী ইসরাঈল জাতি! আমি তোমাদেরকে তোমাদের দুশমন ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দিয়েছি। সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাক ফেরাউনের জুলুম অত্যাচার থেকে নাজাত প্রদানের উল্লেখ করেছেন। কেননা এটি ছিল বণী ইসরাঈল জাতির প্রতি পার্থিব জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এতদ্ব্যতীত তাদের জীবন শুধু দুর্বিষহই ছিলনা; বরং ফেরাউনের অকথ্য নির্যাতনের কারণে বণী ইসরাঈল জাতি যুগ যুগ ধরে মানবেতর জীবন যাপন করছিল। ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত পাওয়া তাই এ জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এজন্যে এর পাশাপাশি আখেরাতের নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে।

وَوٰعَدْنٰكُمْ

অর্থাৎ হে বণী ইসরাঈল! কোহে তূরের ডান দিকে আমি তোমাদেরকে তৌরাতের প্রতিশ্রুতি দান করি। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তৌরাত প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন আর এ আদেশ দিয়েছিলেন যে, বণী ইসরাঈল থেকে ৭০ ব্যক্তিকে নির্বাচন করে যেন নিয়ে আসেন। এ প্রতিশ্রুতি যদিও হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু বিষয়টি ছিল বণী ইসরাঈল সম্পর্কিত, আর তৌরাতের মাধ্যমে তাদের হেদায়েত লাভের ব্যবস্থা ছিল, তাই বণী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ বণী ইসরাঈলকে তৌরাত প্রদান ছিল আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি দ্বীনি নেয়ামত। তৌরাত ছিল নূর ও হেদায়েত। আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ তথা শরীয়তের বিবরণ ছিল তাতে লিপিবদ্ধ, যার উপর আমল করার মাধ্যমে মানুষ হেদায়েত লাভ করতো, তথা জান্নাতের পথের সন্ধান পেত।[১]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"আর তোমাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ করেছিলাম। তোমাদেরকে প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন, উত্তম রিযক থেকে তোমরা আহার কর"।

পূর্ববর্তী আয়াতে বণী ইসরাঈলের প্রতি দ্বীনি নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে পার্থিব জীবনের আরও একটি নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। সিরিয়া গমনের পথে ময়দানে তীহে অবস্থান কালে বণী ইসরাঈলের জন্যে খাবার হিসাবে আল্লাহ পাক মান্না ও সালওয়া দান করেছিলেন।[২]

এরপর এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত এ নেয়ামত সমূহ ভোগ কর, তবে–

وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৯৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৫৬৮-৬৯
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩১১-১২

"আর তাতে বাড়াবাড়ি করোনা"।

এ বাড়াবাড়ি না করার তাৎপর্য হল, তোমরা শরীয়তের সীমালংঘন করোনা। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না-শোকরী করোনা; অকৃতজ্ঞ হয়োনা, অপচয় করোনা, নিষ্প্রয়োজনে ব্যয় করোনা এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে অহংকার করোনা, এমনিভাবে যে সাহায্যের যোগ্য তাকে তোমরা সাহায্য থেকে বঞ্চিত করোনা, সম্পদের হক্ক আদায়ে গাফলত করোনা।[১]

يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى

"আর এতে সীমা লংঘন করোনা (যদি তা কর) তবে তোমাদের প্রতি আমার গজব আপতিত হবে এবং যার উপর আমার গজব আপতিত হয় সে-ই ধ্বংস হয়"।

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত নিয়ে বাড়াবাড়ি কর, যদি তোমরা সীমা লংঘন কর, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের অপব্যয় কর, যদি তোমরা দুনিয়ার নেয়ামত নিয়ে মুগ্ধ মত্ত হয়ে নেয়ামত দাতা আল্লাহ পাককে ভুলে যাও, তাঁর বিধানকে অমান্য কর, আখেরাতের হিসাব নিকাশের কথা ভুলে যাও তবে তোমাদের উপর আপতিত হবে আমার গজব। আর মনে রেখ, যে আল্লাহর গজবে পতিত হয় সে সর্বস্বান্ত হয়, তার ধ্বংস হয় অনিবার্য, চিরকাল সে কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের هوٰى শব্দটি ব্যাখ্যা হল, উপর থেকে নীচে নিক্ষিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় সে হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়, সে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝٨٢ وَمَآ اَعْجَلَكَ
عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ۝٨٣ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَ
عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ۝٨٤ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝٨٥ فَرَجَعَ
مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ
رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ۝٨٦

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৮

তরজমা

(৮২) যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে ও সুপথে চলে, আমি অবশ্যই তাকে মাফ করে থাকি।

(৮৩) আর হে মুসা! তোমার জাতিকে পশ্চাতে ফেলে তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন করতে গেলে?

(৮৪) মুসা বললেন, তারা আমার পশ্চাতে আসছে, আর তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই আমি তোমার নিকট তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।

(৮৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমি তোমার জাতিকে তোমার অবর্তমানে পরীক্ষায় ফেলেছি, আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

(৮৬) এরপর মুসা উত্তেজিত অবস্থায় আক্ষেপ করতে করতে তাঁর জাতির নিকট ফিরে গেলেন, তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে কি প্রতিশ্রুত সময় তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে? অথবা তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের গজব, যে কারণে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা কুফর ও নাফরমানী থেকে তওবা করে এবং ঈমান আনে, কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে, পাপাচারে লিপ্ত হবেনা বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে এবং আত্মসংশোধন করে আত্মোন্নতি লাভে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنِّىْ لَغَفَّارٌ

"আর নিশ্চয় আমি ক্ষমাকারী"।

لِّمَنْ تَابَ

"তাদের জন্যে, যারা শেরক থেকে তওবা করে"।

وَاٰمَنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি যারা ঈমান আনে এবং যারা আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

وَعَمِلَ صَالِحًا

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক আমল করে।

ثُمَّ اهْتَدٰى

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর অর্থ হল, "অতঃপর সে হেদায়েত পেয়েছে"। অর্থাৎ সে উপলব্ধি করেছে যে আল্লাহ পাকের

তৌফিকেই সে সুপথের সন্ধান পেয়েছে। কাতাদা ও সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, সে আমৃত্যু ইসলামের উপর কায়েম রয়েছে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

"নিশ্চয় যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, এরপর তার উপর সুদৃঢ় রয়েছে"।

ইমাম শা'বী (রঃ), মোকাতেল ও কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল, ঐ ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমার ঈমান ও নেক আমলের সওয়াব পাওয়া যাবে।

যায়েদ এবনে আসলাম বলেছেন আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল, সে এলম হাসিল করেছে যেন সে এলম অনুযায়ী আমল করে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল সে হেদায়েত লাভের পর আজীবন তার উপর কায়েম রয়েছে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদে বিশ্বাস করেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল, সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ পেয়ে গেছে আর এ আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ

"আর হে মূসা! তোমার জাতিকে পশ্চাতে রেখে তুমি কেন তাড়াতাড়ি করতে গেলে"?

শানে নজুল

ফেরাউন যখন ডুবে গেল, আল্লাহ পাকের রহমতে বণী ইসরাঈল জাতি তার জুলুম থেকে নাজাত পেল, তখন বণী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন করলো যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের নিকট যদি কোন জীবন-বিধান আসে তবে আমরা তার অনুসরণ করতে পারি। হযরত মূসা (আঃ) এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করলেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমি তোমাদের তৌরাত গ্রন্থ দান করবো। তাতে শরীয়তের যাবতীয় বিধান লিপিবদ্ধ থাকবে, তুমি বণী ইসরাঈলের ৭০ জন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে কোহে তূরে হাযির হও। যখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি অত্যধিক আগ্রহ ও আনন্দে সর্বাগ্রে তূর পর্বতে পৌঁছে যান। বণী ইসরাঈলের যে ৭০ ব্যক্তিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসছিলেন তারা পেছনে পড়ে যায়। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা চলে আস, আমি অগ্রসর হই। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ

"হে মুসা! তুমি এত তাড়াতাড়ি সঙ্গীদেরকে পেছনে ফেলে কেন চলে এসেছ"?

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ

قَالَ هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى

"হে আমার প্রতিপালক! তোমার টানে এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই আমি তাড়াতাড়ি করে সকলের আগে হাযির হয়েছি, আর আমার সঙ্গীরাও খুব দূরে নয়, তারাও অতি সত্বর পৌঁছে যাবে"।

অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে সকলের আগে তোমার নিকট হাযির হওয়ার কারণ অহংকার নয়; বরং তোমার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভই এর উদ্দেশ্য, আর এ তাড়াতাড়ি করার কারণ আমার জাতির ব্যাপারে গাফলতও নয়; বরং তারা আমার পদাংক অনুসরণ করে আসছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى

মূসা বলেন, "তারা আমার পশ্চাতে আসছে, আর তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি"।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, তারা আমার পেছনে আসছে, আমি দরবারে হাযিরীর ব্যাপারে এজন্যে তাড়াহুড়া করেছি যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে অধিকতর সাফল্য অর্জন করি। অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! আপনার প্রতি মহব্বতের কারণে, আপনার দীদার লাভের আকাংক্ষায় এবং আপনার মহান বাণী শ্রবণের অদম্য উৎসাহের কারণে আমি তাড়াতাড়ি করে সকলের আগে হাযির হয়েছি।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

আল্লাহ পাক বললেন, "আমি তোমার জাতিকে তোমার অবর্তমানে পরীক্ষায় ফেলেছি"।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, হে মূসা! তোমার চলে আসার পর তোমার জাতি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সামেরী নামক এক ব্যক্তি তাদেরকে পথভ্রষ্ট আদর্শচ্যুত করেছে। তারই প্ররোচনায় তারা তোমার অবর্তমানে গো-বৎস পূজা আরম্ভ করেছে। সামেরীর অপর নাম ছিল মুসা, তার পিতার নাম ছিল জফর। মুসা এবনে জফর হযরত মূসা (আঃ)-এর অবর্তমানে তাঁর জাতিকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। সে ছিল মুনাফেক। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সে ছিল ইসরাঈল বংশীয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিল কিবতী সম্প্রদায়ের লোক। সে অন্তরে ছিল কাফের, প্রকাশ্যে মোমেন। হযরত মূসা (আঃ) কোহে তূরে যাওয়ার সময় হযরত হারুন (আঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং এ নির্দেশ দেন যে জাতিকে তৌহীদ এবং হেদায়েতের উপর কায়েম রাখার চেষ্টা করবেন। হযরত মূসা (আঃ) কোহে তূরে চলে যাওয়ার সময় স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সামেরী একটি বাছুর তৈরী করে। হযরত মূসা (আঃ) যখন মিসর থেকে বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর পথ প্রদর্শক

ছিলেন হযরত জীব্রাঈল (আঃ)। হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর পা যেখানে পড়তো, সেখানে উদ্ভিদ জন্ম নিত। এ বিস্ময়কর বিষয়টি সামেরী লক্ষ্য করেছিল। সেজন্যে ঐ বিশেষ মাটি থেকে সামেরী কিছু অংশ তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৈরী ঐ বাছুরটির মুখে সামেরী একটু মাটি পুরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটি জীবিত বাছুরের ন্যায় চিৎকার দিতে আরম্ভ করে, এই সুযোগে সামেরী বলে, এটি তোমাদের উপাস্য। এরপর বণী ইসরাঈলের লোকেরা তার পূজা করতে শুরু করে।

বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় ফেরাউনের ভয়ে মুসা এবনে জফরকেও ফেরাউনের সৈন্যদের দ্বারা হত্যার ভয়ে মুসা এবনে জফরের মা পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় একটি গর্তের মধ্যে রেখে উপর দিয়ে পাথর রেখে দেয়, যেন কেউ না দেখতে পায়। আল্লাহ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে লালন-পালনের সুব্যবস্থা করার। হযরত জীব্রাইল (আঃ) তাঁর আঙ্গুলে মধু দুধ রেখে নবজাত শিশু মুসা এবনে জফরের মুখে দিতেন। এভাবে মুসা এবনে জফর বা সামেরীর লালন পালন করা হয়। কিন্তু অবশেষে ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত মূসা এবনে এমরান আল্লাহর নবী, রসূল মনোনীত হলেন, আর জীব্রাঈল (আঃ)-এর দ্বারা লালিত পালিত মুসা এবনে জফর কাফেরই রয়ে গেল। তাই কবি বলেছেন,

فموسى الذى رباه فرعون مرسل - وموسى الذى رباه جبرئيل كافر

অর্থাৎ যে মূসাকে ফেরাউন লালন পালন করলো, তিনি রসূল মনোনীত হলেন, আর যে মুসার লালন-পালন হল জীব্রাঈল (আঃ)-এর হাতে সে কাফের রয়ে গেল। এখানেই আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা, তিনি যাকে হেদায়েত করেন সে হেদায়েত লাভ করে, আর তিনি যাকে হেদায়েত নসীব করেন না সে পথভ্রষ্ট থাকে।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে মূসা! আমি তোমার জাতিকে একটি পরীক্ষায় ফেলেছি। সামেরী বাছুর তৈরী করে বণী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষা ছিল যে কে তাকে পূজা করে আর কে তৌহীদে বিশ্বাসী থাকে। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, তোমার চলে আসার পর তোমার জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সামেরীর তৈরী বাছুরের পূজা শুরু করেছে।

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, সে তাদেরকে বাছুর পূজায় উৎসাহিত করেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বণী ইসরাঈলের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। তন্মধ্যে বারো

হাজার ব্যতীত আর সকলেই বাছুর পূজা করেছে।[১]

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে সামেরী নামের কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। সামেরা একটি স্থানের নাম। এ ব্যক্তি সামেরা নামক স্থানের অধিবাসী ছিল বলে তাকে "সামেরী" বলা হয়েছে। লোকটি ছিল কাফের বা বণী ইসরাঈলের সরদার।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, সামেরা মূলতঃ বণী ইসরাঈলের একটি গোত্রের নাম ছিল। ঐ গোত্রের লোক হওয়ার কারণে তাকে সামেরী বলা হয়েছে। তার আসল নাম ছিল মুসা এবনে জফর। লোকটি মুনাফেক ছিল।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) সাঈদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সামেরী মিসরের কেরমান এলাকার অধিবাসী ছিল। সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল যারা গরু পূজা করতো। তবে অধিকাংশ তফসীকারকারগণ তার সম্পর্কে এ মত পোষণ করতেন যে সে ছিল বণী ইসরাঈল জাতির সামেরা গোত্রের লোক। আর তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সে ছিল কিবতী, তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। ইমাম রাজী (রঃ) একথাও লিখেছেন, যে সামেরী পূর্ব থেকেই বাছুর বানানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিল। হযরত মূসা (আঃ) যখন কোহে তূরে তশরীফ নিয়ে গেলেন তখন সে প্রকাশ্যে বণী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে।

কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে, মিসরীয় ভাষায় সমর বলা হয় বিদেশীকে বা বহিরাগত লোককে। এ ব্যাখ্যার আলোকে সামেরী শব্দের অর্থ হল এমন ব্যক্তি যে ইসরাঈলী ছিল না। তবে মিসর থেকে ইসরাঈলীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এসেছে। আর ইহুদী জাতির মধ্যে সামেরীয়া নামক একটি বিখ্যাত গোত্র আছে। হয়তো সামেরী ঐ গোত্রেরই লোক হবে।[৩]

فَرَجَعَ مُوْسٰىٓ اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا

"এরপর মূসা উত্তেজিত অবস্থায় আক্ষেপ করতে করতে তার জাতির নিকট ফিরে গেলেন"।

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতির অধঃপতনের কথা শ্রবণ করে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং আক্ষেপ করতে করতে তাঁর জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। আল্লাহ পাক চল্লিশ দিন এ'তকোফ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোহে তূরে তা পালন করার পর তৌরাত নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতির নিকট ফিরে এলেন, কিন্তু অত্যন্ত রাগান্বিত উত্তেজিত এবং আক্ষেপরত অবস্থায়। আর এটিই স্বাভাবিক। কেননা, এক আল্লাহ পাকের রহমতেই হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে ফেরাউনের জুলুম থেকে বণী ইসরাঈল নাজাত পেয়েছিল। অথচ কয়েকদিন পরই বণী ইসরাঈল বাছুরের পূজা করে শেরকের ন্যায় ঘৃণ্য পাপে লিপ্ত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১১
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১০১
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪৭

হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাই অত্যন্ত রাগান্বিত ও উত্তেজিত হন।

- قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا

তিনি বলেন, "হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে কি প্রতিশ্রুত সময় তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে? অথবা তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের গজব, যে কারণে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে"?

অর্থাৎ তোমরা যে এ অন্যায় আচরণ করলে তার দু'টি কারণ হতে পারে-(১) আমার বিদায়ের পর অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং আমার অপেক্ষা করতে করতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ, এজন্যে তোমরা তৌহীদের উপর কায়েম থাকার যে অঙ্গীকার করেছিলে তা ভুলে গিয়েছ। আল্লাহ পাক যে তৌরাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে কি অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে যে তোমরা এ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছ! (২) অথবা তোমরা এমন কাজ করতে চেয়েছ যার কারণে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গযব আপতিত হয়। প্রথম কথা তো সত্য নয়, এজন্যে যে আমার এখান থেকে যাওয়ার পর মাত্র ৪০টি দিনই অতিবাহিত হয়েছে। এটি কোন সুদীর্ঘ সময় নয়, আর দ্বিতীয় কারণও হতে পারেনা কেননা, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর গজবকে আহবান করতে পারেনা। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তোমরা আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বর্জন করেছ। স্মরণ কর, তোমরা কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে কোন কিতাব নিয়ে আসলে তোমরা তা মেনে চলবে?

فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِیْ

বস্তুতঃ তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ এবং বাছুর পূজার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর গজবকে আহবান করেছ।

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۬ فَنَسِیَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا
يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِیْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

তরজমা

(৮৭) তারা বললো, আমরা স্বেচ্ছায় আপনার কথার বরখেলাফ করিনি, তবে ফেরাউনের জাতির যে সব অলংকারের বোঝা আমাদের বহন করতে হচ্ছিল আমরা তা ফেলে দেই আর এভাবে সামেরী তা ঢালাই করে নেয়।

(৮৮) এরপর সে তাদের জন্যে একটি গো-বৎস তৈরী করে আনে, এক অবয়ব, যাতে ছিল গাভীর স্বর, তারা বললো, এটিই হল তোমাদের ও মূসার মা'বুদ। কিন্তু সে ভুলে গেছে।

(৮৯) তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে সে তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারেনা এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও সে রাখেনা।

(৯০) হারুন তাদেরকে প্রথমেই বলেছিলেন, হে জাতি! তোমরা বিভ্রান্ত হয়েছ এবং তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময় আল্লাহ পাকই, অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর।

(৯১) তারা বললো, আমাদের নিকট মূসা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা বাছুর পূজা থেকে কোন অবস্থাতেই বিরত হবনা।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর জাতি বাছুর পূজা করে যে অন্যায় করেছিল হযরত মূসা (আঃ)-এজন্যে রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে তারই বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বণী ইসরাঈল তাদের আচরণের ব্যাপারে যে জবাব দিয়েছে তা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا

তারা বলেছে, আমরা স্বেচ্ছায় কথা ভঙ্গ করিনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে মিসর থেকে বিদায়ের সময় ফেরাউনের জাতির যে সব অলংকার বহন করে এনেছিলাম তা কি কাজে ব্যবহার করবো সিদ্ধান্ত করতে না পেরে ঐ বোঝা আমরা ফেলে দেই।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত হারুন (আঃ) নিজেই একটি গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, "সমস্ত অলংকার এই গর্তে নিক্ষেপ কর, পরে মূসা (আঃ) যখন ফিরে আসবেন তখন তিনি যা নির্দেশ দেন সে মোতাবেক কাজ কর"। এদিকে সামেরী হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর পদচিহ্নের স্থান থেকে আনা মাটি তাতে নিক্ষেপ করে। এরপর হযরত হারুন (আঃ)-কে বলে, আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যেন আমার মনের আকাংক্ষা আল্লাহ পাক কবুল করেন। হযরত হারুন (আঃ) জানতেন না তার মনে কি আকাংক্ষা ছিল। তিনি দোয়া করলেন তার জন্য। আর তার আকাংক্ষা ছিল যেন এই অলংকার গুলো দ্বারা আল্লাহ পাক একটি বাছুর বানিয়ে দেন। দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল হল এবং ঐ বাছুরের মুখ থেকে অন্যান্য বাছুরের ন্যায় আওয়াজ আসতে লাগলো এবং বণী ইসরাঈলের জন্যে বাছুরের এই ফেতনা

শুরু হয়ে গেল। কেননা, সামেরী বললো, এটি তোমাদের মা'বুদ, তার পূজা কর। বর্ণিত আছে যে একবার হযরত হারুন (আঃ) সামেরীর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন সামেরী বাছুরটিকে ঠিক করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করছো? সে বললো, এমন জিনিস তৈরী করছি যা ক্ষতি করে, উপকার করেনা। তখন হযরত হারুন (আঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি এমনই করে দাও। এরপর তিনি সেখান থেকে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সামেরীর পক্ষে তা কবুল হল। এভাবে বাছুরটি জীবিত বাছুরের ন্যায় ডাক দিতে লাগলো।[১]

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে ফেরাউনের জাতির এ অলংকার বণী ইসরাঈলের নিকট কিভাবে আসলো? এ প্রশ্নের জবাবে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। গণিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে এসেছে। অথবা বণী ইসরাঈল তাদের নিকট থেকে এ অলংকার সাময়িকভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশে নিয়েছিল। আবদ এবনে হামীদ, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বণী ইসরাঈল ফেরাউনের জাতি থেকে এ অলংকারগুলো ঋণ হিসাবে নিয়েছিল, এরপর আর ফেরত দেয়নি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরাউন ও তার জাতি যখন লোহিত সাগরে ডুবে যায় তখন সাগর এই অলংকার গুলো বাইরে নিক্ষেপ করে। অথবা বণী ইসরাঈল এগুলোকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবেই পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু মালে গণিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ তাদের জন্যে বৈধ ছিলনা, তাই তারা এগুলোকে বোঝা বলেছে।

فَقَذَفْنٰهَا

"আমরা সেগুলো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করি"।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে সামেরীর কথায় তারা অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করেছে, যাতে করে হযরত মূসা (আঃ) ফিরে এসে এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেন।[২]

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ

অর্থাৎ সামেরীর নিকট যে অলংকার ছিল তা-ও সে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলো।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ

"এরপর সে তাদের জন্যে একটি গো-বৎস তৈরী করে আনে, এক অবয়ব, যাতে ছিল গাভীর স্বর"।

অর্থাৎ এভাবে অলংকারগুলোক অগ্নিতে ফেলে সামেরী একটি বাছুরের অবয়ব তৈরী করলো। এরপর তারা (ঐ নির্বোধ লোকেরা) একে অন্যকে বলতে লাগলো, ঐটিইতো

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১

তোমাদের ও মূসার উপাস্য, অথচ মূসা ভুলে গেলেন। অর্থাৎ উপাস্যের অনুসন্ধানে কোহে তূরে গমন করলেন। অথবা نسى শব্দটির অর্থ হল, সামেরী ভুলে গেল। অর্থাৎ সে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানকে পরিহার করলো এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য হল। আলোচ্য আয়াতে خوار শব্দটির অর্থ হল, গাভীর অর্থহীন শব্দ।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

"তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে সে তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারেনা এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও সে রাখেনা"?

অর্থাৎ তারা এমন কিছুকে উপাস্য মনে করেছে যা এত অসহায় যে তাদের কোন জবাব পর্যন্ত দিতে পারেনা, তাদের কোন উপকার করতে পারেনা, কোন ক্ষতিও করতে পারেন। যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, কেন তোমরা এমন কিছুর উপাসনা কর যা শ্রবণও করেনা এবং দেখতেও পারেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যখন সামেরী বাছুরটি তৈরী করে বণী ইসরাঈলের সম্মুখে রাখল এবং ঐ বাছুরটি সত্যিকার বাছুরের ন্যায় শব্দ করতে লাগলো তখন বণী ইসরাঈলের ঐ পথভ্রষ্ট লোকেরা সেজদারত হল এবং দ্বিতীয় বার শব্দ শ্রবণ করে সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করলো। এ পথভ্রষ্ট লোকেরা অন্য মুসলমানদেরকে আদর্শচ্যুত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) نسى শব্দটির সর্বনামের ভিত্তিতে উভয় অর্থের উল্লেখ করেছেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[১]

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى

"হারুন তাদেরকে প্রথমেই বলেছিলেন, হে জাতি! তোমরা বিভ্রান্ত হয়েছ এবং তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময় আল্লাহ পাকই, অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর"।

হযরত হারুন (আঃ) পথভ্রষ্ট বণী ইসরাঈলকে এমন জঘন্য গোমরাহী থেকে দূরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা বাছুরের মুসিবতে গ্রেফতার হয়েছ, তোমাদের মা'বুদ দয়াময় আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নয়। তোমাদের জন্যে বাছুর একটি ফেতনা হয়ে দাড়িয়েছে, এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। কে ঈমানদার থাকে, আর কে বেঈমান হয়। যিনি দয়াময়, যিনি করুণাময়, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, তিনিই তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক। অতএব, তোমরা শুধু আমার অনুসরণ কর, বাছুরের পূজা বর্জন কর, আমি যা বলি তা মান। আর আমি যা পরিহার করতে বলি তা পরিহার কর।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮৪

قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

তারা বললো, "আমাদের নিকট মূসা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা বাছুর পূজা থেকে কোন অবস্থাতেই বিরত হবনা"।

অর্থাৎ এ পথভ্রষ্ট লোকেরা হযরত হারুন (আঃ)-কে এই জবাব দিল যে হযরত মূসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা বাছুর পূজায় লিপ্ত থাকবই। বণী ইসরাঈলের এ মন্দ লোকদের অন্যায় আচরণের কারণে হযরত হারুন (আঃ) বারো হাজার লোক নিয়ে তাদের থেকে সরে পড়লেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেহেতু সত্যের আদেশ এবং মিথ্যা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হযরত হারুন (আঃ)-এর কর্তব্য ছিল, এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ) কোহে তূরে গমনের সময়ও হযরত হারুন (আঃ)-কে বণী ইসরাঈলের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, এজন্যে তিনি তাদেরকে গো-বৎসের পূজা থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।[১]

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا
مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾ قَالَ
فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ
لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا
مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

তরজমা

(৯২) মুসা বললেন, হে হারুন! তাদেরকে যখন পথভ্রষ্ট হতে তুমি দেখলে তখন কোন্ জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত করলো,

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৫০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৪১৪-১৫

(৯৩) আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?

(৯৪) হারুন বললেন, হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাঁড়ি ধরবেন না এবং মাথাও না, আমি আশংকা করেছিলাম যে আপনি বলবেন তুমি বণী ইসরাঈল ও আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথা রাখ নাই।

(৯৫) মূসা বললেন, হে সামেরী! তোর খবর কি?

(৯৬) সে বললো, আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যা সকলে দেখতে পায়নি, এরপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি ভরে নিলাম এবং তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আমার মন আমাকে এ পরামর্শ দিয়েছিল।

(৯৭) মূসা বললেন, যা। তুই দূর হ-। দুনিয়াতে তোকে একথাই বলতে হবে, আমি অস্পৃশ্য (আমাকে স্পর্শ করোনা)। আর তোর জন্যে এক নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে, কখনও যার ব্যতিক্রম হবেনা, আর তোর সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুই রত ছিলি, আমরা তাকে পুড়িয়ে ফেলব, এরপর সাগরে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেব।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মূসা (আঃ) যখন কোহে তূর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বণী ইসরাঈলের চিৎকার শ্রবণ করলেন। তারা বাছুরটির চারিপার্শ্বে নর্তন-কুর্দন করছিল। তাঁর সঙ্গী ৭০ জন জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন, আমরা যে শব্দ শ্রবণ করছি তাতে মনে হয় এরই মধ্যে কোন ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এসে দেখলেন যে বণী ইসরাঈলীরা ঐ বাছুরটির চতুর্দিকে নর্তন-কুর্দনে রত রয়েছে। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে ডান হাতে হযরত হারুন (আঃ)-এর চুল ধরলেন এবং বাম হাতে তাঁর দাঁড়ি ধরে টান দিলেন এবং বললেন, মনে হচ্ছে তুমি আমার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করোনি, তা না হলে শেরকের ন্যায় এমন মহা পাপ দেখেও তুমি তাদেরকে কেন বিরত রাখলে না? যদি তারা তোমার কথা অমান্য করে থাকে তবে তুমি তোমার মোমেন সাথীদের নিয়ে শক্ত হাতে তাদেরকে দমন করলে না কেন? আর যদি এমনই অবস্থা হয়ে থাকে যে তুমি তাদেরকে বাধা দিতে অপারগ হয়ে থাক তবে তাদেরকে পরিত্যাগ করে তুমি আমার নিকট চলে আসলে না কেন এবং এ সম্পর্কে আমাকে কেন খবর দিলেনা? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ

মূসা (আঃ) বললেন, হে হারুন! আমার অনুসরণ করা থেকে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিয়েছে, বিশেষতঃ যখন তুমি দেখলে যে তারা শেরক ও কুফরে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, অথচ আমি ওসিয়ত করেছিলাম যে তুমি বণী ইসরাঈল জাতিকে তৌহীদের উপর কায়েম রাখবে এবং শেরক ও কুফর থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে।

اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ

"তবে কি তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ? তাদের এহেন অন্যায় আচরণে তুমি রাজী হয়েছ"?

قَالَ يَابْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَأْسِىْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ

হারুন বললেনঃ "হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাঁড়ি ধরবেন না এবং মাথাও না। আমি আশংকা করেছিলাম যে আপনি বলবেন, "তুমি বণী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথা রাখ নাই"।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়ঃ

১. হযরত হারুন (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন আপন ভাই। তাই শুধু ভাই বলাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু يَابْنَؤُمَّ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো মায়ের কথা স্মরণ করলে পরস্পরের মমত্ব-বোধ বৃদ্ধি পাবে, এভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরের ক্ষোভ এবং ব্যথা কিছুটা হ্রাস পাবে।

২. যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় হযরত হারুন (আঃ)-এর মাথার চুল ধরে টান দিয়েছিলেন তাই হযরত হারুন (আঃ) বলেছিলেন, 'আমার দাঁড়ি এবং চুল ধরে টানবেন না'। হযরত মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈলের কুফর ও নাফরমানী দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাঁর এ ক্রোধ ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, কুফর ও শেরেকের উপর তাঁর আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশার্থে, এজন্যে তিনি হযরত হারুন (আঃ)-এর দাঁড়ি এবং চুল ধরে টান দিয়েছিলেন।

৩. হযরত হারুন (আঃ) তাঁকে বললেন, 'আমি তাদেরকে এ অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্যে অনেক উপদেশ দিয়েছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা বিরত হয়নি। যদি আমি কঠোর নীতি অবলম্বন করতাম এবং বাছুর পূজকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতাম, এমন অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই বণী ইসরাঈলের মধ্যে দু'দল হয়ে যেত। একদল আমার সমর্থক হতো এবং অন্য দল আমার বিরোধী থাকতো। এমন অবস্থায় আপনি বলতেন যে আমার অনুপস্থিত কালে তুমি বণী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। এজন্যে আমি বিনম্র ভাষায় উপদেশ প্রদানের পথ অবলম্বন করেছি। হত্যা ও খুন-খারাবীর পথ পরিহার করেছি'।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ

"হে সামেরী! তোর খবর কি"?

হযরত হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলার পর হযরত মূসা (আঃ) সামেরীর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন, 'হে সামেরী, তোর কী অবস্থা! তুই কেন এ ফেৎনা সৃষ্টি করলি'?

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ

অর্থাৎ আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যা অন্যরা দেখতে পায়নি, এ কারণে আমি আল্লাহ পাকের প্রেরিত দূতের পায়ের তলা থেকে এক মুষ্টি মাটি ভরে নিয়েছিলাম এবং তা আমি

ঐ অলঙ্কারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি আর আমার মনই আমাকে এ পরামর্শ দিয়েছিল।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, সামেরীর সম্প্রদায় গাভীর পূজা করতো। এজন্যে তার অন্তরেও গাভীর প্রতি দুর্বলতা ছিল। যদিও সে বণী ইসরাঈলের সাথে ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিল কিন্তু গাভী পূজার প্রতি তার মনের গহনে আগ্রহ ছিল। এ কারণে সে এ মন্দ পথ অবলম্বন করেছিল।[১]

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'তুই দূর হ'। এরপর তিনি তার অপকীর্তির শাস্তি ঘোষণা করলেনঃ এ মুহূর্ত থেকে তুই অস্পৃশ্য। দুনিয়াতে সকলকে তুই নিজেই বলতে থাকবি, "তোমরা আমাকে স্পর্শ করোনা, আমার কাছেও এসো না"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এরপর সে মানুষ থেকে দূরে থাকতো, বনে-জঙ্গলে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করতো। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকেও আদেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন তার সাথে যোগাযোগ না করে, কেউ যেন তার কাছেও না যায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) لَا مِسَاسَ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ কেউ তোকেও স্পর্শ করবে না, তোর সন্তান-সন্ততিকেও স্পর্শ করবে না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যেহেতু কুখ্যাত সামেরী বণী ইসরাঈলের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভের অসৎ উদ্দেশে এ অন্যায় পন্থা অবলম্বন করেছিল তাই তারই শাস্তি স্বরূপ এ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সে নিজেই মানুষকে বলবে যে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাক এবং আমাকে ঘৃণ্য এবং অস্পৃশ্য মনে কর।

বর্ণিত আছে যে এ শাস্তি ঘোষণার পর তার অবস্থা হয়েছিল এই, যে কেউ যদি তাকে স্পর্শ করতো তবে ঐ ব্যক্তি এবং সামেরী উভয়েই কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হতো। আর এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ

হযরত মূসা (আঃ) আরও বললেনঃ হে সামেরী! দুনিয়ার এ অপমানজনক শাস্তিই তোর শেষ নয়; বরং নির্দিষ্ট সময়ের তথা আখেরাতের শাস্তিও তোর জন্যে রয়েছে অবধারিত। অর্থাৎ দুনিয়ার এ শাস্তিই যথেষ্ট নয়, বরং আখেরাতে রয়েছে তার জন্যে কঠিন কঠোর আযাব।

وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

"আর তোর উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ যার পূজায় তুই মত্ত থাকতি; আমি তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেব এবং সেই ছাইকে সাগরে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেব"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮৫

ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আঃ) সামেরীর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন, আর এ আয়াতে তার সেই গো-দেবতার পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন যে, তোর সম্মুখে তাকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি যেন তার পূজারীদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে তারা ছিল সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। যে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যের উপাস্য কি করে হতে পারে? পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে সর্বকালের পৌত্তলিকদের জন্যে রয়েছে এক মহান শিক্ষা। হযরত মূসা (আঃ) এ উদ্দেশেই উপরোক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।[১]

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا
ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَٰلِدِينَ
فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ
ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن
لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

তরজমা

(৯৮) তোমাদের মা'বুদ তো শুধু এক আল্লাহ পাকই, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদই নেই। তাঁর জ্ঞান সকল বিষয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত।

(৯৯) (হে রসূল!) আমি এভাবেই আপনার নিকট তাদের কথা বর্ণনা করছি যারা ইতিপূর্বে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে আমার নিকট থেকেই দান করেছি কিতাব (পবিত্র কোরআন)।

(১০০) যে এই কিতাব থেকে বিমুখ হবে সে কেয়ামতের দিন মহা ভার বহন করবে।

(১০১) সে চিরদিন তাতে থাকবে এবং কেয়ামতের দিন ঐ দূর্বহ বোঝা তার জন্যে হবে কত মন্দ!

(১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন আমি পাপীষ্ঠদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায়

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৮

একত্রিত করবো।

(১০৩) (সেদিন) তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা তো মাত্র দশ দিনই অবস্থান করেছিলে!

(১০৪) তারা কী বলবে তা আমরা ভাল-ভাবেই জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) বাতিল এবং মিথ্যার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন। সামেরীর প্রস্তুতকৃত গো-বৎসকে জ্বালিয়ে তার ভস্ম সাগরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে তৌহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের যে আহবান জানিয়েছেন তার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

"তোমাদের মা'বুদ তো শুধু এক আল্লাহ পাকই, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদই নেই"।

বস্তুতঃ যিনি মহামহিম, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যাঁর কোন শরীক নেই তিনিই তোমাদের মা'বুদ, তিনিই তোমাদের উপাস্য। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, আর কোন কিছুর মধ্যে মানব জাতির বন্দেগী লাভের যোগ্যতাও নেই। কুদরতে হেকমতে, ক্ষমতায়, জ্ঞানে-গুণে কোন কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্তও নেই, তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী, সমগ্র বিশ্ব জগত একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়, তিনি অনন্ত অসীম জ্ঞান এবং কুদরতের অধিকারী, তাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব, বন্দেগী শুধু তাঁরই করতে হবে।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا

"(হে রসূল!) আমি এভাবেই আপনার নিকট তাদের কথা বর্ণনা করছি যারা ইতিপূর্বে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে"।

পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ) এবং ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের সুস্পষ্ট দলিল ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে।[১]

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আমি আপনাকে এই কোরআনে মানব জাতির অতীত কালের অনেক ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেছি, যেন এটি আপনার নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ হয়। আর এই কোরআন যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে একথার দলিল হয় এবং আপনার জন্যে হয় সান্ত্বনার কারণ এবং যারা দ্বীন ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৮৪

তাদের জন্যে রয়েছে এতে সতর্কবাণী। আর মানুষ যেন একথা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারে যে পবিত্র কোরআন আপনার নবুওয়্যত ও রেসালতের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং জীবন্ত নিদর্শন। যারা পবিত্র কোরআন থেকে বিমুখ হয়, যারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি জানায়, কেয়ামতের দিন তাদের ভয়াবহ পরিণতি তারা দেখতে পাবে। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা লাঠির কথার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা পবিত্র কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ

"আমি এভাবেই আপনার নিকট বর্ণনা করেছি"।

অর্থাৎ যেভাবে আমি (হে রসূল!) আপনাকে মূসা (আঃ)-এর ঘটনা শুনিয়েছি, ঠিক এভাবে অতীত জাতিগুলোর অনেক ঘটনাবলী আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করেছি। এসব ঘটনা নিছক ঘটনা নয়; বরং এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে অনেক বড় শিক্ষা।

وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا

"আর আমি আপনাকে আমার নিকট থেকে দান করেছি কিতাব"।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ذكر শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন কোরআনে করীম অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে কোরআন মজীদ দান করেছি, এতে রয়েছে অতীত জাতিগুলোর শিক্ষণীয় ঘটনা। রয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে উপদেশ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের জিকর ذكر শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উত্তম আলোচনা, বিশ্বব্যাপী তাঁর সুনাম এবং সুখ্যাতি যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হবে, আমি আমার তরফ থেকে (হে রসূল!) আপনাকে বিশ্বব্যাপী সুনাম সুখ্যাতি দান করেছি, যেমন সূরা ইনশিরাহে এরশাদ হয়েছেঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"(হে রসূল!) আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি"।

আর কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেনঃ আমি (হে রসূল!) আপনার আলোচনাকে আমার নামের সাথে একত্রিত করে দিয়েছি। যেমন আযান, একামত ও তাশাহহুদে এবং কলেমায়ে তাইয়েবায় একত্রিত করে দিয়েছি।

মওলানা রূমী (রঃ) বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে যেমন আল্লাহ পাক লাঠির মোজেযা দিয়েছিলেন যা বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া অগণিত সাপগুলোকে ক্ষণিকের মধ্যে গিলে ফেলেছিল, ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন দান করেছেন, যা কুফর, শেরক ও নাফরমানীর অজগরকে গিলে ফেলবে। মওলানা রূমীর ভাষায়ঃ

هست قران مرترا همچو عصا * كفرها در كشد چون ازدها

মওলানা রূমী (রঃ) আরও বলেছেনঃ

تو اگر در زير خاكے خفتئ * چون عصائش دان تو آنچه گفته

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার শোচনীয় পরিণতি

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا

"যারা পবিত্র কোরআন থেকে বিমুখ হবে তারা কেয়ামতের দিন মহা ভার বহন করবে"।

অর্থাৎ যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করবে না, যারা পবিত্র কোরআনের বিধানকে অমান্য করবে তারা কেয়ামতের দিন তাদের মন্দ কাজের বোঝা বহন করবে।

وزرا শব্দটির অর্থ হলো গুনাহর বোঝা। একখানি হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেরদের সামনে তাদের জীবনের পাপাচারগুলো অত্যন্ত মন্দ, ঘৃণ্য ও কুৎসিত আকৃতি নিয়ে হাযির হবে এবং কাফেরকে বলবে, তুমি কি আমাকে চেননা? কাফের জবাব দেবে, না, এতটুকু বুঝি যে আল্লাহ পাক তোমাকে অত্যন্ত মন্দ আকৃতিতে তৈরী করেছেন। তখন আমল বলবে, আমি দুনিয়াতেও এমনই ছিলাম, আমি তোমার আমল বা কার্যকলাপ। পৃথিবীতে দীর্ঘকাল যাবত তুমি আমার প্রতি আরোহী ছিলে, আজ আমি তোমার উপর আরোহন করবো। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ

"আর তারা তাদের গুনাহর বোঝা বহন করবে তাদের পৃষ্ঠ-দেশে"।

যেহেতু ভারী বোঝা মানুষ বহন করতে সক্ষম হয়না, ঠিক তেমনি গুনাহর বোঝা বহন করাও তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে।

আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে, যে পবিত্র কোরআন থেকে বিমুখ হবে সে কেয়ামতের দিন নিজের কাঁধে সেই অর্থ-সম্পদের বোঝা বহন করবে, যা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে সে আহরণ করেছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার হক্ব ব্যতীত গ্রহণ না করে। নতুবা যখন সে আল্লাহ পাকের সম্মুখে হাযির হবে কেয়ামতের দিন তা তার উপর সওয়ার হবে। আমি যেন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এমন অবস্থায় না দেখতে পাই যে সে উষ্ট্র গাভী বকরী নিয়ে হাযির হয়েছে। অর্থাৎ যারা এসব সম্পদ

অন্যায়ভাবে উপার্জন করবে কেয়ামতের দিন সে সম্পদ নিয়ে জবাবদেহী করার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায় ভাবে দখল করবে কেয়ামতের দিন সাত জমিনের বোঝা তার গলায় লটকানো হবে।

তেবরাণী হযরত হাকাম এবনে হারেস সালমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথের এক বিঘত জমিনও অন্যায় ভাবে দখল করে নেবে কেয়ামতের দিন সে সাত জমিন বহন করে হাযির হবে। এমনি বর্ণনা রয়েছে ইমাম আহমদ (রঃ) থেকেও।

ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বোখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দান করার উদ্দেশে দাঁড়ালেন এবং মালে গণিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে খেয়ানত করার সমালোচনা করেন। এরপর এরশাদ করেন, এমন যেন না হয় যে তোমাদের কাউকে না দেখি যে সে একটি উষ্ট্র বহন করে হাযির হয়েছে, আর আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন, আমি তখন বলবো, আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি।

যাহোক, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করবে, যারা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করবে তাদের এ অন্যায়ের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর।

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ

"তারা ঐ শাস্তি চিরদিন ভোগ করবে"।

وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا

এবং কেয়ামতের দিন এ দুর্বহ বোঝা তাদের জন্যে হবে কত মন্দ! কেননা, তাদেরকে ঐ বোঝা বহনে বাধ্য করা হবে। তখন তারা হবে বিপদগ্রস্ত এবং কোপগ্রস্ত।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন আমি পাপীষ্ঠদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় একত্রিত করবো"।

زُرْقًا শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ লিখেছেন, এর অর্থ হল নীল চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া। আরবগণ এমন চক্ষুকে অত্যন্ত অপছন্দ করতো। এজন্যে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ বিকট দৃশ্য, অথবা এর অর্থ হল তারা হবে অন্ধ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, زُرْقًا শব্দটি দ্বারা অন্ধকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

"আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে তুলবো"।

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

"তারা নিজেদের মধ্যে চপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা তো মাত্র দশ দিনই অবস্থান করেছিলে"।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন ও সুদীর্ঘ সময়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যখন একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে, যখন সূর্য মাথার উপর থাকবে, যখন সমগ্র মানব জাতি চরম অসহায় অবস্থায় থাকবে তখন কাফেররা দুনিয়ার জীবনকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও স্বল্পকালীন মনে করবে। যেহেতু তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, তাই চুপিসারে কথা বলবে, আর যেহেতু কেয়ামতের দিন মানব জাতি দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাবে তাই এ ক্ষণস্থায়ী জগতের আনন্দ উল্লাসের কথা স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যাবে। চিরস্থায়ী জীবনের সম্মুখে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং মহাকালের সম্মুখে ইহকাল যে কিছুই নয়, এ সত্য মর্মে মর্মে তারা উপলব্ধি করবে, তখন দুনিয়ার অবস্থানকে মানুষ অতি সামান্য মনে করবে, কেননা এই সময় গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে অতিবাহিত করেছে। তাই কেয়ামতের দিন আক্ষেপ এবং অনুতাপ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল মধ্যলোকে তথা কবরে দশ দিন অবস্থানের কথা তারা বলবে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর কেয়ামতের ময়দানে হাযির হওয়া পর্যন্ত চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবে। এ সময়কেই তারা দশ দিন মনে করবে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

কাফেরদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে তারা বলবে, দশ দিন কোথায়? আমরা তো শুধু একদিনই অতিবাহিত করেছি। দুনিয়ার এ জীবন যে আখেরাতের মোকাবেলায় অত্যন্ত নগণ্য, আর আখেরাত যে চিরস্থায়ী-এ সত্যের সঠিক উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশই হবে তাদের এ কথায়।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا
فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

তরজমা ঃ

(১০৫) আর (হে রসূল!) তারা আপনাকে পর্বত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তাদের মূলোৎপাটন করে নিক্ষিপ্ত করে দেবেন।

(১০৬) এরপর তিনি পৃথিবীকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে।

(১০৭) এরপর তুমি তাতে কোন আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু দেখতে পাবেনা।

(১০৮) সেদিন তারা আহবানকারীর পেছনে ছুটবে যার ব্যাপারে এদিক সেদিক করতে পারবে না এবং দয়াময়ের ভয়ে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই আপনি মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত কিছুই শ্রবণ করবেন না।

(১০৯) সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দান করবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।

(১১০) তাদের অগ্র-পশ্চাতে তিনি সব কিছুই জানেন; কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারবেনা।

(১১১) তারা সেই চিরঞ্জীব, চিরন্তনের সম্মুখে মুখ ঘষতে থাকবে। নিশ্চয় সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে।

(১১২) আর যে ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে অবিচার বা ক্ষতির ভয় তার নেই।

(১১৩) আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি এবং তাতে

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে করে তারা ভয় করে অথবা তা হয় তাদের জন্যে উপদেশ।

তফসীরুল কোরআন

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, কেয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

এবনে মুনজের এবনে জোরায়েয থেকে বর্ণনা করেছেন যে কোরায়েশ গোত্রের কিছু লোক কেয়ামত সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলে, যে কেয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, সে কেয়ামতের দিন এ পাহাড়গুলোর কি হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।[২]

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-ও একথাই বলেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যদি কেয়ামতের পরে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় আর একথা সত্য হয় তবে এ বিশাল বিস্তৃত সুদৃঢ় পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই কেয়ামতের উল্লেখের পরই কাফেরদের পাহাড় সম্পর্কীয় একথাটি স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ

(হে রসূল!) কাফেররা কেয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপহাস করে, বলে, আচ্ছা কেয়ামতের পূর্বে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলছেন এমন অবস্থায় এ পাহাড়গুলোর কি অবস্থা হবে? এগুলো কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, কেয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক এসব পাহাড়-পর্বতকে বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবেন। আর তখন পৃথিবীর কোথাও আঁকা-বাঁকা বা উঁচু-নিচু কোন কিছুই থাকবে না"।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ

সেদিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতা মানুষকে যেদিকে ডাকবে সেদিকেই তারা পতঙ্গের মত ছুটবে, যেদিক থেকে ফেরেশতার ডাক শুনবে সেদিকেই ছুটবে, এদিক সেদিক যাবেনা, আঁকা-বাঁকা পথে চলবেনা। তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি কাফেররা

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২২
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৬১
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১১৭

দুনিয়াতে নবী রসূলগণের ডাকে সাড়া দিত আর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করতো তবে এমনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতোনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত داعى বা আহবায়ক যাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত ইস্রাফিল (আঃ)। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র মানব জাতিকে আহবান করবেন যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন, অতএব সকলে হাযির হও।

হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর ডাকের পর কেউ আর এদিক সেদিক যাবে না, যেদিক থেকে ডাক শ্রবণ করবে সেদিকেই ছুটবে।

وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ পাকের ভয়ে সকলের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কারো মুখে কথা থাকবেনা, সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا

এতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে হে পাঠক! তুমি তখন কারো কোন কথা শুনতে পাবেনা, পদধ্বনি ব্যতীত। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের দিকে মানুষের ছুটে চলার শব্দ ব্যতীত কেউ আর কোন কথা শুনবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, هَمْسًا শব্দটির অর্থ হল উষ্ট্রের চলার শব্দ। আল্লামা বগভী (রঃ) এ সম্পর্কে হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে هَمْسًا শব্দটির অর্থ হল চুপিচুপি কথা বলা। সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এ শব্দটির অর্থ হল, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে রসনা নাড়ানো।

خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ

অর্থ হল সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটি হল কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার একটি লক্ষণ। আর همس অর্থ হল পদধ্বনি। অর্থাৎ ঐ কঠিন সংকটময় দিনে মানুষের চলার সময় যে শব্দ হয়, তাছাড়া আর কোন শব্দ শ্রুত হবেনা। আল্লাহ পাকের ভয়ে সেদিন সকলেই থাকবে মুহ্যমান।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا

"সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দান করবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা"।

অর্থাৎ যিনি সুপারিশকারী হবেন, তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্মানিত হবেন এবং কোন গুনাহগারের পক্ষে তার সুপারিশ আল্লাহ পাক পছন্দ করবেন, শুধু এমন ব্যক্তির সুপারিশই সেদিন কাজে আসবে তথা গ্রহণযোগ্য হবে।

কাফেররা মনে করে যে তাদের দেব-দেবী এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। এমনিভাবে ঈসায়ীদেরও এমন ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়েছে। ইসলাম যে সুপারিশের কথা বলে তার পূর্বশর্ত হল আল্লাহ পাকের অনুমতি। আল্লাহ পাক অনুমতি দান করলেই কেউ সুপারিশ করতে পারবে। অর্থাৎ কেউ নিজের ইচ্ছায় সুপারিশ করতে পারবেনা। যাকে আল্লাহ পাক অনুমতি দেবেন শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারবে, দ্বিতীয়তঃ তার সুপারিশ আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হতে হবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে গুনাহগার মোমেনদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে। কেননা, যে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করেছে তথা আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে, তার এ কাজটি আল্লাহ পাক অবশ্যই পছন্দ করেছেন। তবে তার মন্দ কাজের জন্যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ পর্যায়ে তার পক্ষে সুপারিশ উপকারী হবে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

"তাদের অগ্র-পশ্চাতে তিনি সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারবে না"।

অর্থাৎ আখেরাতের বিষয় مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ এবং وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয়। এককথায় মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত সব বিষয়ে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার কালবী (রঃ)। আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ অর্থ হল দুনিয়ার বিষয় এবং মানুষের আমল। আর وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থ হল, আখেরাতের বিষয় এবং মানুষের কৃতকর্মের সওয়াব বা আযাব।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল, আল্লাহ পাক জানেন মানুষের অতীত, ভবিষ্যত আর যা কেয়ামতের দিন হবে সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত।[২]

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

"তারা সেই চিরঞ্জীব, চিরন্তনের সম্মুখে মুখ ঘষতে থাকবে। নিশ্চয় সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে"।

সর্ব শক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে যারা একদিন মাথা নত করতে প্রস্তুত হতোনা, অহংকারের কারণে যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করতো, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাকতো, তারাই কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। কোন বন্দী যেমন বাদশাহর দরবারে হাযির হয় অপমানিত অবস্থায়। পাপীষ্ঠ জালেমদের তখনকার দুর্গতি হবে দেখার মত।

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৫২
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১১৯

"নিশ্চয় সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ظلم অর্থ শেরক। কেননা, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ শেরক হল অত্যন্ত বড় জুলুম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করেছে। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এ পৃথিবীতে যে জুলুম করবে পরকালে সে ধ্বংস হবে। কেননা, প্রত্যেক হক্বদারকে সেদিন আল্লাহ পাক তার হক্ব প্রদান করবেন এমনকি, যে শিং বিশিষ্ট বকরী শিং বিহীন বকরীর প্রতি জুলুম করেছে, আল্লাহ পাক তার থেকেও বদলা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমার ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আমার সম্মুখে কোন জালেমের জুলুমকে অতিক্রম করতে দেবনা। অর্থাৎ জালেমকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! জুলুম থেকে আত্মরক্ষা কর, জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে আসবে। আর যে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করবে কেয়ামতের দিন সে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার ধ্বংস হবে অনিবার্য। কেননা, শেরক হল সবচেয়ে বড় জুলুম। এ পর্যন্ত জালেমদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের নেক আমলের সওয়াব কম করা হবেনা এবং তাদের গুনাহও বৃদ্ধি করা হবেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا

"আর যে ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে অবিচার বা ক্ষতির ভয় তার নেই"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানদার হবে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নেক আমল করবে, তার কোন প্রকার জুলুমের ভয় থাকবেনা। তার কোন হক্ব বিনষ্টের আশংকাও থাকবেনা। কেননা, কেয়ামতের দিন কারো প্রাপ্য হতে তার সওয়াব কম করা হবেনা, কারো প্রতি অবিচার করা হবেনা। মোমেন মাত্রকেই নেক আমলের শুভ পরিণতি বা সওয়াব পুরাপুরি দেয়া হবে, এতটুকু কম করা হবেনা। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মোমেন অবস্থায় যে সঠিক নিয়তে ফরজ ওয়াজিব আদায় করেছে তার জন্যে এ আয়াতে অভয় বাণী রয়েছে যে তার সওয়াব কম করা হবেনা; বরং তারা সাফল্য হবে সুনিশ্চত।

فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا

অর্থাৎ তার গুনাহ বৃদ্ধি করার কোন আশংকা থাকবে না, এমনিভাবে তার কৃত সওয়াব

কম হওয়ার ভয় থাকবেনা। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যাংশের অর্থ হল, যে মোমেন নেক আমল করবে তার সওয়াব কম হওয়ার আশংকা থাকবেনা। আর অন্যের গুনাহর শাস্তি ভোগ করার ভয়ও থাকবেনা।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যাংশের অর্থ হল, যে গুনাহ সে করেনি তার শাস্তির আশংকা থাকবেনা। এমনিভাবে কোন আমলের সওয়াব বিনষ্টের আশংকাও থাকবে না।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

"আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি এবং তাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে করে তারা ভয় করে অথবা তা হয় তাদের জন্যে উপদেশ"।

এভাবেই অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছি এবং কেয়ামত ও পরকালের অবস্থা, নেক আমল ও বদ আমলের পরিণতি যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, ঠিক এমনিভাবে (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি এবং কোরআনে করীমে বিস্তারিতভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, যাতে করে মানুষের পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং তারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে। যদি তারা তাকওয়া পরহেযগারীর সেই উচ্চ মর্তবায় না-ও পৌঁছতে পারে তবে অন্ততঃ কিছু মাত্র উপদেশ তো গ্রহণ করতে পারে। আর এ উপদেশ তাদের হেদায়েতের কারণ হবে। মূলতঃ এ উদ্দেশেই পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ
اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ
لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ
فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

তরজমা

(১১৪) আল্লাহ পাক অতি মহান, তিনিই রাজাধিরাজ, সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। তিনিই ধ্রুব সত্য, (হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের ওহী অবতরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা আয়ত্ব করতে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

(১১৫) আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে যায় এবং আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।

(১১৬) আর স্মরণ কর (সে সময়কে) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো।

(১১৭) এরপর আমি বলেছিলাম, নিশ্চয় (ইবলীস) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, তোমাদেরকে বেহেশত থেকে যেন সে বের করে না দেয়, যদি তা করে তবে তোমরা কষ্টে পড়ে যাবে।

(১১৮) আর জান্নাতে তোমার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হল যে তুমি ক্ষুধার্তও হবেনা, নগ্নও হবেনা।

(১১৯) আর সেখানে তুমি তৃষ্ণার্ত হবেনা, রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবেনা।

(১২০) এরপর শয়তান তাদের অন্তরে প্ররোচনা দেয়, বলে হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরজীবন-বৃক্ষ ও অক্ষয়-রাজ্যের কথা বলে দেব?

(১২১) এরপর তারা উভয়েই ভক্ষন করে, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ পায় এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে থাকে। আর এভাবেই আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো এবং সে পথ হারিয়ে বসলো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমে কাফেরদের শোচনীয় পরিণাম এবং পরে নেককার মোমেনদের পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, মহিমময় আল্লাহ্ পাক, তিনি অতি মহান, সর্বোচ্চ তাঁর মর্যাদা ও শান, তিনিই রাজাধিরাজ, সর্বময় ক্ষমতা ও আধিপত্য শুধু তাঁরই, তিনি ধ্রুব সত্য, আর যেভাবে আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে সর্ব প্রকার শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, ঠিক তেমনি তাঁর কালাম কোরআনে করীমও পবিত্র। কোন মানুষের রচনায় এর কোন দৃষ্টান্ত নেই তথা কোন মানুষ এমন কালাম পেশ করতে পারেনা। যেমন, কেউ আল্লাহ্ পাকের গুণাবলীর সত্যিকার বিবরণ দিতে সক্ষম নয়, ঠিক তেমনি কেউ পবিত্র কোরআনের দৃষ্টান্তও পেশ করতে সক্ষম নয়।

اَلْمَلِكُ

তিনি রাজাধিরাজ, যাঁর ক্ষমতা সর্বকালের, যাঁর আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

اَلْحَقُّ

তিনি ধ্রুব সত্য, যাঁর অস্তিত্ব তথা পবিত্র সত্তা, যাবতীয় গুণাবলী এবং সর্বময় ক্ষমতা তাঁর নিজস্ব, (কারো দান নয়) তাই তাঁর ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার বা বিনষ্ট হওয়ার বা তাতে কোন পরিবর্তন হওয়ার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই। তিনিই ইহকাল পরকালের মালিক, তিনি চিরসত্য, তাঁর প্রতিটি ওয়াদা সত্য, তাঁর প্রতিটি সতর্কবাণী সত্য, তাঁর রসূল সত্য, তাঁর প্রত্যেকটি ফরমান সত্য, জান্নাত ও দোযখ সত্য। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। এ জ্ঞান-গর্ভ মহান গ্রন্থ দ্বারা যেন মানুষ সত্যের সন্ধান পায়, বাতিল ও অসত্য থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।[১]

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাকের ওহী অবতরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা আয়ত্ব করতে তাড়াহুড়ো করবেন না"।

অর্থাৎ যখন ওহী নাজিল হয়, যতক্ষণ তা সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ তা কণ্ঠস্ত করার জন্যে তাড়াহুড়ো করবেন না; বরং প্রথমে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করতে থাকুন। যেমন সূরায়ে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮৯

ক্বেয়ামায় এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"(হে রসূল!) পবিত্র কোরআনকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার জন্যে আপনি রসনাকে সঞ্চালন করবেন না, তা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই"।

আলোচ্য আয়াতে একথাটি এরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত জীবাঈল (আঃ) যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করতেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করে কণ্ঠস্ত করার চেষ্টা করতেন, তাতে তাঁর কষ্ট হতো। কিন্তু এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাঁর এ কষ্ট দূর হল। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন তাঁর অন্তরে সংরক্ষণ করার, স্মরণ করিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন।

তফসীরকার মুজাহেদ ও কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এর অর্থ হল, যে পর্যন্ত পূর্ণ ওহী নাজিল না হয় সে পর্যন্ত পবিত্র কোরআন সাহাবায়ে কেরামকে পাঠ শেখানো বা তাদেরকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করানো শুরু করবেন না; বরং যখন সম্পূর্ণ আয়াত নাজিল হবে তখন তাদেরকে শেখাবেন।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে মুখস্ত করার জন্যে তাড়াহুড়া না করে বরং আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত করুন যেন তিনি আপনার জ্ঞান বাড়িয়ে দেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছেন, আর আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর এন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ওহী নাজিল হতে থাকে।

এবনে মাজা শরীফে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া সংকলিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

"হে আল্লাহ! যে জ্ঞান আমাকে দান করেছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান কর, আর যা আমার জন্যে উপকারী হয় তা আমাকে শেখাও এবং আমার এলম বাড়িয়ে দাও এবং সকল অবস্থায় সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই"।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৮৯

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

"আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে যায় এবং আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আদম (আঃ) ও শয়তানের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যাতে করে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়া কতবড় বিপজ্জনক কাজ। এতদ্ব্যতীত এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যে তোমাদের পিতা-মাতাকে প্রতারণার মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত করেছে, সেই ইবলীস যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।

দ্বিতীয়তঃ যদি কখনও শয়তানের ধোকায় কোন গুনাহ্ হয়ে যায় তবে আদি পিতা আদম (আঃ)-এর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা ও আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। ইবলীস শয়তান যেমন অন্যায় করেও ক্ষমাপ্রার্থী হয়নি; বরং দম্ভ প্রকাশ করেছে; আদম সন্তানের পক্ষে এমন কাজ নিতান্ত গর্হিত এবং অবশ্য বর্জনীয়।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে এলম বৃদ্ধি করার জন্যে দোয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে এলম অর্জনের পাশাপাশি তার উপর আমল করাও জরুরী এবং অহংকার চির বর্জনীয়। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক এলম দান করেছিলেন, আর সে এলমের কারণেই ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্মান সূচক সেজদা দিয়েছে। পক্ষান্তরে, অহংকারের কারণে ইবলীস শয়তান চির অভিশপ্ত হয়েছে।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আদমকে আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার আদেশ ভুলে যায়, শয়তানের দ্বারা সে প্রতারিত হয়েছে, আমার নির্দেশের কথা সে বিস্মৃত করেছে অর্থাৎ আমি আদমকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছেও যেতে নিষেধ করেছি, কিন্তু সে আমার আদেশ ভুলে যায়, ভুলক্রমে সে আমার আদেশ অমান্য করে। নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে দূরে থাকার যে নির্দেশ তার প্রতি হয়েছিল তা সে বিস্মৃত হয়।

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

আর তাকে আমি সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। অর্থাৎ যে কাজটি না করার আদেশ তার প্রতি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৯৩

হয়েছে তা না করার ব্যাপারে তার মধ্যে দৃঢ়তা ছিলনা, যদি কোন কাজের সংকল্প করা হয় তবে সে সংকল্প পূরণে সুদৃঢ় থাকা একান্ত কর্তব্য। আর এ পর্যায়ে যদি কোন বাধা-বিপত্তি আসে বা জটিলতা দেখা দেয় তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে তার মোকাবেলা করা কর্তব্য।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যা করেছেনঃ আমি আদমের অন্তরে নাফরমানী করার সংকল্প দেখতে পাইনি, সে ভুলে গিয়েছিল, তার দ্বারা ভুল হয়েছিল।

কাজী এয়াজ তাঁর শেফা গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক আলোচ্য বাক্যটি এরশাদ করার মাধ্যমে নিজেই হযরত আদম (আঃ)-এর ওজর বা কৈফিয়ত বর্ণনা করেছেন। ভুলে যাওয়া যেন আদম (আঃ)-এর মজ্জাগত। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইনসানকে (মানুষকে) ইনসান এজন্যে বলা হয় যে তাকে সর্ব প্রথম যে আদেশ দেয়া হয় তা সে ভুলে যায়। অর্থাৎ نسيان বা ভুলে যাওয়া আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হিজর এবং সূরায়ে কাহফে ইবলীস শয়তানের আদম (আঃ)-কে সেজদা না করার ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আদম (আঃ) যে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ভুলে গেছেন তার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হবে সকলে বের হয়ে পড়ে। অন্য হাদীসে রয়েছে, তারা ছিল পিপীলিকার ন্যায়, প্রত্যেকের নয়ন যুগলের মধ্যখানে আল্লাহ্ পাক একটি নূর সৃষ্টি করেন, এরপর সকলকে আদম (আঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করেন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার প্রতিপালক! এদের কী পরিচয়, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, এরা তোমার বংশধর। আদম (আঃ) তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার দু' চোখেই জ্যোতি রয়েছে, যা তাঁর কাছে বড় আকর্ষণীয় মনে হয়। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইনি কে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, দাউদ। আদম (আঃ) আবজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তার কত বয়স নিদৃষ্ট হয়েছে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, ষাট বছর। আদম (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বয়স থেকে চল্লিশটি বছর তার হায়াত বাড়িয়ে দিন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন আদম (আঃ)-এর বয়স শেষ হল আর সেই চল্লিশ বছর শুধু রয়ে গেছে যা তিনি দাউদ (আঃ)-কে দিয়েছিলেন তখন যমদূত আজরাঈল (আঃ) আসলেন। আদম (আঃ) বললেন, আমার বয়সের চল্লিশ বছর কি বাকী রয়নি? ফেরেশতা বললেন, আপনি ঐ চল্লিশ বছর আপনার পুত্র দাউদকে কি দেননি? তখন আদম (আঃ) অস্বীকার করলেন, আর এ কারণে তাঁর বংশধররাও অস্বীকার করে। হযরত আদম (আঃ) ভুলে গেলেন এবং তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, এ কারণেই তাঁর বংশধররাও

ভুলে যায়। হযরত আদম (আঃ)-এর ভুল হয়েছে তাই আদম সন্তানদের ভুল হয়।[১]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى

"আর (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের দ্বারা যে সেজদা করার কথা বলা হয়েছে তা হল সম্মান সূচক সেজদা। কেননা এবাদতের সেজদা বা এবাদত শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই, আর কারো জন্যে নয়। সম্মান সূচক সেজদা পূর্বকালের শরীয়ত সমূহে বৈধ ছিল। খাতেমুল আম্বিয়া হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তা বাতিল হয়েছে।[২]

সমস্ত ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে সম্মান সূচক সেজদা দিলেও ইবলীস তাতে অস্বীকৃতি জানায়।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ

তখন আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয় ইবলীস তোমার এবং তোমার স্ত্রীর দুশমন। তার হিংসা এবং শত্রুতা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ অতএব, তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করার চক্রান্তে সফল না হয়, তার কথা মানলে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হতে হবে, যদি তার ওয়াসওয়াসা বা প্রতারণায় তোমরা বিশ্বাস কর তবে সে তোমাদের জান্নাত থেকে বহিস্কারের কারণ হবে, আর এমন অবস্থায় তুমি চরম কষ্টের মধ্যে পড়বে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তোমাদেরকে রুজি-রোজগারের অন্বেষণ করতে হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) সাঈদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে লিখেছেন, হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যে একটি লাল গরু সৃষ্টি করা হয় যা দ্বারা তিনি জমিনে কৃষি কাজ করতেন এবং তাঁর কপালের ঘাম মুছতেন। এ অবস্থাকেই فَتَشْقٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى

আর জান্নাতে তোমার জন্যে এ ব্যবস্থা হল যে তুমি ক্ষুধার্তও হবেনা এবং নগ্নও হবে না। আর সেখানে তুমি তৃষ্ণার্ত হবেনা, রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবেনা।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বেহেশতে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-কে সর্ব প্রকার সুখ সামগ্রী দান করেছেন। তাঁর পানাহারের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন,

---

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২৯
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৯৪

ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলনা, পোশাক-পরিচ্ছেদের অভাব হতোনা, পিপাসাগ্রস্ত হওয়ার বা রৌদ্রক্লিষ্ট হওয়ার কোন আশংকা ছিলনা, আরাম-আয়েশের যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল জান্নাতে।

কিন্তু যদি ইবলীস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হও তবে এই সমস্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রতি শত্রুতা করছিল। প্রশ্ন হল কি কারণে এ শত্রুতা? এর জবাবে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু ইবলীস লক্ষ্য করছিল যে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, তাই সে আদম (আঃ)-কে হিংসা করলো, আর এ হিংসাই তার শত্রুতার কারণ।[১]

শয়তানের প্ররোচনা

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ

"এরপর শয়তান তাদের অন্তরে প্ররোচনা দেয়। বলে, হে আদম! আমি কি তোমাকে চির জীবন-বৃক্ষ ও অক্ষয়-রাজ্যের কথা বলে দেব"?

শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দেয়, তাঁর জন্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতে। আল্লাহর প্রেমিক হযরত আদম (আঃ)-কে বন্ধুবেশী ইবলীস শয়তান প্রতারণা করে। সে বলে, হে আদম! আমি কি তোমাকে চির জীবন-বৃক্ষ এবং অবিনশ্বর রাজত্বের পথ নির্দেশ করবো? অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল যদি তোমরা ভক্ষণ কর তবে এ জান্নাতে তোমরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে পারবে, আল্লাহ পাকের চির সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ হবে, তোমাদের সুখের জীবনের অবসান ঘটবেনা কখনও। এভাবে ইবলীস শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে অনুপ্রাণিত করে।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ

এরপর তারা উভয়েই ভক্ষণ করে, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ পায় এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে থাকে। আর এভাবেই আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো এবং সে পথ হারিয়ে বসলো।

শয়তানের ধোকায় পড়ে হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিহিত জান্নাতী পোশাক আপনা আপনি সরে গেল। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হল। লজ্জার কারণে এদিক সেদিক ছুটোছুটি

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১২৪

করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম! আমার নিকট থেকে পলায়ন করছো? আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করে আদবের সাথে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! লজ্জা ও অনুতাপের কারণে আত্মগোপন করছি। তখন তিনি আরজ করলেন, তওবা করার পর কি আমি জান্নাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি? উত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। একথাকেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন এভাবেঃ

فَتَلَقّٰىٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"এরপর আদম তার প্রতিপালক থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, পরে তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

আল্লাহ্ পাক হযরত আদমের (আঃ) তওবা কবুল করলেন

এভাবে হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে আলোচনা হয়। মূসা (আঃ) বললেন, আপনার একটি ভুলের কারণে সমগ্র মানব জাতিকে জান্নাত থেকে বের হতে হল এবং কষ্টে পড়তে হল। হযরত আদম (আঃ) জবাবে বললেন, হে মূসা! আপনাকে আল্লাহ্ পাক রসূল মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে কথা বলে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, আপনি এমন বিষয়ে কথা বলছেন, যা আল্লাহ্ পাক আমার সৃষ্টির পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন। এভাবে হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে লা-জবাব করে দিয়েছিলেন।

عَصٰىٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

"(অর্থাৎ) আদম তার প্রতিপালকের কথা অমান্য করলো এবং পথভ্রষ্ট হল"।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে চিরদিন বেহেশতে থাকার আকাংক্ষা করলেন, অথচ এ কাজটিই বেহেশত থেকে বের হওয়ার কারণ হল। অথবা এর কারণ হল, তাঁকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা তিনি অমান্য করে সঠিক পথ থেকে সরে পড়লেন।

এবনে আরবী (রঃ) غوى শব্দটির অর্থ লিখেছেন যে, তাঁর আরামের জীবন বিদায় নিল, সম্মানের স্থলে অবমাননা, সুখের স্থলে দুঃখের দিকে তিনি চলে গেলেন।

এবনে কুতায়বিয়া বলেছেন, এর অর্থ হল আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের আদেশের বরখেলাফ করলেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আদম (আঃ)-কে নাফরমান বলা যাবেনা। কেননা, নাফরমান শুধু তাকে বলা যায় যে নাফরমানীতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যে একবার কোন আদেশ অমান্য করে তাকে নাফরমান বলা যায়না। যেমন, কেউ যদি একবার জীবনে কাপড় সেলাই করে তাকে দর্জি বলা হয়না; বরং যে সর্বদা একাজ করে তাকে দর্জি বলা হয়। তাই হযরত আদম (আঃ)-কে عاصى বা নাফরমান বলা যায় না।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য তাদের সামান্য ত্রুটিও

মহা অপরাধ মনে করা হয়। তাই সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্যে হয়তো সাধারণ মানুষের শাস্তি হবেনা; কিন্তু যারা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বন্দা এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য তাদের সামান্য ভুল-ভ্রান্তিও অপরাধ বিবেচিত হওয়ার কারণেই হযরত আদম (আঃ)-এর এ ত্রুটিকেই পথভ্রষ্টতা বা অবাধ্যতা বলা হয়েছে। কেননা, এমন ত্রুটির কারণে ক্বলবের মধ্যে এক প্রকার ময়লা এসে পড়ে যা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার অন্তরেও ময়লা আসে আর আমি প্রতিদিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে একশত বার ক্ষমাপ্রার্থী হই (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, নেসায়ী)।[১]

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا
مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

তরজমা

(১২২) এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ প্রদর্শন করলেন।

(১২৩) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু থাকবে, এরপর তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে যদি হেদায়েত আসে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপদগামী হবেনা এবং কষ্টেও পড়বে না।

(১২৪) আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত, আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো।

(১২৫) সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধ করে উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুস্মান।

(১২৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াত সমূহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৯০
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৪-৮

এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক অনুরূপভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে হযরত আদম (আঃ) ইবলীসের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আল্লাহ পাকের একটি আদেশ অমান্য করেছেন। কেননা ইবলীস আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা শপথ করে হযরত আদম (আঃ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে অনুপ্রাণিত করেছিল, হযরত আদম (আঃ) তাঁর সরলতার কারণে তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর দ্বারা একটি অন্যায় হয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রন্দণরত হলেন। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা করলেন। ফলে আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় হলেন। আর শয়তান হল অভিশপ্ত। হযরত আদম (আঃ)-এর বিনয় এবং কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতাপ তাঁর মর্তবা বৃদ্ধির কারণ হল। আলোচ্য আয়াতে তাঁর মর্তবা বৃদ্ধির কথাই উল্লেখ হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى

"এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করেছেন, তাঁর প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হয়েছেন"।

অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের নিকট তিনি মনোনীত ও পছন্দনীয় হয়েছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর দিকে মনোনিবেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁকে তওবার তৌফিক দান করেছেন, তওবার পথ নির্দেশ করছেন। আর আল্লাহ পাকের তৌফিক ও হেদায়েতেই তিনি মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেছেন।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"হে পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, যদি তুমি মাফ না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব"।

هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ নির্দেশ করেছেন।

বর্ণিত আছে যে হযরত আদম (আঃ) কৃত অন্যায়ের জন্যে বহুদিন পর্যন্ত একাধারে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কান্নাকাটি করেছেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেছেন।

একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সারা পৃথিবীবাসীর কান্নাকাটি একত্রিত করা হয় আর দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটিও একত্রিত করা হয় তবে দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটি অধিকতর হবে। যদি দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটি সহ একত্রিত হয় তবে নূহ (আঃ)-এর কান্নাকাটি অধিকতর হবে। কেননা, নূহ (আঃ)-এর কান্নাকাটির কারণেই তাঁর এ নামকরণ করা হয়েছে। যদি হযরত নূহ (আঃ) ও দাউদ (আঃ) এক কথায় সারা পৃথিবীর কান্নাকাটি একত্রিত করা হয় তবে আদম

(আঃ)-এর কান্নাকাটির কাছেও যেতে পারবে না, যা তিনি তাঁর গুনাহ্ মাফ করার জন্যে কেঁদেছিলেন।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বাহ্ লিখেছেন, যখন হযরত আদম (আঃ)-এর কান্নাকাটি অনেক বেশী হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে তুমি এ দোয়াটি পাঠ করঃ

لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفرلى إنك خير الغافرين

তখন আদম (আঃ) এ দোয়া পাঠ করলেন। এরপর পুনরায় বললেন, বলঃ

لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمنى إنك أنت ارحم الرحمين

এরপর এরশাদ করলেন, তুমি বলঃ

لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا....إنك أنت التواب الرحيم

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে এ দোয়াগুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন।

اِجْتَبٰهُ। মনোনীত করা, নৈকট্য-ধন্য করা। فَتَابَ عَلَيْهِ আল্লাহ্ পাক রহমত ও মাগফেরাত দান করেছেন, তাঁর তওবা কবুল করেছেন। هَدٰى তাঁকে হেদায়েতের পথ-নির্দেশ করেছেন। কেননা আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত ও তৌফিকেই তিনি মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেছেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, "তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু থাকবে"।

অর্থাৎ তোমরা উভয়ে (আদম ও হাওয়া) জান্নাত থেকে নীচে নেমে যাও, আর এ অবস্থায় যাও যে তোমরা একে অন্যের দুশমন হবে। হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বংশধরদের অবতরণের আদেশও হয়েছে। جَمِيْعًا শব্দটি এ মর্মই প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা হবে একে অন্যের শত্রু। অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত আচরণে তারা একে অন্যের সহযোগিতা করেছিলেন। তার পরিণামে পৃথিবীতে তাদের বংশধরদের মধ্যে পরস্পরের অসহযোগিতা শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। এ অর্থ তখন হবে যখন اهْبِطَا। শব্দটির সম্বোধন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর উদ্দেশে মনে করা হয়। কিন্তু যদি এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য আদম ও ইবলীসকে মনে করা হয় তখন এর অর্থ হবে, আদম সন্তান এবং ইবলীসের বংশধরদের মধ্যে সর্বদা শত্রুতা থাকবে। কেননা, ইবলীস শয়তান মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকবে, তার সর্বশক্তি

নিয়োগ করবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হল ইবলীসের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা।

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

"এরপর তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে যদি হেদায়েত আসে, যে আমার হেদায়েত মেনে চলবে সে বিপদগামী হবেনা এবং কষ্টেও পড়বে না"।

চির সাফল্য লাভের পন্থা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন পাঠ করবে আর যে মহান শিক্ষা পবিত্র কোরআনে রয়েছে, তার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে গোমরাহী থেকে রক্ষা করবেন এবং আখেরাতে সফলকাম করবেন। বস্তুতঃ এটিই হল চির সাফল্য-লাভের পন্থা। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।

মানব জাতির জন্যে সান্ত্বনা

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে রয়েছে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যে সান্ত্বনা। হযরত আদম (আঃ)-এর দ্বারা যে ভুল হয়েছে তা আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁর তওবা কবুল করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এরপর আলোচ্য আয়াতে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর বংশধর সমগ্র মানব জাতির জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সান্ত্বনা এ মর্মে যে যদিও আপাততঃ বেহেশত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে অবতরণের আদেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাতে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই, মানব জাতির চির শান্তি চির মুক্তি লাভের জন্যে আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণকে পেরণ করবেন এবং নাজিল করবেন আসমানী কিতাব সমূহ, যারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের হেদায়েত মেনে চলবে তারা পথভ্রষ্ট হবেনা এবং বিপদগ্রস্তও হবেনা। আলোচ্য আয়াতে যে হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে, এ কর্মসূচী অনুযায়ীই লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন। সর্ব প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী ও রসূল হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে নবী, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের হেদায়েতের জন্যেই তিনি প্রেরিত, যে কেউ তাঁর অনুসরণ করবে, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ঈমান ও আকীদা সহ তাঁর অনুসারী হবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসা হেদায়েত মেনে চললে দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছেঃ

১. فَلَا يَضِلُّ অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েত মেনে চলবে সে পথভ্রষ্ট হবেনা। সে সরল সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

২. وَلَا يَشْقٰى সে কষ্টেও পড়বে না। কেননা, যে সঠিক পথে থাকবে তার কষ্টে পড়ার প্রশ্নই ওঠেনা, দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছে রহমতুল্লিল আলামীন রূপে তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে তিনি রহমত স্বরূপ আগমন করেছেন, তিনি হলেন রহমত ও বরকতের প্রতীক, তিনি হলেন জীবন্ত শান্তি ও রহমতের নিদর্শন। যে তাঁর অনুসরণ করবে তার জন্যেই রয়েছে শান্তি। এখান থেকেই এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে আজকের বিশ্বে যে অশান্তি বিরাজমান তার মূল কারণই হল, আজকের বিশ্ববাসী আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে রয়েছে তাদের অনাগ্রহ। আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতির চির শান্তি ও চির নাজাতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত মেনে চলবে না তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

"আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, যারা দুনিয়ার মায়ায় মোহে মুগ্ধ মত্ত থাকার কারণে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ, সংকটময়, সংকীর্ণ। যত সুখ সামগ্রী যত বিশাল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা হোক না কেন তারা মনের শান্তি থেকে থাকবে বঞ্চিত। স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদে বাস করা যায়, আরাম কেদারায় আরাম করা যায় কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমত না হলে শান্তি পাওয়া যায় না। কেননা সুখ শান্তি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত লাভ করা সম্ভবই নয়। মানুষ যখন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, তাঁর বিধান মেনে চলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে, তখন তার অন্তরে ভরসা সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা ও নির্ভরশীলতাই হল শান্তি ও তৃপ্তির মূল উৎস। কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, যারা আল্লাহ পাককে ভুলে থাকে তারা শান্তি ও তৃপ্তির এই মূল উৎসের সন্ধানও পায়না। যত সম্পদ এবং যত শক্তিই তারা অর্জন করুক না কেন, তাদের ক্ষুধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্জিত সম্পদের হেফাজতের চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম হয়। আরও সম্পদ উপার্জনের অস্থিরতায় দিন অতিবাহিত হয়। কখনও এমন অবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে কেড়ে নেয়, ফলে তার যথা-সর্বস্ব এখানেই পড়ে থাকে, তার কপালে কখনও শান্তি জোটেনা। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর বিধান মেনে চলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয় তারা সম্পদে বা দৈন্যে কোন অবস্থাতেই অশান্তি বোধ করেনা। সকল অবস্থায় শান্তি ও তৃপ্তি হয় তাদের নিত্য সঙ্গী। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"মনে রেখ! আল্লাহর জিকরের মাধ্যমেই মানব মন লাভ করে শান্তি"।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ

যে আল্লাহর জিকর থেকে বিমুখ হবে তথা আল্লাহকে ভুলে যাবে, তার বিধানকে অমান্য করবে তার জীবন হবে সংকুচিত, দুর্বিষহ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ও আল্লামা সয়ূতী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এতে কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে। কেননা, কাফেরদের কবর হবে অত্যন্ত সংকুচিত, যাদের রিযক হারাম, যাদের আমল মন্দ তাদের কবর হবে সংকুচিত, সংকীর্ণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কবরের দু'দিকের মাটি যখন তাদেরকে চাপ দেবে; তাদের ডান দিকের হাড় তখন বাঁ দিকে, বাঁ দিকের হাড় ডান দিকে চলে যাবে, এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

"কবর হল বেহেশতের বাগানগুলোর একটি বাগান অথবা দোযখের গর্তগুলোর একটি গর্ত"।

যে মোমেন নেককার হবে, তার কবর বেহেশতের বাগান হবে, আর যে কাফের তার কবর হবে দোযখের গর্ত।[১]

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) লিখেছেন, আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ এবনে মানসুর, এবনে জরীর, এবনে মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া এবং হাকেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে আলোচ্য আয়াতের مَعِيشَةً ضَنكًا দ্বারা কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তাদের জীবন দুর্বিষহ হবে এজন্যে যে আল্লাহ পাক ৯৯টি বিষধর সর্প তাদের উপর মোতায়েন করবেন যারা তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। আর মোমেনদের জন্যে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা থাকবে বেহেশতের বাগানে।[২]

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, مَعِيشَةً ضَنكًا বাক্য দ্বারা দোযখের আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল হারাম রিযক, অর্থাৎ যারা হারাম পন্থায় উপার্জন করে তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ।

আর তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, যারা অপবিত্র পন্থায় আয় রোজগার করে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৯১
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩৫

তাদের পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে যারা হারাম পন্থায় রোজগার করে, যারা হতভাগ্য, যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, বন্দাকে যে সম্পদ দেয়া হয় তা কম হোক বা বেশী যদি তাতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন না করা হয় অর্থাৎ যদি তা সঠিক পথে অর্জন না করা হয় তবে এমন সম্পদে কোন কল্যাণ নেই। আর এ অকল্যাণের কথাই مَعِيشَةً ضَنكًا শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর তাৎপর্য হল যারা হারাম পন্থায় অর্থ-সম্পদ রোজগার করে তারা কখনও অল্পে তুষ্ট হয়না, সর্বক্ষণ অর্থ বৃদ্ধির চিন্তায় মগ্ন থাকে।

পক্ষান্তরে, প্রকৃত মোমেন আখেরাতের সাফল্যের অন্বেষণকারী হয়। আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে যা কিছু দান করেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হয়। সে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখে এজন্যে সে জীবনে সুখ এবং শান্তি লাভ করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সে সব লোকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তারা কাফের হোক অথবা মোমেন সকলের জীবনই হবে দুর্বিষহ।

যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তিও আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তথা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে তবে তার জীবন হবে দুর্বিষহ এবং সংকীর্ণ।

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"আর কেয়ামতের দিন তাকে আমি অন্ধ করে উঠাবো"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ অন্ধত্ব হবে প্রকাশ্য চর্ম-চক্ষুর। আর হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, শুধু চর্ম-চক্ষু নয়; বরং তাদের মনের চক্ষুও অন্ধ থাকবে।

অর্থাৎ সে নিজের আত্মরক্ষা করার স্বপক্ষে পেশ করার মত কোন যুক্তি প্রমাণ খুঁজে পাবে না।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

"তখন সে আরজ করবে, হে পরওয়ারদেরগার! আমাকে অন্ধ করে কেন হাযির করেছ, অথচ আমি ছিলাম চক্ষুস্মান"।

তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাকে জবাব দেয়া হবেঃ

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

"এভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াত সমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক অনুরূপভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে"।

অর্থাৎ দুনিয়াতেও তোমার চোখ থাকতে তুমি অন্ধ হয়েছিলে, আমার আয়াত সমূহের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করোনি, বারে বারে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্বেও তুমি ভ্রুক্ষেপ করোনি। যেভাবে দুনিয়াতে তুমি আমার বিধান সমূহ ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনি আজ দোযখে নিক্ষেপ করে তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে, বিস্মৃতির অতল তলে তোমাকে ফেলে দেয়া হবে। দুনিয়াতে যেমন তুমি আমাকে স্মরণ করোনি আজ আমার দয়ামায়া, রহমত ও করুণা তোমাকে স্মরণ করবে না। এটি হল দুনিয়াতে তোমার আমাকে ভুলে থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বর্তমান অন্ধত্ব তোমার দুনিয়ার জীবনের অন্ধত্বের অনিবার্য পরিণতি। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا

"আজকের দিন আমি তাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তারা এদিনের উপস্থিতিকে ভুলে গিয়েছিল"।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াত সমূহে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেসব লোকদের উদ্দেশে যারা এ জীবনে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করা সত্বেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর বিধান অমান্য করে এবং তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়। দুনিয়াতে তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ, অশান্ত, অতৃপ্ত। আর 'আলমে বরযখ' বা মধ্যলোকে তাদের জীবন হবে সংকীর্ণ এবং তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। আর আখেরাতে তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে। শুধু তাই নয়; বরং তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করে ঘোষণা করা হবেঃ যেভাবে তোমরা দুনিয়াতে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও ভুলে যাওয়া হবে। ফলে কখনও তারা আর দোযখ থেকে নাজাত পাবে না।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৯১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৯৯

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ
الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿۱۲۸﴾
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾
فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿۱۳۱﴾

তরজমা

(১২৭) আর এভাবেই আমি প্রতিফল দেব তাকে, যে সীমা লংঘন করেছে এবং যে তার প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করেনা। আর আখেরাতের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী।

(১২৮) এতেও কি তাদের জ্ঞান উদয় হয়নি যে তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, এরা তো তাদেরই বাসভূমিতে চলাফেরা করে থাকে, বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

(১২৯) (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের একটি কথা এবং নিদৃষ্ট ওয়াদা না থাকত তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো।

(১৩০) অতএব, তারা যা বলে সে বিষয়ে (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন। আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকের হাম্‌দের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন এবং রাত্রিকালে এবং দিনের প্রান্ত ভাগেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন, হয়তো আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

(১৩১) আর (হে রসূল!) আপনি স্বীয় নয়ন যুগল প্রসারিত করবেন না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে তাদেরকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে দিয়েছি, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্‌কই উত্তম ও স্থায়ী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ লোকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সকল কাফের মুশরেকদের সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারাই সীমা লংঘন করবে তথা যারা শেরক ও কুফরী করবে এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করবে না আল্লাহ্ পাক এভাবেই তাদের শাস্তি বিধান করে থাকেন। অপরাধ অনুপাতেই হয় শাস্তি। আর আখেরাতের শাস্তি হল অত্যন্ত কঠিন ও চিরস্থায়ী। দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর। আর দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি এখানকার শাস্তিও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে, আখেরাত যেমন চিরস্থায়ী সেখানকার শাস্তিও চিরস্থায়ী।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ

"এতেও কি তাদের জ্ঞানের উদয় হয়নি যে তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি"?

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের অপকর্মের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল থাকে। আলোচ্য আয়াতে কাফের-মুশরেক, বেদ্বীন এবং আল্লাহ পাককে বিস্মৃতকারী লোকদের উদ্দেশে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ মর্মে যে, আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে তারা যদি বিশ্বাস না-ও করে তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতীতে যে সব জাতি আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছে তাদের সে সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও কি বর্তমান কাফেরদের চোখ খুলবার জন্যে যথেষ্ট হয়না? যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে শক্তিশালী ছিল অথচ আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের সেই ভয়াবহ পরিণতির জীবন্ত ইতিহাস কি মক্কাবাসীর হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট হয়না? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

এ বিষয়ও কি তাদেরকে হেদায়েত করেনা? যে আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাস-ভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। মক্কার কোরায়েশরা যখন ব্যবসার জন্যে সিরিয়া গমন করতো তখন তারা আদ, সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেত। ঐ ধ্বংসাবশেষ সামুদ ও আদ জাতির শোচনীয় পরিণামের জীবন্ত স্বাক্ষর হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপই তারা ধ্বংস হয়েছে। এতেও কি বর্তমান কাফের মুশরেকরা সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা? বস্তুতঃ বিবেকবান লোকদের জন্যে এসব ঘটনায় অনেক উপদেশ রয়েছে। মানুষের বিবেক বুদ্ধি মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, সত্য পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যের পরিণাম দেখে মানুষ নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করে। মক্কাবাসী কি পূর্বকালের কাফেরদের ধ্বংসাবশেষ দেখেও নিজেদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করবে না?

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى

"(হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে একটি কথা পূর্বেই সিদ্ধান্ত না হতো, আর কাফেরদের আযাবের জন্যে একটি সময় নিদৃষ্ট না হতো তবে এ জীবনেই তাদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো"।

অর্থাৎ যেহেতু ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাফেরদের শাস্তি কেয়ামতে হবে দুনিয়াতে নয়, তাই তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে এমন শাস্তি হবেনা যা তাদের মূলোৎপাটন করে দেয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এজন্যে তাঁর উম্মতের কাফেরদেরকে দুনিয়াতে আযাব দেয়া হয়না। যদি এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই আল্লাহ পাক গ্রহণ না করতেন, তবে অন্য উম্মতের কাফেরদের ন্যায় এ উম্মতের কাফেরদেরকেও চিরতরে ধ্বংস করা হতো। এমনকি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা কারণে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যে পর্যন্ত আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন, আর যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে সে পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে শাস্তি দেবেন না। পূর্বকালের পয়গম্বরগণের উম্মতদের ন্যায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ পাকের এ সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই রয়েছে। আর এ কারণেই আপাততঃ কাফেররা মুসলমানদের প্রতি চরম নির্যাতন করা সত্বেও তাদের প্রতি আযাব মূলতবী রয়েছে। তবে আখেরাতে তাদের আযাব অবধারিত রয়েছে।

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে আরও বলেছেনঃ

غلبت رحمتی علی غضبی

অর্থাৎ আল্লাহর গজব এবং আক্রোশের তুলনায় তাঁর রহমত ও দয়া প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণেই তিনি পাপীষ্ঠদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেননা; বরং তাদেরকে আত্মসংশোধনের এবং আত্মরক্ষার যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে থাকেন, যে নিজের দৌরাত্মের দ্বারা সেই অবকাশ বিনষ্ট না করে সে পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন না। যদি এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই না হতো তবে একদিকে তারা পাপাচারে লিপ্ত হতো অন্যদিকে তাদেরকে পাকড়াও করা হতো।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

“অতএব, (হে রসূল!) তারা যা বলে আপনি তাতে সবর অবলম্বন করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন”।

অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে কাফেরদের প্রতি শাস্তি আপতিত না হওয়ার কারণে (হে রসূল!) আপনি মণক্ষুণ্ন হবেন না। তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আযাব অবশ্যই হবে। তাদের শাস্তি না হওয়ার কারণে দূরাত্মা কাফেররা আপনাকে যে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলে তা আপনি সহ্য করুন, ধৈর্য ধারণ করুন। সবর অবলম্বনের মাধ্যমেই তাদের এ অন্যায়ের মোকাবেলা করুন, আর তাদের শোচনীয় পরিণামের অপেক্ষা করুন।

سَبِّحْ

অর্থাৎ সবরের পাশাপাশি আরেকটি কর্মসূচি হল সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় তথা সকাল ও বিকালে আল্লাহ পাকের হাম্‌দের তসবীহ পাঠ করুন। কাফেররা কি বললো, সেদিকে কর্ণপাত না করে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে ও মহিমা বর্ণনায় ব্যস্ত থাকুন। কেননা, সবর ও নামাজ এ দুটি কর্মসূচির মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করা যায়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা ফজর ও আসরের নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দু' সময়ে অবশ্যই আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকুন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, سَبِّحْ শব্দটির সাথে بِحَمْدِ رَبِّكَ যুক্ত হওয়ার কারণে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থ হল নামাজ আদায় কর তোমার প্রতিপালকের হাম্‌দের সাথে। অর্থাৎ নামাজ আদায় কর সূরা ফাতেহার সাথে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এবং মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ নেই।

وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামাজ। لَيْل অর্থ রাত। তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হবে রাতের প্রথম অংশ। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা তাহাজ্জদের নামাজ উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

এর দ্বারা জোহরের নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, এটি দিনের প্রথমার্ধের শেষ প্রান্ত।

لَعَلَّكَ تَرْضَى

(হে রসূল!) যদি উপরোল্লিখিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করেন তবে আপনি দুনিয়া

আখেরাত উভয় জাহানে সন্তুষ্ট হবেন।

অর্থাৎ এর দ্বারা এত সওয়াব পাওয়া যাবে এবং এর শুভ পরিণতি এত বেশী হবে যে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। অথবা এর অর্থ হল, যদি এ কর্মসূচী গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে লাভ করবেন। আখেরাতে যখন আল্লাহ পাক আপনার শাফাআত কবুল করবেন তখন আপনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। আর একথাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

"অদূর ভবিষ্যতে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হবেন"।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ হযরত জরীর এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে দেখে বলেছেন, যেভাবে তোমরা চন্দ্রকে দেখছ, ঠিক এমনিভাবেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে। অতএব, সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (তথা ফজর ও আসরের) নামাজ যেন কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট না হয় এ বিষয়ে সতর্ক থাক।[১]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর (হে রসূল!) আপনি স্বীয় নয়ন যুগল প্রসারিত করবেন না ঐ ধন-সম্পদের প্রতি, যা আমি কাফেরদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। তাদেরকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যেই এসব দিয়েছি, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযকই উত্তম ও স্থায়ী।

শানে নজুল

এবনে আবি শায়বা, এবনে মরদবিয়া, বাজ্জার এবং আবু ইয়ালা হযরত আবু রাফে (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন মেহমান আসলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে আটা বাকিতে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন এবং এরশাদ করলেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত (এর মূল্য বাকি থাকবে)। ইহুদী বললো, কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেবনা। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ইহুদীর কথা আরজ করলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি সে আমার নিকট এভাবে আটা বিক্রয় করতো তবে আমি তার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতাম, নিঃসন্দেহে আমি

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৪২

আসমানেও আমানতদার জমিনেও আমানতদার। যাও, আমার লৌহ-বর্মটি তার নিকট নিয়ে যাও। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ

(হে নবী!) আমি কাফেরদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার যে সম্পদ ও জৌলুস দান করেছি তার প্রতি আপনি দৃষ্টিপাতও করবেন না, তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশেই ধন-সম্পদ দান করেছি, কে এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর কে অকৃতজ্ঞ হয় তার পরীক্ষাই হচ্ছে এরা দ্বারা। (হে নবী!) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ ধন-সম্পদের আদৌ কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই। নিঃসন্দেহে এটি ক্ষণিকের বসন্ত মাত্র। দু'দিনের এ জীবনের যখন অবসান ঘটবে তখন তারা কঠিন বাস্তব জীবনের অবস্থা টের পাবে। তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আল্লাহ পাক আপনাকে পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ দান করেছেন, তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতে ভূষিত করেছেন। আসাধারণ সুনাম সুখ্যাতি এবং বিজয় গৌরব দান করেছেন। এর মোকাবেলায় কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের কোন গুরুত্বই নেই, তাদের এসব ধন-সম্পদ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আর আপনাকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী। অতএব, তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দেয়া হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, আর তারা যে অন্যায় আচরণ করে তার কারণে মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিয্ক উত্তম ও চিরস্থায়ী, আপনাকে প্রদত্ত নেয়ামত অতুলনীয় এবং চিরস্থায়ী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে মোমেনদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে যে সান্ত্বনা দিয়েছেন যদি কারো অন্তরে এর দ্বারা সান্ত্বনা না আসে তবে দুনিযার লোভে এবং তা না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে এবং ঈমান, হেদায়েত, জান্নাতকে নেয়ামত মনে না করে তবে তার নেক আমল কমে যায় এবং আযাব নিকটবর্তী হয়।

এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে তবে কি দুনিয়ার ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজনই নেই বা ইসলামের দৃষ্টিতে এর কোন গুরুত্বই নেই? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। জীবন ধারণের জন্যে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অর্থ-সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়; বরং উপলক্ষ্য মাত্র। পথিক মাত্রকে পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়, আর তা সযত্নে সংরক্ষণও করতে হয়। তাই বলে কোন পথিকের পাথেয় সংগ্রহ করাই তার পথ চলার উদ্দেশ্য হতে পারেনি কখনও।

যুক্তি ও বুদ্ধিকে যারা বিদায় দিয়েছে চিরতরে, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে যারা আচ্ছন্ন হয়েছে, শুধু এমন লোকই পথিক মুসাফিরের সঞ্চিত পাথেয়কে তার ভ্রমণের

উদ্দেশ্য বলে মনে করতে পারে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

"যে পরিমাণ তুমি দুনিয়াতে অবস্থান করবে সে পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ আহরণ কর, আর যতদিন তুমি আখেরাতে থাকবে ততদিনের জন্যে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ কর"।

অর্থাৎ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, তাই সে হিসাবেই দুনিয়ার সম্পদ সংগ্রহ কর, আর আখেরাত চিরস্থায়ী, অতএব এ সত্য মনে রেখে আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। মওলানা রুমী (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেনঃ

آب درکشتی هلاك کشتی است * اب اند زیر کشتی پستی است

"নৌকার জন্য পানি একান্ত জরুরী, পানি বিনা নৌকা চলেনা, অথচ এই পানি যদি নৌকার ভেতর প্রবেশ করে তবে সে নৌকার ধ্বংস অনিবার্য"।

জীবন ধারণের জন্যে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য কিন্তু অর্থ-সম্পদের লোভ যদি কারো মনের গহনে প্রবেশ করে তবে তার ধ্বংস ডেকে আনে। কেননা, সে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে যায়, দুনিয়ার জীবন নিয়ে মুগ্ধ মত্ত হয়, দুনিয়াতে ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের অধিকারী হয় আর আখেরাতে হয় নিঃস্ব। এজন্যে আলামা ইকবাল বলেছেনঃ

کافر کی یه پہچان که افاق میں گم هے * مومن کی یه پہچان که گم
هیں اس میں آفاق

"কাফেরের পরিচয় হল এই যে, সে দুনিয়াতেই হারিয়ে যায়, আর মোমেনের পরিচয় হল এই যে, দুনিয়া হারিয়ে যায় তারই মাঝে"।

অতএব, প্রয়োজন মোতাবেক অর্থ-সম্পদ আহরণ করা বা জীবিকা উপার্জন করা প্রতিটি মানুষের একান্ত করণীয় কাজ। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"যখন নামাজ সুসম্পন্ন হয় তখন তোমরা ছড়িয়ে পড় পৃথিবীতে এবং আল্লাহর দানের (জীবিকার) অন্বেষণ কর"।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হালাল জীবিকা উপার্জন অন্যতম ফরজ। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, উপার্জন সচেষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, "ফজরের নামাজের পর জীবিকা অন্বেষণের সময় তোমরা ঘুমিয়ে পড়োনা"।

কিন্তু সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহ পাককে ভুলে যাওয়া অনুচিত।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا
نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا
لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ
الْأُولٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِن قَبْلِ
أَن نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

তরজমা

(১৩২) আর (হে রসূল!) আপনার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ প্রদান করুন, আর নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন, আমি আপনার নিকট রিয্ক চাইনা, আমিই আপনাকে রিয্ক দিয়ে থাকি, আর শুভ পরিণাম শুধু পরহেযগারদের জন্যেই।

(১৩৩) আর তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আনেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ? যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে।

(১৩৪) আর যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে আযাব দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল কেন প্রেরণ করলে না? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত হবার পূর্বেই তোমার নির্দেশ সমূহ মেনে চলতাম।

(১৩৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অচিরেই জানতে পারবে কারা সরল পথে রয়েছে এবং কারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরপর তিনটি আদেশ দেয়া হয়েছেঃ

(১) কাফেররা যে সব অন্যায় কথা-বার্তা বলে তা সহ্য করুন।

(২) সকাল বিকাল আল্লাহ পাকের হাম্দের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

(৩) কাফেরদেরকে তাদের পরীক্ষার জন্যে যে ধন-সম্পদ দেয়া হয়েছে সেদিকে চোখ

তুলেও তাকাবেন না। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পথ-নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও নামাজের ব্যাপারে অবিচল থাকুন।

নামাজ আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম

নামাজ হল আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, আর সকল এবাদতের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা, এমনকি মানুষ ও জ্বীন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করা। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

"আর আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন তারা বন্দেগী করে"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এজন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন, সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তাকে নামাজের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাজ আদায় না করলে তাকে এজন্যে শাসন কর। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দিন সকালে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং নামাজের তাগিদ করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদত মোবারক ছিল, যখন তিনি তাহাজ্জদের জন্যে উঠতেন তখন তাঁর গৃহের সকল লোককেও এ উদ্দেশে জাগ্রত করতেন। এবনে আবি হাতেমে এ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন বা কোন অসুবিধা দেখা দিত তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দিতেন। সমস্ত নবী রসূলগণেরও এ পন্থা ছিল। তাঁরাও যে কোন বিপদাপদে নামাজে মনোনিবেশ করতেন। তিরমিযী ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত কর, আমি তোমার মনকে পরিপূর্ণ করে দেব, তোমার সকল প্রয়োজনের আয়োজন করবো। পক্ষান্তরে, যদি তুমি তা না কর তবে তোমার অন্তর ঝামেলায় পূর্ণ করে দেব, তোমার অভাব কখনও যাবেনা।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার নিজের সকল চিন্তা একত্রিত করে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন হয়, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়ার পেরেশানী থেকে হেফাজত করেন, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফিকরে মগ্ন হবে সে কোন্ পেরেশানীতে ধ্বংস হবে আল্লাহ পাক আদৌ তার পরোয়া করবেন না।[১]

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৬, পৃষ্ঠা-৯৪

অর্থাৎ (হে রসূল!) এটি আপনার কর্তব্য নয় যে, আমার সৃষ্টির মধ্যে কারো রিয্ক আপনি পৌঁছাবেন বা নিজের জন্যে রিয্ক আহরণে আপনি সচেষ্ট হবেন। আমি আপনাকে এবাদতের এবং এবাদতের জন্যে আহবানের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, যেন আপনি আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, আমিই তাদেরকে ও আপনাকে রিয্ক দিয়ে থাকি। আর মনে রাখবেন শুভ পরিণাম শুধু তাদের জন্যেই নিদৃষ্ট যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়াতে যত মনিব, মালিক বা রাজা বাদশাহ বা ক্ষমতাসীন রয়েছে তারা নিজেদের অধীনস্থদের থেকে অর্থ-সম্পদ আদায় করে। অধীনস্থদের কর্তব্য হয় তাদের অর্থ যোগান দেয়া। কিন্তু নিখিল বিশ্বের মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন কারো কাছে অর্থ-সম্পদ চান না; বরং তিনি নিজেই সৃষ্টি মাত্রের রিয্কের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেককে তার রুজি পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হুকুম হল, তোমরা আমার বন্দেগী কর, যথা নিয়মে নামাজ কায়েম কর, রোযাব্রত পালন কর, আর আমাদের নামাজ রোযায়ও আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা, এতে রয়েছে আমাদেরই মঙ্গল। অতএব, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশে নামাজ কায়েম করা তথা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল হওয়া কল্যাণকামী মানুষেরই কর্তব্য। যারা এ কর্তব্য পালন করবে তাদের জন্যে আল্লাহ পাক রিয্ক আহরণ সহজ করে দেবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাককে ভয় করে, আল্লাহ পাক তার জন্যে পথ বের করে দেন আর তার অচিন্তনীয় স্থান থেকে তিনি তাকে রিয্ক পৌঁছে দেন।

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

যারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাককে ভয় করে চলে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে চলে, শুভ পরিণাম তাদের জন্যে নিদৃষ্ট। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর অনন্ত অসীম নেয়ামত তাদের জন্যে প্রস্তুত।

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

আর তারা বলে, "সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আনেনা? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ? যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে"।

অর্থাৎ কাফেররা বলে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন কেন নিয়ে আসেননি, যা তাঁর নবুওয়্যতের দাবীর সত্যতার দলিল-প্রমাণ হতো। দলিল-প্রমাণ তাদের নিকট অনেকেই এসেছে, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি, সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা, সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল পবিত্র কোরআন তাদের নিকট এসেছে কিন্তু তারা তার সত্যতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই পরবর্তী

বাক্যে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ

اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

"তাদের নিকট কি এমন দলিল আসেনি যার বিবরণ রয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে"।

অর্থাৎ তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিলে যে সব কথা রয়েছে তার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনে। অথচ যিনি এই কোরআন পেশ করছেন তিনি একজন উম্মী ব্যক্তি, তিনি কোন আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেননি। এটি একথারই প্রমাণ যে তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। আর তাঁর নবুওয়্যতের দলিল হল পবিত্র কোরআন। এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হতে পারে। পূর্বকালের উম্মত সমূহ তাদের নবীগণের নিকট তাদের ফরমায়েশী মোজেযা চেয়েছে, কিন্তু যখন তারা অবশেষে ঈমান আনেনি তখন আল্লাহ পাক আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। যদি মক্কার কাফেররাও ফরামায়েশী মোজেযা চায় আর এরপরও তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কে রক্ষা করবে? বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে এমন মোজেযা সমূহ দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকেরা তার নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান আনতে পারে, কিন্তু আমাকে একটি জীবন্ত এবং চিরস্থায়ী মোজেযা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনে করীম যা আমার প্রতি নাজিল হয়েছে। আর আমি আশা করি কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীগণের অনুসারীদের চেয়ে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অধিক হবে।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে কাফেররা বলে, আল্লাহর নবী কোন নিদর্শন কেন নিয়ে আসেননি? অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবন্ত ও চিরস্থায়ী মোজেযা পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক দান করেছেন, তবুও তারা হেদায়েত কবুল করেনা।

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ

যদি আমি তাদেরকে পবিত্র কোরআন নাজিল করার পূর্বেই ধ্বংস করে দিতাম, তখন তারা বলত, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! দুনিয়াতে আমাদের নিকট কোন রসূল কেন প্রেরণ করোনি, যদি কোন রসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তোমার বিধি-নিষেধ পালন করে চলতাম। এখানে অপমানিত, লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে যদি এই কাফেরদেরকে আমি ধ্বংস করে দিতাম, তবে তারা কেয়ামতের দিন একথা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতে কেন আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করোনি? যদি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করা হতো এবং তিনি আমাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতেন, তবে দুনিয়াতে বন্দী হওয়ার অবমাননার পূর্বে বা নিহত হওয়ার পূর্বে এবং আখেরাতে কঠিন কঠোর আযাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে আখেরাতের

সম্বল সংগ্রহ করে নিতাম। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে এজন্যে কাফেরদেরকে আযাব দেয়া হয়নি যে কাফেররা কেয়ামতের দিন এমন ওজর আপত্তি পেশ করতে পারতো। কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, কাফেরদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে, কিন্তু তারা সে আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আখেরাতে শাস্তির ব্যাপারে তাদের আর কোন ওজর-আপত্তি থাকবে না।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, সকলে তথা আমরা এবং তোমরা অপেক্ষমান রয়েছি, তোমাদের কি অবস্থা হয় দেখি, আর আমাদের কি অবস্থা হয় তোমরা দেখ"।

فَتَرَبَّصُوا

"অতএব, তোমরাও প্রতীক্ষা কর"।

فَسَتَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে কার অদৃষ্টে কি আছে তা অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, সঠিক পথে কে ছিল, আর কে গোমরাহী থেকে হেদায়েত লাভ করেছে এবং কে চিরস্থায়ী শান্তি ও নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। যখন তোমরা দোযখের আযাব দেখবে, তখনই এ সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করবে কে সত্যের উপর ছিল, আর কে বাতিল পন্থী ছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে, তারাই জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়েছে। চির সাফল্য তাদের জন্যেই রয়েছে চির নির্ধারিত।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৫ই রমজান, ১৪১৩ হিঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, ১৬ ফাল্গুন ১৩৯৯ জোহরের নামাজের পর তফসীরে নূরুল কোরআনের ষষ্ঠদশ খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এ সাধনা এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। সারা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার তৌফিক দান কর, আমীন।